জুয়াড়ি

রূপক সাহা

পাত্তি টু পাত্তি

কথাটা আজ জিজ্ঞাসা করবই, মনে মনে ঠিক করে শুভ্র পার্কের মাঠে ঢুকল। লোহার গেটটা সরাবার ফাঁকেই ও দেখতে পেল দিব্য, রানা আর সন্তু উত্তর দিকের বেঞ্চে বসে আছে। পার্কের ওই দিকটায় আবছা অন্ধকার। পিছনের একটা বাড়ির জানলা থেকে আলোর রেখা তেরছাভাবে এসে পড়েছে। ইদানীং ওরা চার বন্ধু সন্ধেবেলায় আড্ডা মারতে আসে পার্কে। পারতপক্ষে ওই দিকটায় বসে না।

দূর থেকেই শুভ্র দেখতে পেল দিব্যটা বকর বকর করছে। সন্তু উলটো দিকে তাকিয়ে। ওর যেন কোনও আগ্রহই নেই শোনার। রানা ঘাড় ফিরিয়ে রয়েছে দিব্যর দিকে। মন দিয়ে শুনছে। মাস কয়েক হল, দিব্য সেলস্‌ম্যানের চাকরি পেয়েছে একটা স্কুটার কোম্পানিতে। নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার কথা ও এসে শোনায় বন্ধুদের। চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র ও-ই চাকরি করে।

শুভ্র কাছে আসতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল সন্তুর চোখ-মুখ। হেসে বলল, "আজও ব্যাড লাক গেল। এসে দেখি আমাদের বেঞ্চটা বেদখল হয়ে গেছে। ওই দ্যাখ, দান্তে আর গ্যেটে এখনও গ্যাঁজাচ্ছে।"

শুভ্র বলল, "তোর সাজেশানটাই দেখছি এ বার নিতে হবে। বেঞ্চের গায়ে লিখে দিতে হবে, সন্ধ্যাবেলায় এখানে বসিবেন না। আশপাশে সাপ আছে।"

সন্তু বলল, "দূর, ওদের সাপের ভয় দেখিয়েও লাভ হবে না। হয়তো আলোচনা শুরু করে দেবে, মানুষ না হয়ে যদি সবাই সাপ হয়ে জন্মাত, তা হলে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি হত কী করে?"

সন্তুর কথা শুনে শুভ্র আর রানা জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই শুভ্র একবার দক্ষিণ দিকের বেঞ্চে তাকাল। ওদের নিত্যকার আড্ডায় ইদানীং এক উৎপাত শুরু হয়েছে। রোজ যে বেঞ্চটায় ওরা বসে, বিকালের দিকে আগে এসে মাঝেমধ্যে সেখানে আড্ডা মারছেন সুনীতিদা আর জ্যোতিদা। শুভ্রদের থেকে বয়সে অন্তত বছর পাঁচেকের বড়। দু'জনই বেকার। তবে ফিলজফিতে এম এ এবং পড়াশুনায় খুব ভাল বলে পাড়ার লোকেদের কাছে বাড়তি একটু খাতির পান। সমবয়সী আর কারও সঙ্গে ওঁরা মেশেন না। দিনের বেলায় ওঁদের কাউকে পাড়ায় দেখাও যায় না। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ ওঁরা উদয় হন। কথা বলতে বলতে রাস্তায় হাঁটেন, পার্কের মাঠে বসেও অনর্গল কথা বলে যান। দু'জনের খেয়ালও থাকে না, আশপাশে কী ঘটছে।

বি এ-তে সন্তুর অনার্স ছিল ফিলজফিতে। কলেজে পড়ার সময় ও দু' একবার গিয়েছিল সুনীতিদা আর জ্যোতিদার কাছে গাইডেন্স নেওয়ার জন্য। কিন্তু পাত্তা পায়নি। সেই থেকে সন্তুর খুব রাগ দু'জনের ওপর। সুনীতিদার গজ দাঁত আছে।

সন্তু ভাই নাম দিয়েছে দান্তে। আর জ্যোতিদার হাইট মাত্র পাঁচ ফুট। সেই কারণে **গ্যেটে**। এই দুটো নাম অবশ্য ওরা চার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে না। সন্তু একবার **চাঞ্চল্যকর** একটা তথ্য জানিয়েছিল আড্ডায়। বরানগরের জয়শ্রী সিনেমা হলে ও নাকি দান্তে আর গ্যেটেকে একবার দেখেছিল। পাড়ার নিরালা অ্যাপার্টমেন্টের দু'টো কাজের মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখছেন। বিকালে সেই দু'টো মেয়ে রোজ পার্কে আসে, সঙ্গে বাবুদের বাচ্চা নিয়ে।

আড্ডা দেওয়ার সময় শুভ্র কোনওদিন বেঞ্চে বসে না। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বন্ধুদের মুখোমুখি বসতেই ও ভালবাসে। পকেট থেকে রুমাল বের করে, ঘাসের ওপর সেটা পেতে ও বসে পড়ল। বিকালে মহমেডান মাঠে ক্লাবের প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল। কাফ্ মাসলে টান ধরেছিল। ময়দান থেকে ফেরার সময় বাইক স্টার্ট দিতে গিয়ে পায়ের ডিমে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। পা টান করে বসতেই ও আরাম পেল। তারপর দিব্যকে জিজ্ঞাসা করল, "রানার সঙ্গে এতক্ষণ কী বকবক করছিলি?"

দিব্য বলল, "আর বলিস না। আমাদের লাইনে যে কী ল্যাং মারামারি তুই ভাবতেও পারবি না।"

—কী রকম?

—এই দ্যাখ না, আজ সকালে টালা ব্রিজ দিয়ে অফিস যাওয়ার সময় দেখি, আমাদের কোম্পানির স্কুটার নিয়ে একটা লোক হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মিনি বাস থেকে নেমে পড়লাম। লোকটাকে দেখে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি শ্যামবাজারের দিকে নেমে লোকটা ঘুরে আবার ব্রিজের উপরে উঠে আসছে। ওখানেই সন্দেহটা হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম লোকটাকে। পাকপাড়ার দিকে নেমে গেল। একটু পরে দেখি, অন্য একটা লোক ওই স্কুটারটাই হাঁটিয়ে ব্রিজের উপরে উঠছে। তখন বুঝলাম, আমাদের রাইভাল কোম্পানির লোক। আমাদের অ্যান্টি ক্যাম্পেন করছে। বোঝ অবস্থাটা।

—তুই কিছু বললি না।

—বললাম, কী উত্তর দিল জানিস? এই স্কুটারটা মাস তিনেক হল কিনেছি। এর মধ্যেই খারাপ। কলিগরা বারণ করেছিল, শুনিনি। এর থেকে অন্য কোম্পানির স্কুটার কিনলে, অফিস যাওয়ার সময় হ্যাপা পোহাতে হত না। দামও হাজার টাকা কম পড়ত।

রানা বলল, "এখন কম্পিটিশনের যুগ। কনজ্যুমার ধরার জন্য বড় বড় কোম্পানিকেও এ সব করতে হচ্ছে।"

সন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। একবার শুধু বলল, "বোগাস।"

দিব্য খুব কড়া চোখে তাকাল ওর দিকে। সন্তুকে ও একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দু'জনের মধ্যে রেষারেষি সেই স্কুল লাইফ থেকে। স্কুলে একবার বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকে ওরা কেউ কাউকে পছন্দ করে না। চারজন একসঙ্গে ওঠা-বসা করলেও, এই দু'জনের মধ্যে অদৃশ্য একটা পর্দা ঝুলে থাকে। দিব্য চাকরি পেয়েছে খবরটা শুনে সন্তু মন্তব্য করেছিল, "খোঁজ নিয়ে দেখিস, ওর বাপ নির্ঘাত ঘুষ-টুষ দিয়েছে।" আড্ডার মাঝে রোজই একবার করে খিটিমিটি লাগে দু'জনের মধ্যে। হয় রানা, না হয় শুভ্রকে তা সামাল দিতে হয়।

আজও দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "টি ভি-তে আজকাল ড্রিম মার্চেন্টস বলে একটা প্রোগ্রাম হয়। সেটা দেখলে বোঝা যায় মার্কেটিং জগৎটা কী অদ্ভুত। দিব্য তোর ওই প্রোগ্রামটা দেখা উচিত।"

দিব্য জিজ্ঞাসা করল, "কোন চ্যানেলে দেখায় রে ?'

—কেব্‌ল টি ভি-তে। আলেক্স পদমজি বলে এক ভদ্রলোক মাঝেমধ্যে প্রোগ্রামটা করেন। আমার খুব ভাল লাগে। বাবার মুখে শুনেছি, অ্যাড ওয়ার্ল্ডে নাকি ওর মতো পার্সোনালিটি নেই বললেই চলে।

শুভ্র বলল, "কতদিন তোকে বলেছি, কেব্‌ল লাইনটা বাড়িতে নে। টি ভি-র সামনে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না।"

দিব্য হতাশ গলায় বলল, "বাবাকে একবার বলেছিলাম। কিন্তু মিতু কলেজে না ওঠা পর্যন্ত কেব্‌ল লাইন নেবে না। তোদের তো এই সমস্যাটা নেই।"

রানার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে এই সময় সন্তু ফিসফিস করে বলল, "এখনও কত লোকের বাবা ব্যাকডেটেড রয়ে গেল, তাই না ?"

শুনে রানা হো হো করে হেসে উঠল। দিব্য বুঝতে পারল, কথাটা ওকে নিয়েই। ও গুম হয়ে গেল। এখন জিজ্ঞাসা করলে রানা কিছুতেই বলবে না সন্তু কী বলল। পরে ওর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। সন্তুর ওপর মাঝে মধ্যে ভয়ানক রাগ হয়। বিশেষ করে, ও যখন তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। হাত নিসপিস করে দিব্যর। কিন্তু কিছু করার নেই শুভ্রর সামনে। শুভ্রকে ওরা সবাই খুব ভালবাসে।

সন্তুর ওপর বিরক্তিটা কমানোর জন্য দিব্য একবার নবজাতক লাইব্রেরির দিকে তাকাল। লাইব্রেরির দরজা এখনও বন্ধ হয়নি। মানে, ন'টা বাজেনি। ক'টা বাজে তা দেখার জন্য দিব্য হাতঘড়িটা দেখল। সাড়ে আটটা। তার মানে এখনও সময় আছে। একদিন অন্তর ও বই পাল্টাতে আসে। পরশু এসেছিল। লাল রঙের স্কার্টের মাঝে গোল গোল সাদা ছোপ, আর ভায়োলেট রঙের আপার পরে। দিব্য মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল দেখে। সব কিছুই যেন ওকে মানিয়ে যায়। দিব্য জানে, লাইব্রেরিতে ঢুকে বই পাল্টাতে ও মিনিট পাঁচেক সময় নেবে। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে জহরলালের দোকানে। ঝালমুড়ি কেনার ফাঁকে অবশ্যই দু'চারবার তাকাবে পার্কের দিকে। যে দিন মা সঙ্গে থাকে, সেদিন অবশ্য তাকায় না। দিব্য জানে, ওদের সম্পর্কে মায়ের ধারণা খুব ভাল নয়। ধারণা খারাপ হওয়ার পিছনে সন্তু। চাঁদা চাইতে গিয়ে একবার বিশ্রী ঝগড়া করেছিল।

পরিস্থিতি আবার ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে শুভ্র তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পার্স বের করে বলল, "একটু ঝালমুড়ি খেলে হত। আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। তোরা কেউ একজন নিয়ে আয়। দেখ তো, জহরলালের দোকানে এখন ভিড় আছে কি না।"

পার্কের দক্ষিণ দিকে, রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের নীচে জহরলালের ঝালমুড়ির দোকান। শুভ্ররা খুব ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখছে। রোজ সন্ধেবেলায় এসে জহরলাল দোকান সাজিয়ে বসে। রাত দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত ওকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় লেগেই থাকে। উল্টো দিকে নবজাতক পাঠাগার। সন্ধের পরে বই

পাল্টাতে এলে পাড়ায় অনেকেই জহরলালের দোকানে দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েদের ভিড়ই বেশি।

শুভ্র টাকা বের করার আগে দিব্য বলল, "এই, আমি যাচ্ছি।"

ওর দেখাদেখি রানাও উঠে বলল, "টাকাটা আমাকে দে। আজ আমি যাচ্ছি।"

দু'জনের সমান আগ্রহ দেখে শুভ্র একটু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো। অন্য দিন তো, তোদের ঠেলে পাঠাতে হয়।"

সন্তু একমনে সিগারেট পাকাচ্ছিল। ইদানীং ও প্যাকেট কেনে না। তাতে নাকি বেশি খাওয়া হয়ে যায়। কাগজের আঠার দিকে জিভ লাগিয়ে বলল, "আগ্রহটা মেমবুড়ির জন্য।"

সন্তুর মুখে মেমবুড়ি কথাটা আগে কখনও শুভ্র শোনেনি। ওর ওই এক দোষ। সবার একটা করে নাম দেয়। সবার মানে, ও যাদের পছন্দ করে না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সন্তু বলল, "আরে, ডলিকাকার মেয়ে। মেমদের মতো ফর্সা, আর কথাবার্তায় পাকা বুড়ি।"

শুনে রানা হাসতে হাসতে বসে পড়ল। বলল, "উফ্ সন্তু, তুই গ্রেট।"

হাসতে হাসতেই শুভ্র আড়চোখে লক্ষ করল, দিব্যর মুখটা আবার থমথমে হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের মধ্যে দিব্যই সব থেকে হ্যান্ডসাম। কিন্তু রেগে গেলে ওকে খুব বিশ্রী দেখায়।

দিব্য কড়া গলায় বলল, "দ্যাখ সন্তু, তোর এই ফালতু ইয়ার্কিগুলো আমার একদম পছন্দ হয় না।"

সন্তু পাত্তাই দিল না। সিগারেটে লম্বা টান মেরে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, "আমার তাতে কিছু আসে-যায় না। তোর এত গায়ে লাগার কারণ বুঝতে পারছি না। যত দূর জানি, ডলিকাকা এখনও পর্যন্ত তোর কেউ হয় না।"

দিব্য গলা চড়িয়ে বলল, "একজন ভদ্রমহিলাকে তুই ডলিকাকা বলে ডাকবি! এ কোন ধরনের ভদ্রতা?"

"—ভদ্রতা!" সন্তু একবার মুখ বেঁকিয়ে বলল, "শব্দটার মানে তুই জানিস?"

শুভ্র ওদের থামাবার জন্য বলল, "আবার তোরা শুরু করলি! ডলিকাকাটা আবার কে?"

সন্তু বলল, "তোর মনে আছে শুভ্র, গতবছর থার্টিন ডি-তে পুজোর চাঁদা চাইতে গিয়ে কী ব্যবহারটা আমরা পেয়েছিলাম? দরজা আগলে... ওই ভদ্রমহিলা ... হাজব্যান্ডকে আমাদের সামনে আসতেই দিল না। পাছে বেশি চাঁদা গলে যায়। তারপর থেকেই, আমি ওই নামে ডাকি। মেয়েটার নামও সেদিন দিয়েছি মেমবুড়ি। বেথুন স্কুলে পড়ে। তবু এমন হাবভাব, মনে হয় লা মার্টস-এ পড়ে। সহ্য করা যায় না।"

মেমবুড়ি কে, শুভ্র প্রথম দিকে বুঝতে পারছিল না। বেথুন স্কুলের কথা বলতেই ও বুঝে ফেলল। সন্তোষকাকুর মেয়ে কেকা। সঙ্গে সঙ্গে ডলিকাকিমার মুখটা ওর মনে ভেসে উঠল। এ পাড়ায় সকাল-বিকাল, বেথুন স্কুলের নীল রঙের একটা বাস আসে। সবাই জানে, কোন মেয়ে ওই নামী স্কুলটায় পড়তে যায়। কেকা ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। ওর প্রতি একটু দুর্বলতা আছে দিব্যর। আর কেউ তা না জানুক,

শুভ্ররা তিনজন তা জানে।

সন্তুর ওপর রেগে দিব্য চলেই যাচ্ছিল। শুভ্র হাত ধরে টেনে ওকে পাশে বসাল। তারপর বলল, "এত রেগে যাচ্ছিস কেন ? বন্ধুদের মধ্যে তো কত ধরনের ঠাট্টা-ইয়ার্কি হয়।"

দিব্য বলল, "আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ও বাজে কথা বলবে, আর সেটা আমাদের সহ্য করতে হবে ?"

দিব্য 'আমাদের পাড়ার' কথাটার ওপর জোর দিল। চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র সন্তুই এ পাড়ায় থাকে না। ওদের বাড়ি পালের বাগানে। খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই এ পাড়ায় ওর যাতায়াত। শুভ্রদের সঙ্গে ও একই স্কুলে পড়ত। বন্ধুত্বটা আরও গাঢ় হয় ফুটবল খেলাকে ঘিরে। ভাল স্ট্রাইকার ছিল সন্তু। আন্ডার হাইটের টুর্নামেন্টে ওকে আর শুভ্রকে সবাই ডেকে নিয়ে যেত।

এই পার্কের মাঠ তখন অনেক বড় ছিল। এখন উত্তর দিকে বিরাট একটা পিচবোর্ড তৈরির কারখানা। পার্কের বড় একটা অংশ চলে গিয়েছে কারখানার মধ্যে। কারখানার মালিক একসময় এম পি ছিলেন। এই কারণে সেই সময় কোনও সোরগোল হয়নি, খেলার মাঠ অর্ধেক বেদখল হয়ে যাওয়া নিয়ে। কারখানার চারপাশে নানা ধরনের দোকান গজিয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। পাড়ার একধারে হলেও, সারাদিনই এ দিকটায় হই-হট্টগোল। ইদানীং উৎপাত শুরু হয়েছে সাট্টা খেলার। প্রথম দিকে সাট্টা সীমাবদ্ধ ছিল পিচবোর্ড কলের কর্মীদের মধ্যেই। এখন পাড়ার অনেককেই সাট্টার ঠেক-এ দেখা যাচ্ছে।

বছর কয়েক আগে কর্পোরেশন এই মাঠটার দখল নিয়ে বাচ্চাদের জন্য দোলনা, চরকির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন আর পার্কে ফুটবল-ক্রিকেট খেলার মতো জায়গা নেই। অথচ একটা সময়ে শুভ্ররা ছুটির দিনগুলোতে সারাদিনই পড়ে থাকত পার্কের মাঠে। পাড়ার খুকুমণিদা একবার বড় টুর্নামেন্টও করেছিলেন ফ্লাড লাইটে। বরানগর, এঁড়েদা, এমনকী শ্যামবাজার থেকেও টিম এসেছিল খেলতে। মারপিটের জন্য সেবার ফাইনাল ম্যাচটা ভণ্ডুল হয়ে যায়। রাজাবাগানের গোখনার টিম ফাইনালে উঠেছিল। ওরাই গোল খাওয়ার পর ঝামেলা পাকায়। খুব সোডার বোতল ছোড়াছুড়ি হয়েছিল দু'পক্ষের মারপিটে। ওই দিনই প্রথম শুভ্র দেখেছিল তুলসীদাস বলরামকে। ফাইনালে প্রাইজ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন বলরাম।

পার্কের মাঠের ঠিক মাঝখানে এখন কংক্রিটের গোল একটা বেদি। বিকালে বাচ্চাদের নিয়ে এসে মায়েরা ওখানেই বসে। কাজের মেয়েরাও আসে বাচ্চাদের নিয়ে। ওদের বসার জায়গা উত্তরদিকে পিচবোর্ড কলের পাশে। গরমকালে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পার্কের মাঠ গমগম করে। টি ভি শুরু হলে অবশ্য ফাঁকা হয়ে যায়।

কংক্রিটের বেদির মাঝে আর পার্কের চার কোণে কর্পোরেশন আলোর ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। পিচবোর্ড কলের দিকটায় আলো থাকা সত্ত্বেও জ্বলে না। ওদিকটায় সাট্টার ঠেক। পাড়ার লোকের ধারণা, সাট্টাওয়ালারাই আলো চায় না ! ঢিল মেরে বাল্‌ব ফাটিয়ে দেয়। বিরক্ত হয়েই কর্পোরেশনের লোকেরা আর নতুন বাল্‌ব লাগায় না। সন্ধের পর ওখানে বাজে ছেলে-মেয়েদের ভিড়। আবছা অন্ধকারে, জোড়ায় জোড়ায়

এসে ওরা বসে। সবজি বাগান, পালের বাগানের বস্তির ছেলে-মেয়েরা। সন্তরা দু'একবার তাড়াও করেছিল ওদের। লাভ হয়নি। পার্কের রেলিং আর পিচবোর্ড কলের দেওয়ালের মাঝে একটা ছোট্ট গলি আছে। রেলিং টপকালেই ওই গলি দিয়ে সোজা সিঁথির মোড়ে চলে যাওয়া যায়। নোংরামি করার সময় সন্ত একবার হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল সবজি বাগানের একটা মেয়েকে। পরদিন বস্তির একদল লোক এসে পার্কের সব বাল্‌বগুলো ভাঙচুর করে যায়। 'ভদ্দরলোকেদের মুখে পেচ্ছাপ করার জন্য' সেদিন সেই মেয়েটাও সঙ্গে এসেছিল। সন্তকে হাতের সামনে পেলে হয়তো মেরেই ফেলত।

এইসব কারণে পার্কের মাঠের এদিকটায় বসতে খুব অস্বস্তি হয় শুভ্রর। আজ অবশ্য পার্কে লোক নেই। বিকালের দিকে প্রচুর মেঘ করেছিল আকাশে। ঝড় উঠেছিল। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির ভয়েই লোকজন নেই। গুমোট গরম। সন্ত গায়ের টি-শার্ট খুলে রেখেছে। একসময় লোহা তুলত সন্ত। বুক, কাঁধ আর হাতের পেশিগুলো এখনও দেখার মতো। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। ওর হাত দুটো অদ্ভুতরকম বড়। প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি চলে যায়। চার বন্ধুর মধ্যে ও-ই সব থেকে সাহসী। ফুটবল খেলা নিয়ে মারপিটে, একবার সেভেন ট্যাংকস্ লেনের একটা ছেলেকে ও এমন একটা ঘুষি মেরেছিল, ছেলেটার চোয়াল ঝুলে যায়। সন্তর চেহারার মধ্যে এক ধরনের রুক্ষতা আছে। দেখলে রাগী রাগী মনে হয়। জগতের সব কিছুর ওপর যেন ওর বিতৃষ্ণা।

শুভ্র লক্ষ করল, উল্টোদিকে তাকিয়ে সন্ত মিটিমিটি হাসছে। যেন কোনও কিছু দেখে বেশ মজা পাচ্ছে। ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে শুভ্র দেখল, সুনীতিদা আর জ্যোতিদা পার্কের দেওয়ালের গায়ে লাগানো গাছের ফাঁকে বসে প্রাকৃতিক কাজটা সেরে নিচ্ছেন। ওই অবস্থাতেও কথা বলে যাচ্ছেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে শুভ্র এবার বন্ধুদের দিকে তাকাল। কেউ কোনও কথা বলছে না। একেক দিন আড্ডার তাল হঠাৎই এভাবে কেটে যায়। বন্ধুদের মাঝে বসে থাকতে থাকতেই মনের ভেতরটা অকস্মাৎ তোলপাড় হয়ে ওঠে। চিন্তার স্রোত একবগ্গা ছুটতে থাকে। যেমন, এই আড্ডার মাঝেই শুভ্রর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা কথা। কাকে জিজ্ঞাসা করে উত্তরটা জেনে নেবে, ও মনঃস্থির করতে পারছে না। ইদানীং সন্ত এ পাড়ার খবর খুব বেশি রাখে না। বরানগরের দিকে ওর কিছু বন্ধু আছে। দিনের বেশিরভাগ সময় আজকাল ও ওখানেই কাটায়। ওকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। রানার সঙ্গে আলাদা একটা সম্পর্ক আছে শুভ্রর। কিন্তু ওর পেটে কোনও কথা থাকে না। এইসব কথা ওকে জিজ্ঞাসা করা মানে, সারা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া। শুভ্র মনে মনে ঠিক করল, দিব্যকেই এক ফাঁকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নেবে। কয়েকদিন ধরেই তীব্র একটা কৌতূহল অনুভব করছে। অথচ সেটা মিটিয়ে ফেলার উপায় নেই। আগে কখনও এই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ও পড়েনি। এই সব চিন্তাভাবনা এতদিন শুভ্র ঠেকিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ সেদিন কী যে হল, বুঝতে পারছে না।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সন্ত হঠাৎ বলে উঠল, "পাড়ায় আরেকটা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হল।"

রানা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "কেন রে, কে মারা গেল?"

সন্ত মিটিমিটি হাসছিল। বলল, "এখনও মারা যায়নি। শ্রাদ্ধটাও এখন হবে না।

শুধু শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হল। তোরা কেউ লক্ষ করিসনি, বিয়ে বাড়ির জন্য সাজানো একটা গাড়ি তখন থেকে পার্কের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে।"

রানা হাঁফ ছেড়ে বলল, "বিয়ের সঙ্গে শ্রাদ্ধের সম্পর্কটা কী?"

—বিবাহিত লোক ছাড়া শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়? একটা বিয়ে মানে, ভবিষ্যতে দু'টো শ্রাদ্ধ।

সন্তুর কথার মানে বুঝতে পেরে শুভ্রও হেসে ফেলল। বলল, "তোর যত সব অদ্ভুত চিন্তা।"

সন্তু জিজ্ঞাসা করল, "পাড়ায় কোন বাড়িতে বিয়ে রে? কাছেপিঠে হলে নিশ্চয়ই মাইকের আওয়াজ শোনা যেত।"

রানা বলল, "নিশ্চয় শেঠ লেনের দিকে কোনও বাড়িতে হবে। ও দিকে নিত্যনতুন সব ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে।"

সন্তু ফিকফিক করে হেসে উঠল, "বিয়ের ব্যাপারটাই অদ্ভুত মাইরি। যখন ভাবি, অবাক লাগে।"

রানা বলল, "এতে অবাক হওয়ার কী হল তোর?"

—কেন নয়, বল। যে লোকটাকে হয়তো জীবনে তুই দেখিসনি, অথবা যে মেয়েটাকে চিনিসও না— হঠাৎ তোদের বসিয়ে দেওয়া হল পাশাপাশি পিঁড়িতে। তারপর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই তুই লিগ্যাল পারমিশান পেয়ে গেলি, একে অপরের ওপর শারীরিক নিপীড়নের। বাঃ, বিউটিফুল সিস্টেম।

—শারীরিক নিপীড়ন বলছিস কেন?

—অবশ্যই নিপীড়ন। তুই দ্যাখ, বৌভাত হয়ে গেল। তুই দরজা বন্ধ করে দিলি। তোর মানসিক প্রস্তুতি নেই। তুই জানিসও না, পার্টনারের গুপ্ত রোগ আছে কি না। সে শারীরিক সুস্থ কি না। পরদিন সকালে যখন ঘর থেকে বেরোলি তখন মাসিমা-কাকিমা-বৌদি বা বন্ধুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল অভিজ্ঞতার কথা শোনার জন্য। হয়তো তোর ভয়াবহ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। তবু তুই মুখ ফুটে বলতে পারবি না চক্ষুলজ্জায়। নিপীড়ন ছাড়া এটা কী? আমার তো মনে হয়, পুরোটাই অসভ্যতা।

—ফালতু কথা বলছিস। এখন এটা হয় না।

—এখনও হয় রানা। এই তো, কয়েকদিন আগেই টিভিতে দেখলাম বিহারের কোনও এক গ্রামে, ইয়াং ছেলে দেখতে পেলেই তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় গ্রামের মোড়লরা। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তার কিছুদিন পর ছেলের বাড়িতে সেই মেয়েকে দিয়ে আসে। অ্যাকসেপ্ট না করলে খুন খারাপির ভয় দেখায়। এই তো অবস্থা। এই বিংশ শতাব্দীতেও এসব হয়।

—ও সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই দুটো-চারটে, ছুটকো-ছাটকা উদাহরণ দিয়ে দীর্ঘদিনের একটা ট্রাডিশনকে উড়িয়ে দিতে পারিস না।

—সেই জমানা চলে গেছে রে, বিবাহ মানে যখন বলা হত বিশেষভাবে বহন। শালা, লোকে এখন অনেক বেশি সেলফ-সেন্টারড্ হয়ে গেছে। অনেক বেশি ভাবে নিজেকে নিয়ে। ঘেন্না ধরে গেল আচ্চার এইসব দেখে।

একটানা এই কথাগুলো বলে সন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর চোখমুখ থেকে বিজাতীয় একটা রাগ ফুটে বেরোতে দেখে রানা অবাক হয়ে একবার তাকাল শুভ্রর

দিকে। তারপর বলল, "সন্তু, তোর মাথাটা গেছে। কিছু মনে করিস না, একটা কথা বলি। তোর মা যেদিন মারা গেলেন, তোর বাবার সেই মুখটার কথা মনে কর তো?"

সন্তু বলল, "ওদের কথা আলাদা। আমার কাকা মারা গেলে কিন্তু কাকার বউয়ের চোখমুখে সেই জেনুইন লাভ তুই ফুটে উঠতে দেখবি না। জেনারেশন গ্যাপ। এই যে এত কান্নাকাটি, সেটা তো ভবিষ্যতের আর্থিক অনিশ্চয়তার কথা ভেবেই। ডায়লগগুলো শুনেছিস কখনও ... তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে .... সারা জীবন আমি কার সঙ্গে কাটাব ... আমার কী হবে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভদ্রমহিলাই যদি যুবতী হন, দেখবি বছরখানেক পরে স্বামীর অফিসের বন্ধু অথবা অন্য কারও সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বছরখানেকের মধ্যেই স্বামীর কথা তিনি ভুলে গেলেন। সেই ফিজিক্যাল আর্জ চাগাড় দিয়ে উঠল।"

শুভ্র মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছিল এইসব কথা শুনে। সন্তুটা দিন কে দিন কি পাল্টে যাচ্ছে? ওর কথা শুনে নিজের পিসিমণির মুখটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ক'বছর হল পিসেমশাইকে হারিয়েছেন? বছর কুড়ি তো বটেই। পিসিমণিকে নিয়ে এসব ভাবা যায়? শুভ্র একটু বিরক্তি ফুটিয়েই বলল, "তোরা থাম তো। বড়দের নিয়ে এ সব আলোচনা আমার ভাল লাগছে না।"

শুভ্রর বকুনি শুনে সন্তু ভালমানুষের মতো বলে উঠল, "ঠিক আছে ভাই। বড়দের নিয়ে আর কোনও কথাই বলব না।"

দু'হাত পিছনে ভর দিয়ে শুভ্র টানটান হয়ে বসেছিল। এবার ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। চোখ গেল আকাশের দিকে। মেঘের জন্য তারা দেখা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। শুভ্রর হঠাৎ খুব ভাল লাগল খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকতে। ফলতায় ওদের একটা ইটভাটা আছে। একেবারে গঙ্গার ধারে। মাঝেমধ্যে ছুটি পেলেই আগে ও সেখানে যেত। গরমকালে নৌকায় শুয়ে রাতে ও আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকত। নৌকাটা অল্প দুলত। দারুণ একটা অনুভূতি হত। শুভ্রর মনে পড়ল, মাস ছয়েক হল, ফলতায় ও যায়নি। বছরে মাস ছয়েক ইটভাটায় কাজ চলে। বর্ষা নামার আগেই ইট পোড়ানোর কাজ শেষ করে ফেলতে হয়। এবার নাকি ভাল ব্যবসা হয়েছে। ইটভাটা দেখাশুনা করেন পিসিমণির দূর সম্পর্কের এক দেওর। তিনিই এসে বলে গেছেন। শুভ্র ভাবল, ইউনিভার্সিটি টুর্নামেন্টটা হয়ে গেলেই একবার ও ফলতায় ঘুরে আসবে। ওখানে বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ি আছে ওদের। ঠিক আচার্য জগদীশ বসুর বাড়ির গায়ে। দু'চারটে দিন বিশ্রাম নিয়ে আসবে। বাড়ির লাগোয়া বাগানে দশ-বারোটা চাঁপা ফুলের গাছ আছে। সন্ধ্যাবেলায় মিষ্টি গন্ধ ম-ম করে।

ফুলের কথা মনে পড়তেই শুভ্র চোখ বুজল। আবার সেই কথাটা ঘুরে ফিরে মনে আসছে। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ও দিব্যর দিকে তাকাল। নিচু গলায় রানার সঙ্গে কী যেন ও বলছে। সন্তু মাথার পিছনে দু'হাত দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উল্টো দিকে তাকিয়ে। ফিকফিক করে হাসছে। পাকিয়ে সিগারেট খেলেই আজকাল ও একটু অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়। টোবাকোর সঙ্গে কি কিছু মেশায়? শুভ্রর কোনও ধারণা নেই ওসব নিয়ে। ও সিগারেট খায় না। ওর কোনও বাজে অভ্যাস নেই।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে শুভ্র শুয়ে শুয়েই বলল, "কী রে,

সবাই চুপ করে আছিস যে ? সন্তু তোর মুখেও কথা নেই কেন ?

সন্তু কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলল, "ভাই তোমরা আমাকে, বড়দের নিয়ে আলোচনা করতে বারণ করেছ। তাই করছি না। দেখে যাচ্ছি, ওপাশে পেচ্ছাপ করতে বসে সাত মিনিট ধরে কীভাবে ফিলজফি মাড়িয়ে যাচ্ছে দান্তে আর গ্যেটে। সহ্য করতে পারছি না। ওই সাবজেক্টে আমিও ভাই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।"

শুভ্র উল্টে গিয়ে পার্কের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখল, রেলিংয়ে ঝোপের ধারে বসে সুনীতিদা আর জ্যোতিদা কথা বলে যাচ্ছেন। দূর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, কোনও আলোচনায় ওঁরা ডুবে গেছেন। শুভ্র ভাবল, ওঁদের মাথায় কি ছিট আছে।

সন্তু বলল, "আর তিন মিনিট দেখব। তারপর কিন্তু আমি ইট মেরে ওদের তুলব।"

রানা বলল, "অ্যাই সন্তু, ওসব করতে যাস না। বাবার কাছে সুনীতিদা মাঝেমধ্যে আসে।"

শুভ্র বলল, "সত্যিই কী আলোচনা করে এত বল তো ওরা ?"

সন্তু চটজলদি বলল, "আমি জানি, মানুষ যদি পেচ্ছাপ না করত, তা হলে কার ক্ষতি হত—এখন এই আলোচনা করছে।"

রানা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "তুইও তো ফিলজফি নিয়ে পড়েছিস। তোর মাথায়ও এসব চিন্তা ঘোরে নাকি ?"

সন্তু বলল, "মাঝেমধ্যে। এ তোর ইংরাজি সাহিত্য নয়। নাটক-নভেল-গল্প-কবিতা, কোথায়ও তুই খুঁজে বের করতে পারবি না, নায়ক বা নায়িকা যখন ওই প্রাকৃতিক কম্মগুলো সারছে তার কোনও ভিভিড ডেসক্রিপশন কোনও চ্যাপ্টারে আছে ?"

রানা ইংলিশে এম এ পরীক্ষা দিয়েছে। হাসতে হাসতেই বলল, "না রে কোনও চ্যাপ্টারে পাইনি। তোদের ফিলজফিতে আছে বুঝি ?"

—না থাকলেও, আমি অন্তত মিনিট পাঁচেক এর ওপর বলে যেতে পারি।

মজা করার জন্যই শুভ্র বলল, "বল তো, শুনি।"

হাতটা মুঠো করে মুখের সামনে মাইকের মতো ধরে সন্তু বলতে শুরু করল, "প্রস্রাব এক ধরনের জলীয় পদার্থ। প্রাণীর দেহে কিডনি বলে একটা অঙ্গ আছে। তার মধ্যে এই পদার্থটি জমা হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটির নাম বদলায়। ছোটবেলায় এর নাম সি, হিসি বা হিসু। বড় হলে প্রস্রাব। চলতি ভাষায় পেচ্ছাপ। ইংরাজিতে ইউরিন। সংস্কৃতে মূত্র। খুব বুড়ো হলে শিবাম্বু। শরীর নিরোগ রাখার জন্য অনেকে দিনের প্রথমবারের প্রস্রাব পানও করেন। যেমন আমাদের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পান করতেন। ছোটবেলায় শরীর থেকে বেরোবার সময় এর ফোর্স অনেক বেশি হয়। তখন তিন চার ফুট দূরেও ত্যাগ করা যায়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেগ কমে আসে। খুব বুড়ো অবস্থায় অনেকে প্যান্টেও করে ফেলেন। মলত্যাগের সময় এই পদার্থটিও বেরোয়। যত্রতত্র প্রস্রাব করার আইনগত বাধা আছে। তাকে পাঁচ আইন বলে। পুলিশ আইনভঙ্গের জন্য আপনাকে হাজতে পুরতেও পারে। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নেই যে প্রস্রাব করে না। ... ক'মিনিট হল রে রানা ?"

রানা বলল, "পাঁচ মিনিট হতে এখনও কয়েক সেকেন্ড বাকি।

হাসির তোড়ে ও আর শুভ্র কাশতে শুরু করল। দিব্য লাইব্রেরির দিকে তাকিয়ে। সন্তুর বক্তৃতা শুনে মোটেই ওর হাসি পাচ্ছিল না। ন'টা বেজে গেছে। তা সত্ত্বেও, কেকা আজ বই পাল্টাতে এল না।

শুভ্র কোনও রকমে বলল, "থাক সন্তু, এইবার চুপ কর।"

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ, হাসির ওই দমকের মাঝেই শুভ্র পিচবোর্ড কলের লাগোয়া রেলিংয়ে একটা ছায়ামূর্তি আবিষ্কার করল। পরের মুহূর্তেই আরেকটা। রেলিং টপকে, পলকের মধ্যে ওই দুই ছায়ামূর্তি পার্কের মাঠে লাফিয়ে পড়ল। বিস্ময়ভরা চোখে শুভ্র দেখল, দু'জনের হাতে উঁচিয়ে ধরা লাঠি। সন্তুর পিছন দিকে এক হাতের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পারল, পুলিশ! একজন সন্তুর ঘাড়ের কাছটা টিপে ধরে চিৎকার করল, "স্যার, এদিকে আসুন। আজ শালাদের ধরেছি।"

রানার বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরেছে আরেকজন। শুভ্র দেখল, যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে রানার। ও নরম প্রকৃতির ছেলে। জীবনে কখনও মারপিট করেনি। কোনও রকম ঝুটঝঞ্ঝাটে যায়নি। লোকটা হাতে চাপ দিতেই ও উঠে দাঁড়াল। শুভ্র নিজেই উঠে দাঁড়াতে একজন ডাণ্ডা উঁচিয়ে ধমক দিল, "একদম পালাবার চেষ্টা করবি না। অনেকদিন ধরে তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ তোদের ষষ্ঠী পুজো হবে। চল থানায়।"

শুভ্ররা তুই-তোকারি শুনতে অভ্যস্ত নয়। গায়ের সামনে দাঁড়ানো পুলিশটার মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছিল বলে ও মুখটা সরিয়ে নিল। আচমকা এই পরিস্থিতির জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। যা ঘটছে, তা যে ওদের ভালর জন্য নয়, এটা বুঝতে শুভ্র সময় নিল না। পুলিশটার দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কী করেছি?"

—কী করেছিস? স্যার এলেই সেটা বুঝতে পারবি।

পার্কের উত্তর দিকের গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। ফুল দিয়ে সাজানো সেই গাড়িটা। সন্তু যেটাকে বার কয়েক চক্কর দিতে দেখেছিল আধ ঘণ্টা আগে। সাদা পোশাক পরা এক সার্জেন্ট নেমে এলেন সেই গাড়ি থেকে। পিছনের দরজা খুলে ঝপাঝপ নেমে পড়ল আরও তিনজন সাদা পোশাকের পুলিশ। এইবার শুভ্র বুঝতে পারল, গাড়িটা ফুল দিয়ে সাজানো কেন?

পুলিশ আসতে দেখে, দিব্যর মুখটা আতঙ্কে ভরে গেছে দেখে শুভ্র বলল, "ভয় পাস না। সার্জেন্টের সঙ্গে আগে কথা বলে দেখি। ওকে বোঝানো যাবে।"

বোধহয় কথাটা শুনে ফেলেছিল পুলিশটা। মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "ভয় কাকে বলে, চল দেখবি থানায়। গুহ্যদ্বারে রুল ঢোকালেই তোদের সব সাহস বেরিয়ে যাবে।"

ঘাড়ে লাগছিল সন্তুর। যে লোকটা ধরে আছে, তাকে ইচ্ছে করলেই তুলে আছাড় মারতে পারে ও। পুলিশ না হলে এতক্ষণে লোকটাকে হয়তো ও ছুঁড়েই ফেলে দিত রেলিংয়ের বাইরে। ঘুরে ও বলল, "ভদ্রভাবে কথা বলুন। এখানে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। কোনও অপরাধ করিনি।"

পুলিশটি ফের ধমকে উঠল, "চোপ শালা।"

সার্জেন্ট কাছে আসতেই শুভ্র ইংরাজিতে বলল, "হোয়াটস দ্য ম্যাটার। উই হ্যাভ ডান নাথিং রং। হোয়াই ইউ পিপল আর ডিসটার্বিং আস।"

পুলিশটা বলল, "স্যার, এ শালা ইংরাজি ফলাচ্ছে।"

সার্জেন্ট ভ্রু কুঁচকে একবার শুভ্রকে দেখলেন। উত্তর না দিয়ে অন্য লোকটাকে বললেন, "সাট্টার প্যাড-ট্যাড কিছু পেয়েছিস? দেখে তো মনে হয় ভদ্দরলোকের ছেলে। এরা সাট্টা চালায়?"

শুভ্র বলল, "আপনি ভুল করছেন। সাট্টার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা সবাই এ পাড়ার ছেলে। বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বিশ্বাস না হয়, যে কোনও বাড়ির লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সার্জেন্ট কড়া গলায় বললেন, "পাড়ার ছেলে তো, এত রাতে এখানে বসে কী করছ?"

শুভ্র বলল, "বললাম তো, বসে গল্প করছিলাম।"

পাত্তা না দিয়ে সার্জেন্ট সাদা পোশাকের একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁড়েজি, দেখো তো এই ছেলেগুলোকে চিনতে পারো কি না।"

লোকটা চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর সন্তুকে দেখিয়ে বলল, "এই ছেলেটাকে কভি কভি সাট্টার ঠেকে দেখেছি স্যার।

—ঠেকটা কোথায় এদের?

—পাশেই চায়ের দুকানে।

—ঠিক আছে। সার্জেন্ট বললেন, তোমরা সবাই থানায় চলো। অ্যাই দেখ তো, দোকানটায় আর কেউ আছে কি না।

পিচবোর্ড কলের গায়েই গজিয়ে ওঠা দোকানগুলোর দিকে দু'একজন ছুটে গেল। আর কথা না বাড়িয়ে সার্জেন্ট এগোলেন দক্ষিণ গেটের দিকে। শুভ্র হঠাৎ একটু দুর্বল হয়ে গেল। ওই গেট দিয়ে বেরোবার মুখেই জহরলালের দোকান। পাড়ার দু'একজন এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। গেট দিয়ে বেরোলেই ওরা দেখবে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় একথা রাষ্ট্র হতে সময় নেবে না।

গেট খুলে সার্জেন্টই আগে রাস্তায় বেরোলেন। পিছন ফিরে বললেন, "কেউ দৌড়বার চেষ্টাও কোরো না।" একটু দূরে ভরত ডাক্তারের চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালো রঙের ভ্যান। বাড়ির আড়ালে পড়ে যাওয়ায় পার্কের মাঠ থেকে শুভ্ররা তা দেখতে পায়নি। পুলিশদের বেষ্টনীর মাঝে কয়েক পা হাঁটতেই শুভ্রর চোখ পড়ল জহরলালের দিকে। অবাক হয়ে ও উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটু এগিয়ে এসে জহরলাল বলল, "বাবুদের ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন স্যার।"

সার্জেন্ট না শোনার ভান করে ভ্যানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। শুভ্র বলল, "রানার মাকে খবরটা দিও জহরলাল। ফোনে যেন ওর বাবাকে এখুনি জানিয়ে দেন।"

সঙ্গের পুলিশটি দাঁত চেপে বলল, "কোনও বাবা তোদের আজ বাঁচাতে পারবে না। আমরা লালবাজারের অ্যান্টি রাউডির লোক।"

শুভ্রর কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। বন্ধুদের দিকে একবার ও তাকাল।

রানা আর দিব্য ঘাবড়ে গেছে। সন্তুর মুখ ভাবলেশহীন। মনে মনে ও বলল, পিচবোর্ড কলের দিকে বসাটাই অন্যায় হয়েছে।

ভ্যানের ভিতর পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র চমকে উঠল। পাশ থেকে সন্তু হাসিমুখে বলল, "এই, দান্তে আর গ্যেটেকেও ওরা ধরেছে রে।"

সিঙ্গল

ভোর ছ'টার পর আর বিছানায় থাকার অভ্যাস নেই শুভ্রর। শুতে যত রাত্রিই হোক, রোজ এক সময়ে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমোতে যাওয়ার আগে কয়েকটা জিনিস ও গুছিয়ে রাখে। টুথ ব্রাশ, পেস্ট, তোয়ালে— সব হাতের কাছে। ভোরবেলায় উঠে প্রক্ষালনের কাজগুলো দ্রুত সেরে নেয়। রাতে ভিজিয়ে রাখা ছোলা-বাদাম একটা পলিথিনের প্যাকে ভরে। তারপর কিট ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাগানের একদিকে গ্যারেজ। সেখানে ওর বাইকটা থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ও গ্যারেজ অবধি পৌঁছবার আগেই, সেখানে হাজির হয় হারানদা। তাড়াতাড়ি কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে দেয়। হারানদার ব্যস্ততা দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করে শুভ্র। এই ছোট্ট কাজটা করার কোনও দরকারই নেই হারানদার। বাগানের মালি গোকুলই করে দিতে পারে। তাতে হারানদা খুব চটে যায়।

ক্লাব টিমের প্র্যাকটিস শুরু হয় ময়দানের ভবানীপুর মাঠে। ঠিক সাতটায়। শুভ্র তাই চেষ্টা করে সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার। বাস স্ট্যান্ড দশ মিনিটের হাঁটা পথ। বাইকে মিনিট তিনেকও লাগে না। রাস্তায় লোকজন দেখে ও সময়ের আন্দাজ করে নিতে পারে। ঘড়ি দেখার দরকার হয় না। বাগানের গেট থেকে বেরোবার মুখে রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয় মনার মায়ের। প্রায় একই ধরনের কথা হয়। "সদর খোলা আছে দাদাবাবু," "পিসিমণি ঘুম থেকে উঠেছে," অথবা "সাবধানে যেও, দুগ্গা, দুগ্গা।" শুভ্র রোজই ঘাড় নেড়ে ইতিবাচক উত্তর দেয়। আর মনে মনে হিসাব রাখে, এখন ছ'টা একত্রিশ। মনার মা বছর তিরিশ ধরে ওদের বাড়িতে কাজ করছে। শুভ্রর জন্মেরও সাত-আট বছর আগে থেকে। রোজ ভোরবেলায় আসে। সারাদিন থেকে রাতে বাড়ি চলে যায়। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা এত গভীর যে, নিজের সংসারেরও কোনও খোঁজ খবর রাখে না।

বড় রাস্তায় উঠেই শুভ্র বাইকের গতি একটু বাড়িয়ে দেয়। ডানদিকে জলা জায়গাটা এখন আর নেই। ভরাট হয়ে গেছে। প্রোমোটারদের কল্যাণে দ্রুত সব বাড়ি উঠে যাচ্ছে। তবে জায়গার আগের নামটাই এখনও চালু, ধানমাঠ। আগে নাকি চাষবাস হত। শুভ্র কখনও তা দেখেনি। উল্টো দিকে সার সার বাড়ি। বেশির ভাগই পুরনো এবং একতলা। ধান মাঠ শেষ হয়েছে পিচবোর্ড কলের গায়ে। ওই অবধি পৌঁছবার আগেই শুভ্রর দেখা হয়ে যায় শেফালি বৌদির সঙ্গে। মিত্র কুটির থেকে বেরোন উনি। দমদমে কোনও একটা স্কুলে পড়ান। মুখ নিচু করে দ্রুত পায়ে হেঁটে যান স্টেশনের দিকে। কোনও কোনও দিন চোখে চোখ পড়লে মৃদু হেসে বলেন, "ভাল?" শুভ্র বাঁদিকে টার্ন নিয়ে পার্কের রাস্তায় ঢোকে। একটু এগোলেই

নবজাতক লাইব্রেরি, ভরতদার ডাক্তারখানা এবং তারপর মাদার ডেয়ারির ডিপো। দুধের বিরাট একটা ভ্যান মাঝেমধ্যে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁদিকের মোড়েই নিরালা অ্যাপার্টমেন্ট। ওই নতুন বাড়িটা থেকে ইদানীং একটা মেয়েকে রোজই বেরোতে দেখে শুভ্র। পাড়ায় নতুন বলে, নাম জানে না। বোধহয় কোনও গার্লস কলেজে পড়ে। মেয়েটার পরিচয় জানার জন্য মাঝেমধ্যে ও তীব্র কৌতূহল অনুভব করছে ইদানীং। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করবে ভেবেও করতে পারছে না।

ফুটবল মরসুমে গত কয়েক বছর শুভ্রর জীবনে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজ ঘটল। ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। প্র্যাকটিসে যাওয়া হল না বলে মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। শুভ্র সাধারণত প্র্যাকটিসে কামাই করে না। কোচ ভাস্করদাও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। ক্রস কান্ট্রি সেরে এই সময়টাতেই ওরা সবাই মাঠে ফিরে আসে। দৌড়ের সময় ওর পার্টনার দীপক আর সুখেন। দু'তিনজন একসঙ্গে দৌড়লে বিরক্তি আসে না। বিছানায় শুয়ে ওর একটা অদ্ভুত ইচ্ছে হল। চোখ বুজে ও দৌড়তে শুরু করল রেস কোর্সের দিকে। মহমেডান মাঠ, বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন কোর্ট পেরিয়ে যাওয়ার মুখেই রেড রোডের ধারে পাঁচিলে ও দেখতে পেল অনিন্দিতাকে। রোজ সকালে ওখানেই হার্ডলস প্র্যাকটিস করে অনিন্দিতারা। গত বছর বোম্বাই ন্যাশনাল গেমসে রুপো পেয়েছিল মেয়েটা। বাংলার ফুটবল টিমের হয়ে সেবার শুভ্রও গিয়েছিল। ট্রেনে ফেরার পথে আলাপ ওদের সঙ্গে। শুভ্রর খুব খারাপ লাগে এই মেয়েগুলোর জন্য। প্র্যাকটিসের জায়গা নেই। রেড রোডের ধারে এক চিলতে ঘাসের জমিতে প্র্যাকটিস করেও ওরা বাংলার জন্য সম্মান আনে।

মনে মনে দৌড়েই শুভ্র ফোর্ট উইলিয়ামের গোল চক্করটা পেরিয়ে গেল। একা একা দৌড়তে হচ্ছে বলে হঠাৎ ঠিক করল, রেস কোর্স অবধি যাবে না। ট্রাম লাইন রাস্তাটা কেটে যেখানে খিদিরপুরের দিকে গেছে, সেখানকার আইল্যান্ড ঘুরে আবার ও উত্তরমুখী হল। সকালের দিকে ময়দানের চেহারা অন্যরকম। ফিটনেস নিয়ে ইদানীং লোকে খুব সচেতন হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তির পাশ থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত— কোনও জায়গা ফাঁকা থাকে না। বেশির ভাগই অবাঙালি। কেউ ফ্রি হ্যান্ড করে, কেউ যোগ ব্যায়াম, কেউ জগিং। দশ-বারো বছর আগেও ময়দানে এত ভিড় দেখা যেত না। দৌড়তে দৌড়তে বি এন আর তাঁবুর পাশে আসতেই শুভ্র যেন শুনতে পেল ওর দিকে তাকিয়ে কে একজন বলছে, "ওই দ্যাখ শুভ্রনীল চ্যাটার্জি, বেঙ্গল টিমে খেলে।" শুভ্র সেদিকে আর তাকালই না। ইদানীং রাস্তা-ঘাটে এ ধরনের কথা ওকে শুনতে হয়। ছোটদের ফুটবল ম্যাচে প্রাইজ দেওয়ার জন্যও মাঝেমধ্যে ডাক পড়ে। বি এন আর ক্লাবের উল্টো দিকে আই এফ এ মাঠ। ওখানে পিয়ারলেসের কোচিং ক্যাম্পে বাচ্চারা প্র্যাকটিস করে। তাদেরই কেউ একজন হবে।

শুভ্র দৌড়তে খুব মজা পাচ্ছিল। ভবানীপুর মাঠে ও আর ফিরে গেল না। সাংবাদিকদের তাঁবুর পাশ দিয়ে ছুটতে থাকল কার্জন পার্ক লক্ষ্য করে। শক্ত জমির উপর দৌড়লে নাকি পায়ের ডিম আর গোড়ালিতে নানা রকম সমস্যা হয়। শুভ্র মনে মনে বলল, একদিন দৌড়লে কোনও ক্ষতি হবে না। কার্জন পার্কের উত্তর-পশ্চিম

কোণে, রাজ ভবনের গেটের উল্টোদিকে রেলিংয়ের গায়ে ছোট্ট একটা ভিড়। ওই কোণটায় ইঁদুরাবাস। রোজ সকালে গণেশের বাহনদের খাওয়াবার জন্য অবাঙালি মহিলারা আসেন। এত ইঁদুর একসঙ্গে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। পুণ্যার্থীদের পেরিয়ে শুভ্র এগোল ধর্মতলার দিকে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, বউ বাজার ক্রসিং পর্যন্ত দৌড়ে এবার থামল। লালবাজারের দিকে একটা ট্রামকে যেতে দেওয়ার জন্য। তারপর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকল। পৌনে আটটা-আটটার মধ্যেই চড়চড়ে রোদ্দুর। মহম্মদ আলি পার্ক পর্যন্ত হেঁটে শুভ্র আবার দৌড়তে শুরু করল। মহাত্মা গান্ধী রোড, বিডন স্ট্রিট, গিরিশ পার্ক, গ্রে স্ট্রিটের মোড়গুলো ছুঁয়ে এবার ও গতি বাড়াল রাজবল্লভ পাড়ার দিকে। একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছে। অথচ কারও যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগবাজারের কাছে ফুটপাতে দৌড়বার সময় ও প্রায় পা দিয়ে ফেলেছিল একটা বাচ্চা ছেলের পেটে। মাল্টি স্টোরিড একটা বাড়ির গাড়ি বারান্দার নীচে ফুটপাতবাসিনী মা ইটের উনুনে রান্না করতে ব্যস্ত। বাচ্চাটা গড়িয়ে ফুটপাতের মাঝে চলে এসেছে। শুভ্র শিউরে উঠল এ কথা ভেবে, যদি বাচ্চাটাকে মাড়িয়ে দিত, তা হলে কী অবস্থাটা দাঁড়াত।

বাগবাজার থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে শুভ্র আবার হাঁটতে লাগল গ্যালিফ স্ট্রিটের ট্রাম ডিপো থেকে। পাশেই খাল। দু'ধারে ঝোপড় পট্টি। দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ময়লা কাগজ-কুড়ানিদের বাস বেশি এই ঝোপড় পট্টিতে। দ্রুত হেঁটে ও পৌঁছে গেল টালা ব্রিজে। চড়াইয়ের মুখে দৌড়তে শুরু করল। ডানদিকে টালা ট্যাঙ্ক। সেদিকে তাকিয়ে শুভ্র ভাবল, একদিন ট্যাঙ্কের ওপরে উঠতেই হবে। ট্যাঙ্কটা নাকি এত বড় যে কয়েকটা ফুটবল মাঠ এঁটে যায়। প্রাইভেট বাস আর মিনির ধোঁয়া নাকে আসতেই ও মুখ ফিরিয়ে নিল। অনেকে এই ধোঁয়াটা এড়াবার জন্য আজকাল মাস্ক ব্যবহার করছে। বিশেষ করে, স্কুটার বা বাইক চালানোর সময়। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার জায়গা নাকি কলকাতার সব থেকে দূষিত এলাকা। শীতকালের সন্ধ্যায় হাঁটার সময় নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়। ব্রিজ থেকে নেমে বি টি রোড ধরে দৌড়তে দৌড়তে শুভ্র একবার থামল। চিড়িয়া মোড়ের সামনে। আর ঠিক সেই সময় থানার দিকে তাকাতেই ও ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানাতে।

থানা... আগের রাতের দুঃস্বপ্নটা যেন ফিরে এল। উফ্, থানা যে এত খারাপ জায়গা, শুভ্র আগে কখনও তা ভাবতেও পারেনি। দৃশ্যগুলো ভাবতেই বিশ্রী লাগছে। কী নাম ধরে যেন ডাকছিল ওরা সার্জেন্টটিকে... মুখার্জিদা। লোকটা অদ্ভুত ধরনের। একটা লোকের মধ্যে দু' ধরনের সত্তা কীভাবে থাকতে পারে, বাইশ বছরের জীবনে এই প্রথম তা দেখল শুভ্র।

... পুলিশ ভ্যানটা থানা চত্বরে ওয়্যারলেস টাওয়ারের কাছে থামতেই সাদা পোশাকের একজন রুক্ষ স্বরে বলেছিল, "এই, তোরা নাম।" প্রথমে সন্তু নামল। তারপর একে একে অন্যরা। পার্কে আড্ডা দেওয়ার সময় সন্তু গা থেকে টি-শার্ট খুলে রেখেছিল। শুভ্র অবাক হয়ে দেখল, সেটা তখনও পরেনি। খালি গায়েই একবার আড়মোড়া ভেঙে সন্তু বলল, "উফ্, ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।" এমন স্বাভাবিক গলায় ও বলল যে, অন্য তিনজন একটু অবাক হয়েই ওর দিকে তাকাল। ওরা যে একটা বিপদের

মধ্যে পড়েছে, সে সম্পর্কে যেন ওর কোনও উৎকণ্ঠা নেই। সবাই চুপ করে আছে দেখে সন্তু ফের বলল, "এই যে ওয়্যারলেস টাওয়ারটা দেখছিস, এটা আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যায়।" বলেই সন্তু হাই তুলল।

একটু পরেই সাদা পোশাকের এক পুলিশের পিছনে পিছনে ওরা গিয়ে ঢুকল সাব ইন্সপেক্টরদের ঘরে। সন্তু তার আগেই লোকটাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে শুভ্রর কানে কানে একবার বলেছিল, "এদের কী বলে জানিস, খোচর।" এস আই-দের ঘরে শুভ্ররা কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিল। নীচে, মেঝেতে, নোংরা জামা পরা ঘিনঘিনে চেহারার দু'তিনটে লোক বসে। একজন আবার গায়ে পড়ে দিব্যকে জিজ্ঞাসাও করল, "তোদের কী কেস রে? রেপ?"

টেবলের ওপাশে একগাদা কাগজপত্তর। একজন এস আই কথা বলছিল মধ্যবয়স্কা এক মহিলার সঙ্গে। শুভ্র দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার দিকেই তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, "তুমি তো জানোই বাবা, মা-মেয়ে ছাড়া বাড়িতে আমরা আর কেউ থাকি না।"

—জানি, আপনাদের সব খোঁজখবর নিয়েছি।

—তোমরা একটা কিছু ব্যবস্থা করো। না হলে তো আমাকে বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে হবে।

—না, না। বাড়ি বিক্রি করবেন কেন? আমরা আছি কী করতে? আপনি এত রাতে এলেন কেন? মেয়েকে পাঠালেই তো পারতেন।

—আসতে চাইল না বাবা। বড় হয়ে গেছে। নিজে চাকরি-বাকরি করে।

—হ্যাঁ, আপনার মেয়েকে দেখেছি। খুব সেক্সি চেহারার।

ভদ্রমহিলা লজ্জায় মুখ নিচু করলেন। শুভ্র দেখল, ক্ষণিকের জন্য লোভে চকচক করে উঠল এস আই-এর মুখ। কত বয়স হবে লোকটার? অবশ্যই তিরিশের কম। সন্তু পাশ থেকে নিচু গলায় বলল, "শালা এস আইটা মাগিবাজ।"

এস আই টেবলের ওপর পেপার ওয়েট ঘোরাচ্ছে আঙুল দিয়ে। শুভ্র এবার একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, "আমাদের একটা টেলিফোন করতে দেবেন?"

শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল এস আই। সাদা পোশাকের লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এদের কী কেস রে?"

—সাট্টা, সাহাব।

এস আই বলেছিল, মাই গড। নিশ্চয়ই মুখার্জিদা ধরে এনেছেন। কোন পাড়ায় অপারেট করিস রে তোরা?

প্রশ্ন করার ধরনে খুব রাগ হচ্ছিল শুভ্রর। তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলেছিল, "উনি আমাদের ভুল করে ধরে এনেছেন। আমাকে একটা ফোন করতে দেবেন?"

খিকখিক করে হেসে এস আই বলেছিল, "ভুল করেছেন কি না, সেটা মুখার্জিদাই বুঝবেন। লালবাজারের, অ্যান্টি রাউডির লোকেরা চট করে ভুল করে না। তা, উনি না বললে তোদের তো ফোন করতে দেওয়া যাবে না রে।"

শুনে শুভ্র পিছিয়ে এসেছিল। মুখার্জি নামের ওই অফিসার, ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িটা থেকে নেমেই কোথায় চলে গেলেন, আর কোনও পাত্তাই নেই। শুভ্র শেষ চেষ্টা করেছিল, আমরা একবার বাড়িতে খবর দিতে চাই। সেটা কি সম্ভব?

এস আই যেন শুনলই না। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না মাসিমা। মেয়েকে যোগাযোগ রাখতে বলবেন আমার সঙ্গে। দেখি, আপনার ভাড়াটেটাকে কীভাবে ক্যালানো যায়।

মেঝেতে বসা লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে ছিল শুভ্রদের দিকে। একজন বলেছিল, "এখন কি আর তোদের, খবর দিতে দেবে বাড়িতে ? কাল দুপুরে কোর্টে তুলবে। তোদের ফাইন দিতে হবে। তারপর ওখান থেকেই তোদের ছেড়ে দেবে।

লোকটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রানা আর দিব্য। কোর্টে তুলবে, কথাটা শুনে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। শুভ্র স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, ওরা নার্ভ হারিয়ে ফেলেছে। সন্তুটার অবশ্য কোনও বিকার নেই। বেঞ্চের এক কোণে বসে ও ঝিম মেরে রয়েছে।

নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল শুভ্রর। ভ্যানে ওঠার সময় জহরলালকে বলে এসেছিল, রানার বাড়ি খবর দিতে। রানার বাবা নামকরা একটা কাগজের রিপোর্টার। পুলিশ লাইনে প্রচুর জানাশোনা। তবে রাত এগারো-সাড়ে এগারোটার আগে উনি কোনওদিনই বাড়ি ফেরেন না। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন ন'টা- সাড়ে ন'টার সময়। তারপর প্রেস ক্লাব বা অন্য কোথাও আড্ডা মেরে বাড়ি ফেরেন। শুভ্র মনে মনে হিসাব করছিল, রানার মা যদি অফিসে ফোন করেন, তা হলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওর বাবার এসে পড়া উচিত।

... বিছানায় বসে পুরো দৃশ্যটা ভাবতেই ঘেন্না করছিল শুভ্রর। থানার লোকগুলো এত বাজে, অন্য কারও মুখে শুনলে ও বিশ্বাসই করত না। পুব দিকের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে বিছানায়। ওই দিকটায় বড় একটা পুকুর আছে। পুকুরের চারপাশে লাগানো নারকেল গাছ। কয়েকটা আম আর জাম গাছও আছে। শুভ্রর বাবা শখ করে একসময় গাছগুলো লাগিয়েছিলেন। আমগাছে বেশ কিছুদিন হল মুকুল ধরেছে। সুন্দর একটা গন্ধ বিছানায় বসেই পাচ্ছিল শুভ্র। সকালের দিকে এই সময়টায় নানা রকম পাখির ডাক শোনা যায়। জানলা অথবা পিছনের বারান্দা দিয়ে পুবের দিকে তাকালে মনটা খুব শান্ত হয়ে যায়। আগে ওই দিকটা একদম ফাঁকা ছিল। পিসিমণি একবার গল্প করেছিল, পিছনের বারান্দায় দাঁড়ালে রাতের দিকে নাকি তখন দমদম স্টেশন দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেন দেখা যেত।

পায়ের শব্দ শুনে শুভ্র চমকে তাকাল দরজার দিকে। স্নান সেরে পিসিমণি এসে দাঁড়িয়েছেন। শুভ্রকে তখনও বিছানায় বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, আজ প্র্যাকটিসে গেলি না ?"

—না, পিসিমণি, ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না।

—কাল রাতে ফিরতে অনেক দেরি করেছিলি বুঝি ?

শুভ্র ঘাড় নাড়ল। পরের অবধারিত প্রশ্নটা যাতে পিসিমণি আর না করেন, সেজন্য ও জানলার দিকে তাকাল। এই পিসিমণি ছাড়া আপন বলতে আর কেউ নেই শুভ্রর। খুব ছোটবেলায় ওর মা মারা যান। বছর পাঁচেক আগে হারিয়েছে বাবাকে। মা মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই অবশ্য পিসিমণি এ বাড়িতে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে আর শ্বশুরবাড়িতে থাকেননি। নিঃসন্তান পিসেমশাই প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। পিসিমণি সবই তা লিখে দিয়েছেন শুভ্রর নামে। মা বেঁচে থাকার সময়ও

শুভ্র পিসিমণির ভীষণ ন্যাওটা ছিল। সব সময় কোলে কোলে ঘুরত। পিসিমণি ওর কাছে মায়ের চেয়েও বেশি।

পিসিমণির ফর্সা মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ্রর মনে হল, পৃথিবীতে এমন পবিত্র বোধহয় আর কিছু নেই। পিসিমণি জানেন না, পুলিশ কাল রাতে সাট্টাওয়ালা ভেবে ওকে থানায় নিয়ে গেছিল। পিসিমণির চোখে শুভ্রর মতো ভাল ছেলে আর হয় না। ও যেন কোনও খারাপ কাজ করতেই পারে না। পিসিমণির দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুভ্র ভাবল, আচ্ছা এমনও তো হতে পারত... সারা রাত ওদের লক আপে রেখে দিয়ে পুলিশ সকালে বাড়িতে খবর দিতে আসত... পুলিশের মুখে ওইসব বাজে কথা শুনে পিসিমণি তা হলে কী করতেন ? দৃশ্যটা চিন্তা করেই শুভ্র একবার শিউরে উঠল।

—এমন ভ্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে আছিস কেন রে শুভ্র ? পিসিমণি বললেন, "প্র্যাকটিস কামাই হল বলে মন খারাপ ?"

শুভ্র বলল, "পিসিমণি, আমার কাছে এসে একটু বসো না।"

—না, আমার সময় নেই। ঠাকুর ঘরে ঢুকতে হবে। আজ আমি ফলতায় যাচ্ছি। ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে।

—ফলতায় যাচ্ছ কেন ?

—কুসমির শরীরটা খুব খারাপ। একবার দেখে আসতে হবে। আর ক'দিন পরেই দোল। ও সুস্থ না থাকলে ওদিন সব সামলাবে কে ? আর কথা বাড়াস না। বাথরুমে ঢুকে যা। আমি তোর জল খাবারের ব্যবস্থা করে আসি।

পিসিমণি চলে যেতেই শুভ্র বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে সোজা দাঁড়াল আয়নার সামনে। নিজের চেহারা দেখে, নিজেকেই প্রশ্নটা করে ফেলল, "আচ্ছা, আমি কি সাট্টাওয়ালাদের মতো দেখতে ?"

কাল রাতে থানায় অবশ্য সার্জেন্ট-মুখার্জি একবার বলেছিলেন, সাট্টাবাজদের এখন আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই দিবাকরদা। অবশ্য আপনাকে আর কী বলব, আপনি তো সবই জানেন।

দিবাকরদা অর্থাৎ রানার বাবা কথাটা শুনে শুধু হেসেছিলেন। আয়নার দিকে তাকিয়ে সেই দৃশ্যগুলো যেন আবার দেখতে শুরু করল শুভ্র। ... সুনীতিদা আর জ্যোতিদাকে থানার গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন মুখার্জি। উত্তেজনায় ওই দু'জনের কথা ভুলেই গিয়েছিল শুভ্ররা। দু'জনের সঙ্গে দু'একটা কথা সেরে মুখার্জি এস আই-দের ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ার টেনে বসে উনি জেরা শুরু করলেন, কদ্দিন সাট্টায় আছিস এবার বল।

—তোদের বোর্ডে কত টাকা ওঠে ?

—প্যাড-ট্যাডগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ?

—তোদের ওখানে ফটাফট খেলা হয় ?

—বুকির নামটা বল।

কোনও প্রশ্নেরই উত্তর জানা ছিল না শুভ্রদের। বোর্ড, প্যাড, ফটাফট, বুকি— এই সব আজব শব্দ ওরা হাঁ করে শুনছিল।

সার্জেন্ট মুখার্জি চড়া গলায় বললেন, "কী হল, এমন করে তাকিয়ে আছিস, যেন এ

সব কথা কোনওদিন শুনিসইনি।"

বেঞ্চের কোণে সন্তু তখন ঢুলছিল। মুখার্জি হঠাৎ উঠে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে ঠাস করে ওর গালে চড় মারলেন। তারপর এস আই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই বিমল, দেখ তো, গাড়ুটা ড্রাগ নেয় কি না।"

বিমল নামে সেই এস আই উঠে এল সন্তুর কাছে। ওর ডান হাতের আঙুল শুঁকে বলল, "মনে হচ্ছে।"

শুনে বিশ্বাস করতে পারছিল না শুভ্র। সন্তু ড্রাগ নেয়! হতেই পারে না। এতদিন ধরে ও সন্তুর সঙ্গে মিশছে, কোনওদিন তো ড্রাগ নিতে দেখেনি। রানাও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল সন্তুর দিকে। দিব্যর মুখ থানার গেটের দিকে। সন্তু মার খাচ্ছে, এতে ও অন্তত অখুশি নয়। শুভ্র দেখল, চড় খেয়েও প্রতিবাদসূচক কোনও কথা বলল না সন্তু। উলটে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, "দান্তে আর গ্যেটেকে পুলিশ এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল কেন রে?"

ওর মুখে এই কথা শুনে সার্জেন্ট মুখার্জি বললেন, "নেশাটা ভালই ধরেছিস শালা। বিমল, ওর প্যান্টের পকেটটায় দেখ তো কিছু পাস কি না।"

শুভ্র বিস্ময়ভরা চোখে সন্তুকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। ও মজা করছে কি না বুঝতে পারছিল না। মাঝে মাঝে ও এরকম করে। কিন্তু থানায়, এই পরিস্থিতিতে ও ফাজলামি করবে বলে শুভ্রর বিশ্বাস হচ্ছিল না। শুভ্র আরও অবাক হল, যখন দেখল, সার্চ করতে দেওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে সন্তু নিজেই দু' হাত উপরে তুলে ধরেছে। বিমল নামের সেই এস আই সন্তুর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করে আনল। শুভ্র দম বন্ধ করে রেখেছিল সেই সময়। কোথায় যেন ও শুনেছিল, ড্রাগ নিয়ে ধরা পড়লে সাত বছরের জেল অনিবার্য। তখন রানার বাবাও ওকে আর বাঁচাতে পারবেন না।

প্যাকেটটা আগ্রহের সঙ্গে খুলে বিমল হতাশ হয়ে বলল, "ধুস শালা, এ তো একটা প্লাস্টিকের খেলনা।"

মুখার্জি বললেন, "ভাল করে দেখ তো ওটা। এই, খেলনাটা তোর পকেটে এল কী করে?"

সন্তু হেসে বলল, "ওটা ঝুমঝুমির জন্য কিনেছি।"

—ঝুমঝুমি কে?

—এইটুকু একটা মেয়ে। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে। পোলিও হওয়ায় পা দুটো ওর কাঠির মতো। ওকে যদি একবার স্যার দেখতেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত।

বিমল বলেছিল, "মুখার্জিদা, এ তো নাটক করছে।"

পুলিশ যখন সন্তুকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় রানা ফিসফিস করে শুভ্রকে বলেছিল, "বাবা কেন এখনও আসছে না, বল তো?"

শুভ্র অভয় দিয়েছিল, "অধৈর্য হোস না। মেসোমশাই এসে গেলে, আমাদের আর এই নরককুণ্ডে থাকতে হবে না।"

ওরা কথা বলার ফাঁকেই লক্ষ করল, থানার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। দরজার ফাঁক দিয়ে শুভ্রই প্রথম দেখতে পেয়েছিল দিব্যর বাবাকে। পিছনে ওর

দাদা। দিব্যরা বেশ বড়লোক। ওর বাবার বিরাট একটা গোডাউন আছে নবদ্বীপে। তা ছাড়া শোভাবাজারে একটা হোসিয়ারি কারখানাও। দিব্যর দাদা, পল্টুদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়েন।

এস আই-দের ঘরে ঢুকেছিল পল্টুদা। সন্তুর দিকে তাকিয়ে, তারপর দিব্যকে বলেছিল, "কদ্দিন তোকে বলেছি ফালতু ছেলেদের সঙ্গে কখনও মিশবি না।"

সার্জেন্ট মুখার্জি যেন উৎসাহ পেলেন এ কথা শুনে বললেন, "কার জন্য এসেছেন আপনি?"

পল্টুদা দিব্যকে দেখিয়ে বলল, "দিব্যজ্যোতি চৌধুরী। আমার ভাই। মাল্টি ন্যাশনাল একটা কোম্পানিতে চাকরি করে।"

—তাই নাকি! বাঃ। তা, ভাইটা যে গোল্লায় গেছে সে খবর কি রাখেন? আজ ধরা পড়েছে সাট্টার ঠেকে।

পল্টুদা চোখ পাকিয়ে তাকালেন দিব্যর দিকে। বললেন, "ছিঃ ছিঃ তোর এত অধঃপতন হয়েছে। বাড়িতে চল, ব্যবস্থা হচ্ছে।"

বন্ধুদের সামনে হেনস্থা হওয়ায় দিব্যর মুখ কালো হয়ে গেছিল।

কোনওরকমে ও বলল, "দাদা, উনি মিথ্যে কথা বলছেন। তুমি শুভ্রকে জিজ্ঞাসা করো।"

মুখার্জি গর্জে উঠলেন, "চোপ, আমি মিথ্যে বলছি? এই বিমল, ছেলেটাকে এক রাত্তির লক আপে রাখার ব্যবস্থা কর তো।"

পল্টুদা চটে গিয়ে দিব্যকে বললেন, "তোর জন্য পাড়ায় মান-ইজ্জত সব গেল।"

সন্তু পাশ থেকে শুভ্রকে বলল, "দিব্যর এই দাদাটাই নাগের বাজারে মাগিবাজি করতে গিয়ে সেদিন মার খেয়েছিল, না রে?"

শুভ্র ভয় পাচ্ছিল, কথাটা পল্টুদা শুনে ফেলবে। কিন্তু ওই সময় দিব্যর দাদা মুখার্জিকে বলল, "একটু বাইরে আসবেন। আমার বাবা এসেছেন। একটু কথা বলবেন।"

পল্টুদার সঙ্গে মুখার্জি বেরিয়ে যাওয়ার পরই, মেঝেতে বসা একজন দিব্যকে বলল, "যা, তুই বোধহয় খালাস হয়ে গেলি। সার্জেন্ট শালা এ বার মাল খিঁচবে তোর বাপের কাছ থেকে।"

অন্য একটা লোক শুভ্রকে বলল, "তোদের বাড়িতে কেউ লাই?"

শুভ্র অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সার্জেন্ট মাল খিঁচবে, মানে ঘুষ নেবে? শুভ্রর গা ঘিনঘিন করে উঠল। কোনও দোষ না করা সত্ত্বেও, দিব্যকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হবে কেন? পল্টুদার কথাবার্তাগুলো মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না শুভ্রর। থানায় এসে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন দিব্য খুব ভাল ছেলে। বাকিরা সবাই খারাপ। দিব্যর বাবার সম্পর্কেও শুভ্রর ধারণা ভাল নয়। দিব্যর দিদির বিয়ের দিন, হঠাৎই একটা দৃশ্য চোখে পড়ে গিয়েছিল শুভ্রর। দিব্যর মাকে উনি চড় মেরেছিলেন, একটা সফট্ ড্রিঙ্কসের বোতল ভেঙে ফেলার জন্য।

মেঝেতে বসে থাকা লোকগুলোকে খুব অভিজ্ঞ মনে হচ্ছিল শুভ্রর। থানায় আসার অভ্যাস আছে বোধহয়। এস আই-এর ঘরে তখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। রানার বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে শুভ্ররা শেষ পর্যন্ত বসেই পড়েছিল

বেঞ্চিতে। হাত ঘড়ি উল্টে শুভ্র দেখল প্রায় এগারোটা বাজে। ওর ঠিক পায়ের কাছে একটা লোক বসে। ময়লা পাজামা আর টি-শার্ট পরা। লোকটার এমনই ভগ্নস্বাস্থ্য যে বয়স বোঝা যাচ্ছিল না। ওর দিকে তাকিয়ে লোকটা একবার হাসল। কিন্তু সেই হাসিটা প্রথমবারের মতো কুৎসিত মনে হচ্ছিল না শুভ্রর।

যেচে কথা বলল লোকটা, "কোন পাড়ায় থাকিস রে তোরা ?"

উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। তবু শুভ্র বলল, "বিশ্বনাথ পার্ক।"

—অ, ওই পাড়াটা তো রতার এরিয়া।

রতার নাম জানে শুভ্র। ভাল নাম রতন। মাস্তান হওয়ার পর থেকে রতা হয়ে গেছে।

লোকটা এ বার বলল, "কোত্থেকে তোদের ধরেছে ?"

—পার্কের মাঠ থেকে।

—অ, পার্কের মাঠের গায়ে, গলতির পাশে একটা চায়ের দোকান আছে। ওখানেই সাট্টার ঠেক।

শুভ্র শুনে অবাক হয়ে গেল। ওই চায়ের দোকানটা ভাইপোদার। বহু দিনের দোকান। আগে দরমার তৈরি ছিল। ইদানীং কিছুটা হাল ফিরেছে। টিনের ঝাঁপিতে কাঁচা হাতে লেখা চোখে পড়েছে শুভ্রর, ভাইপোদার চায়ের দোকান। পিচবোর্ড কলের লোকদের জন্য সারাদিনই ভিড় ওই দোকানটায়। দুপুরের দিকে ভাত-মাছেরও ব্যবস্থা থাকে আজকাল। মাঝেমধ্যে ভাইপোদার বউ দোকানেই রান্না করে। রতার সঙ্গে ইদানীং খুব ঘনিষ্ঠতা ভাইপোদার। আগে রতার ঠেক ছিল সেভেন ট্যাংকস লেনে। এখন সেটা উঠে এসেছে ওই দোকানে। সারাদিনই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রতা বসে থাকে দোকানটায়। পিচবোর্ড কলের আশ-পাশে সাট্টা খেলার একটা ঠেক আছে, এটা শুনেছিল শুভ্র। কিন্তু সেটা ঠিক কোথায়, তা জানত না।

কাঠের বেঞ্চে কুটকুট করে ছারপোকা কামড়াচ্ছিল। শুভ্র উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময় ও রানার বাবাকে দেখতে পেল। বাইরে দরজার পাশেই মুখার্জির গলা, "দিবাকরদা আপনি এখানে ?"

রানার বাবা বললেন, "আরে, আমার ছেলে আর ওর তিন বন্ধুকে ধরে এনেছে। কী ব্যাপার, তুই এখানে ?"

—এখন আমি অ্যান্টি রাউডিতে আছি। এদিকে আজ রেইড-এ এসেছিলাম। চারটে ছেলেকে আমিই ধরে এনেছি। কী কাণ্ড, আপনার ছেলে আছে, তা তো জানতাম না।

—তুই রানাকে ধরে এনেছিস ! অফিস থেকে এতবার ফোন করলাম থানায়, রিঙ হচ্ছে অথচ কেউ ধরলই না। ব্যাপারটা কী বল তো ?

—দিবাকরদা আপনাদের এ দিকটায় ইদানীং সাট্টা ছেয়ে গেছে।

সি পি-র কাছে বহু কমপ্লেন গেছে। সি পি আমাকে পাঠালেন এ সব বন্ধ করতে।

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। আগে দমদম স্টেশনের আশপাশে একটু আধটু হত। এখন বাড়তে বাড়তে আমাদের পাড়াতেও পৌঁছেছে। পিচবোর্ড কলের আশপাশে কোথাও ওদের ঠেক। ভাবছি, একটা আর্টিকেল লিখতে হবে আমাদের কাগজে।

—আপনি একটু আমাকে সাহায্য করুন দিবাকরদা।

—আমার কাছে একদিন আসিস। পার্কের কাছে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করলেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

—দরকার হবে না। বছর তিনেক আগে একবার আপনার বাড়ি গেছিলাম। আপনার অত মনে নেই।

—আমাদের ওখানে রতা বলে একটা মাস্তান আছে। ওটাকে ধরে আন। পেটা। সব বন্ধ হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে এস আই-দের ঘরে ঢুকলেন রানার বাবা আর মুখার্জি। রানার বাবা শুভ্রদের বললেন, "কী রে, তোরা আমার নাম বলিসনি?"

শুভ্র বলল, "উনি বলার সুযোগ দিলেন কোথায়।"

রানার বাবা হাসলেন। তারপর বললেন, " এই আমার ছেলে। আর এই ছেলেটা শুভ্রনীল। বেঙ্গল ফুটবল টিমের প্লেয়ার। এই ছেলেটা দিব্যজ্যোতি আর এ সন্তু ....সনৎ রায়চৌধুরী।

মুখার্জি হেসে বললেন, "ইস, আগে আপনার কথা একবার বললে কখন ছেড়ে দিতাম।"

রানার বাবা বললেন, "এদের চেহারাগুলো দেখেও তোর মনে মনে সন্দেহ হল না।"

মুখার্জি বললেন, "দিবাকরদা, সাট্টাবাজদের আজকাল আলাদা করে চেনার উপায় নেই। এই কাশীপুর থেকে সেদিন বাবুলালকে যখন ধরলাম, আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছিলাম, ঠিক লোককে ধরেছি কি না। প্রথম দিন তো চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছিল।"

রানার বাবা বললেন, "ঠিকই বলেছিস। তা, এই যে রেইড করলি, আসল লোকটাকে তো ধরতে পারলি না।"

—আজ পারিনি। কিন্তু একদিন না একদিন পারবই। আপনি তো সবই জানেন, কীভাবে ওরা আগাম খবর পেয়ে যায়।

—এই থানারই কেউ হয়তো বলে দিয়েছে।

—মে বি।

রানার বাবা বললেন, "ও সি আছে? এখন তো ও সি বিপ্লব ঠাকুর, তাই না?"

নিচু গলায় মুখার্জি বললেন, "হ্যাঁ। তবে এখন পাবেন কি না জানি না।"

—কেন, ধ্যানে বসে নাকি? ওর তো অনেক দোষ, শুনেছি।

—সবই তো জানেন।

—তাও, দেখি। আছে কি না।

রানার বাবা চলে যেতেই মুখার্জি চেয়ারে এসে বসলেন। টুপিটা টেবলের উপর রেখে, জামার বোতাম খুলতে খুলতে রানাকে বললেন, "তোমাদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। সেদিন অবশ্য পুলিশের উর্দি গায়ে ছিল না। বড় বিপদ থেকে তোমার বাবা আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। আই অ্যম সরি, তোমাদের হ্যারাস করতে হল।"

টেবলের উপর বেলে থাবড়া মারলেন মুখার্জি। বাইরে থেকে একজন উকি মারতেই উনি বললেন, "চিড়িয়া মোড়ে রামুর দোকানটা এখনও আছে?"

—হ্যা সাব।

—এখন রসগোল্লা ভাজার সময়। আমার নাম করে গোটা কুড়ি গরম রসগোল্লা নিয়ে আয়। এই ছেলেগুলোকে একটু মিষ্টিমুখ করাই। নাহলে দিবাকরদা আমাকে কোনওদিন আর বাড়ি ঢুকতেই দেবে না।

...আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখার্জির বলা কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করছিল শুভ্র। একটা মানুষ কয়েক মিনিটের মধ্যে আমূল বদলে যেতে পারে কী করে, ভেবে পাচ্ছিল না। পার্কের মাঠ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর যে লোকটাকে হৃদয়হীন মনে হয়েছিল, সেই লোকটার কী বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার! মুখার্জি বলেছিলেন, "দু'চার দিনের মধ্যেই পার্কের ওই ঠেকটায় আমি বড় অপারেশন করব। তোমরা এখন কিছুদিন ওখানে আড্ডা দিও না। তোমাদের এই বন্ধুটি মনে হয় অসৎ পাল্লায় পড়েছে। পারলে ওকে ফিরিও।" এই কথা বলে মুখার্জি সন্তুকে দেখিয়ে ছিলেন।

ব্রাশ করতে করতে শুভ্র ভাবল, সন্তুর সঙ্গে আলাদা করে ও আর রানা একবার কথা বলবে। সারাদিন ও বরানগরের দিকে কোথাও থাকে। মাঝেমধ্যে দু'একজন বন্ধুর কথা বলে বটে, তবে ওই সব বন্ধু ওর সমকক্ষ বলে মনে হয় না। একজনের নাম চিতা। একবার ওর সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে সিঁথির মোড়ে। বাড়ির ওপর একেবারেই টান নেই সন্তুর। সকালে টিউশনি করতে বেরিয়ে সন্তু অনেকদিন বাড়িও ফেরে না। ও ড্রাগ নেয় বলে শুভ্রর বিশ্বাস হয় না। যদি নিত, শুভ্রকে তা হলে অবশ্যই বলত। সন্তু কোনও কিছু লুকিয়ে করে না।

মুখ-টুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই শুভ্র শুনল ফোন বাজছে। ড্রয়িং রুমে এখন কেউ নেই। পিসিমণি ঠাকুরঘর থেকে এখন বেরোয় না। শুভ্র পা চালিয়ে এসে রিসিভার তুলল।

—হ্যালো, শুভ্রনীল বলছি।

রানার উত্তেজিত গলা শুনতে পেল শুভ্র, "শোন, একটু আগে রতা এসেছিল দলবল নিয়ে। বাবাকে শাসিয়ে গেল।"

—কেন? তোর বাবা ওর কী করেছে। শুভ্র একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল।

—কাল থানায় বাবা ওর নামটা বলেছিল। বোধহয় কেউ চুকলি করেছে। আমার খুব ভয় করছে। একবার আসবি। সন্তুকেও খবরটা দিলে হয়।

শুভ্র বলল, তোর বাবা এখন কোথায়?

—লালবাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস একবার আয়।

"যাচ্ছি।" বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল শুভ্র। তারপর জামাপ্যান্ট পরে বেরোবার মুখে বাগানের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল।

boiRboi.net

সিঙ্গল টু পাত্তি

কানুনগো বাড়িতে সন্তু কলিং বেলটা টিপল বেশ অস্বস্তি নিয়েই। এই বাড়ির ছোট মেয়ে শম্পাকে রোজ সকালে ও পড়াতে আসে। নাগেরবাজারের ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে পড়ে শম্পা। ক্লাস সেভেনে। মেয়েটার মাথা খুব ভাল। চট করে সব বুঝে যায়। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, রোজ সকাল সাতটার মধ্যে সন্তুকে এ বাড়িতে হাজির হতে হয়। শম্পার স্কুলের বাস আসে সাড়ে ন'টার সময়। ওকে ছেড়ে দিতে হয় ন'টার মধ্যে। সন্তুর মাঝেমধ্যেই একটু দেরি হয়ে যায়। আর যে দিন দেরি হয়, সে দিন গম্ভীর হয়ে যায় কানুনগো বৌদির গোলগাল মুখ।

কলিং বেল টেপার পর যে দিন বৌদি দরজা খুলে দেন, আড়চোখে তাকিয়ে সন্তু সেই দিন বুঝতে পারে, ঠিক সময় এসেছে। যে দিন দেরি হয়, দরজা খুলে দেয় কাজের লোক। সন্তুর হাতঘড়ি নেই। বি এ পাশ করার পর বাবা একটা কিনে দিয়েছিল। কিন্তু রতার সঙ্গে একদিন মারপিট করতে গিয়ে সেটা ভেঙে যায়। মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বদলা নিতে গিয়ে ও রতার দুটো দাঁত উপড়ে দেয়। কিনব, কিনব বলেও আর হাতঘড়ি কেনা হয়নি সন্তুর। পালের বাগানের যেখানে ওরা থাকে, তার কাছেই একটা ওষুধ কল আছে। রোজ সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ প্রথম ওই ওষুধ কলের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। প্রথমদিকে সাদা আর ছাইছাই রঙের ধোঁয়া। তার আধঘণ্টা পর থেকে গাঢ় কালো রঙের। ধোঁয়ার রঙ দেখেই সন্তু আন্দাজ করে নেয়, সাতটা বেজে গেছে কি না। শুধু অসুবিধা হয় মঙ্গলবার। ওই দিন ওষুধের কারখানাটা বন্ধ থাকে।

দরজা খুলছে না দেখে সন্তু দ্বিতীয়বার বেল টিপল। কানুনগো বাড়ির সবাই একটা নিয়মের মধ্যে চলে। এরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠে। বছর পাঁচেক এ বাড়িতে ও যাতায়াত করছে। আগে পড়াত শম্পার দিদি পম্পাকে। মাধ্যমিকে তিনটে লেটার নিয়ে পাশ করেছিল পম্পা। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়ই কানুনগোদা ওর বিয়ে দিয়ে দেন। এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার পিছনে একটা কারণ অবশ্য ছিল। সেটা সন্তু ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না।

ভিতর থেকে ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনল সন্তু। দরজার পাল্লা দু'পাশে সরে যেতেই একটা অচেনা মেয়েকে দেখতে পেল ও। বয়স সতেরো-আঠারো। পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, লাল রঙের টি-শার্ট। গায়ের রঙ বেশ ফরসা। চোখ-মুখে অদ্ভুত এক ধরনের শান্তশ্রী। চুল উল্টে বাঁধায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। হাতের অনাবৃত অংশটা এক পলক দেখে সন্তুর মনে হল, মাখন দিয়ে গড়া। একটু তাপে গলে যাবে। ও ভাবল, কী খেলে মানুষের এ রকম চেহারা হয়, শম্পাকে অঙ্ক করতে দিয়ে তা নিয়ে ভাববে।

রিনরিনে গলায় মেয়েটা প্রশ্ন করল, "কাকে চাই আপনার?"

বাড়াবাড়ি রকমের সুন্দরী মেয়েদের সামনে সন্তু খুব অস্বস্তি অনুভব করে। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। তখন অজান্তেই নিজের গালে হাত চলে যায়। মনে হয়, দাড়ি কেটে এলে ভাল করত। আঙুলগুলো আপনা থেকে চুল আঁচড়াতে

থাকে। আজও সন্তু তা করতে থাকল। মেয়েটাকে আগে কখনও কোথাও দেখেছে ? চট করে ও মনে করতে পারল না। কোনও রকমে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে ও বলল, "আমি শম্পার মাস্টারমশাই।"

দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটি। দোতলা থেকে বৌদির গলা শোনা গেল, "কে এল রে, ফুল ?"

ফুল নামের মেয়েটা বলল, "তুলতুলির মাস্টারমশাই।"

মেয়েটার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সন্তু। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ও একবার মুচকি হাসল। ফুল কারও নাম হয় ? ফুলন, ফুলমণি— এ সব তো অবাঙালি মেয়েদের নাম। ফুলদি হতে পারে, ফুলপিসিও। সন্তু ঠিক করল, অতঃপর মেয়েটাকে ও বিউটিফুল নামে ডাকবে।

দোতলায় উঠে বাঁদিকের ঘরে ঢুকতেই সন্তু দেখল, শম্পা পড়তে বসে গেছে। দেওয়াল ঘড়িতে সাতটা বেজে দশ। অর্থাৎ দশ মিনিট দেরি হয়েছে। বিউটিফুল নামের ওই মেয়েটা যখন বলল, তুলতুলির মাস্টারমশাই, তখন ওপর থেকে কানুনগো বৌদি ছোট্ট একটা 'অ' বলেছিলেন। ওই অ-র কী মানে হতে পারে, সন্তু একটু তা নিয়ে ভাবল। সত্যি বলতে কী, এই বৌদিকে ও একটু সমীহ করেই চলে। রতাকেও যা করে না। পম্পা তিনটে লেটার নিয়ে পাস করার পরদিনও উনি প্রশ্ন করেছিলেন, "হিস্টিরিতে ওর তিন নম্বর কম হল কেন সন্তু। টেস্টে তো বেশি পেয়েছিল।" এই বৌদির কোনও নাম এখনও দিতে পারেনি সন্তু।

এই টিউশনিটা করে সন্তু শ'দুয়েক টাকা পায়। ইচ্ছে করলে ও আরও দু'তিনটে ছেলে-মেয়ে পড়াতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করে না। আসলে ওর জীবনে এখন ইচ্ছের খুব অভাব। শম্পাকে পড়াতে বসে ও ঠিক করে ফেলল, এই মাসে টিউশনির টাকা পেলে, ওর ঘড়িটা সারাবে, না হয় তো কিস্তিতে অবশ্যই নতুন একটা কিনে নেবে।

স্কুলের রুটিন দেখে শম্পাকে পড়াতে শুরু করল সন্তু। কাল রাতে থানা থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেছিল। আর একটু হলে ধরা পড়ে যেত। বিমল নামের এস আই-টা যখন প্যান্টের সাইড পকেটে হাত দিয়েছিল তখন ওর কাছে 'পাতা' ছিল। তবে অন্য জায়গায়। তলপেটের দিকের ছোট্ট পকেটে। ধরা পড়ে গেলে, আজ আর শম্পাদের বাড়ি এসে পড়াতে হত না। বিউটিফুলকেও দেখার সুযোগ পেত না। বিমল গাধাটা যখন পাতা খুঁজছে, তখন শুভ্রর মুখটার দিকে একবার চোখ পড়েছিল সন্তুর। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ও ভাবতেই পারে না, সন্তু পাতা খেতে পারে। আরে, সন্তু সব পারে। একদিন শুভ্রর বাড়িতে বসেই পাতা খেতে হবে। যেভাবে বরানগরে চিতার ডেরায় বসে ওরা খায়, সেভাবে। টোবাকোর সঙ্গে মিশিয়ে নয়।

—লাইফ সায়েন্সে কিছু আঁকতে দিয়েছে মাস্টারমশাই। স্কুলের খাতাটা আপনাকে দিয়ে দেব আজ ? শম্পা জিজ্ঞাসা করল।

—দিও। তবে রোববারের আগে পাবে না। সন্তু বলল। স্কুলে আজকাল এই সব ঢঙ হয়েছে। লাইফ সায়েন্সের প্র্যাকটিকাল খাতায় নানারকম জিনিস আঁকতে দেয়। আন্টিরা জানে, ছাত্রীরা আঁকে না। ওদের হয়ে অন্য কেউ এঁকে দেয়। তবু টেস্ট পরীক্ষায় ওই খাতা দেখাতে হয়। সন্তু একসময় খুব ভাল আঁকত। বিয়ের পিঁড়ি

আঁকায় মাস্টার ছিল সন্তু সেইসময়। পাড়ায় কোনও মেয়ের বিয়ে ঠিক হলেই ওর ডাক পড়ত। এখন অবশ্য কেউ ডাকে না।

শুভ্র, রানা আর ও মিলে একবার ওয়াল ম্যাগাজিন বের করেছিল। রানা তার এডিটর। ম্যাগাজিনটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছিল সন্তু, লোকে খুব প্রশংসা করেছিল। নবজাতকের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ওকে একটা প্রাইজও দিয়েছিলেন নীরেনদা। এখন আঁকতে আর ইচ্ছেই করে না। শম্পাকে ও না করে দিয়েছিল দু'একবার। বৌদি অনুরোধ করায়, এখন ও করে দেয়।

শম্পার থার্ড পিরিয়ডে অঙ্ক। ওকে অঙ্ক কষতে দিয়ে সন্তু জানলার দিকে তাকাল। পড়াতে বসে মাঝে মাঝেই ওর মনটা উধাও হয়ে যায়। ভাবতে থাকে, একসঙ্গে দশ কোটি টাকা পেলে ও কী করবে। মনুমেন্টটা কিনে ফেললে কেমন হয়! কত দাম হবে শহিদ মিনারের? এক-দেড় কোটি? নিশ্চয়ই তার বেশি নয়। ওই গম্বুজটায় কিন্তু একটা এয়ার কন্ডিশনড ঘর বানাবে। সেখানে বসে শাসন করবে কলকাতা শহরটা। এই শহরে নাকি টাকা ওড়ে। শহিদ মিনারের ঘরে বসে তা ধরতেই হবে ওকে।

জানলা দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখা যায়। পাশেই ছিল পানা পুকুর। ছোটবেলায় সন্তুরা একবার সব কচুরিপানা তুলে ফেলেছিল পুকুর থেকে। উঠে আসার পর দেখেছিল সবার পায়ে দু'একটা করে জোঁক। নুন দিয়ে মেরেছিল সেই জোঁক। এখন সেই পুকুর নেই। ভরাট করে সেখানে মাল্টি স্টোরিড বাড়ি তুলেছেন খুকুমণিদা। নাম দিয়েছেন নিরালা অ্যাপার্টমেন্ট। চারতলা ওই বড় বাড়িটার দিকে তাকাল সন্তু। সূর্যের আলোয় সাদা রঙের বাড়িটা যেন ঝকঝক করছে। ওই বাড়িতে সবাইকে মানায় না। ওই বাড়িটা বিউটিফুলদের জন্য। আচ্ছা, বিউটিফুল এদের আত্মীয়? আগে তো কখনও দেখেনি। সন্তু একবার ভাবল, শম্পাকে জিজ্ঞাসা করবে। পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নিল। ক্লাস সেভেনের মেয়েরা এখন যথেষ্ট পাকা।

অঙ্ক কষে শম্পা খাতা এগিয়ে দিয়েছে। সন্তু একটু বিরক্ত হল। এত তাড়াতাড়ি সব পেরে গেলে চলে? শম্পা কি একটু ভাবার সময়ও দেবে না? ভাল মেয়েদের নিয়ে এই মুসকিল। সন্তু মন দিয়ে খাতা দেখতে লাগল।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাস্টারমশাই।

মুখ না তুলেই সন্তু বলল, বলো।

—কিছু মনে করবেন না তো?

ওর জিজ্ঞাসা করার ধরনে, সন্তু বিরক্ত হয়েই বলল, "না। বলো।"

—সাট্টা খেলাটা কী মাস্টারমশাই?

প্রশ্নটা শুনে থ মেরে গেল সন্তু। বুকের কাছটা একবার ধক করে উঠল ওর। তবু চোখ-মুখ স্বাভাবিক রেখে বলল, "সাট্টার কথা কার কাছ থেকে শুনেছ?"

শম্পা যেন একটু প্রশ্রয় পেল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, "সাট্টাওয়ালা ভেবে পুলিশ নাকি কাল আপনাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

সন্তু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শম্পার দিকে। খবরটা তা হলে এ বাড়িতেও পৌঁছে গেছে? এত তাড়াতাড়ি? ভিতরে ভিতরে হঠাৎ দুর্বল বোধ করতে লাগল ও। কোনও রকমে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, "পার্কের মাঠে আড্ডা দেওয়ার

সময় পুলিশ আমাদের ভুল করে ধরেছিল। তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ?"

—মায়ের কাছে কেউ এসে বলেছে। মা সকালে বাবাকে বলছিল। আমি শুনে ফেলেছি।

সন্তু আর কথা বাড়াতে চাইল না। শম্পাকে আরও দুটো অঙ্ক দিয়ে ও আবার জানলার দিকে তাকাল। কানুনগো বৌদি রিপোর্টার হলে খুব নাম করতেন। পাড়ায় কারও বাড়িতে যান না। অথচ ঘরে বসে থেকেই পাড়ার সব খবর পান। ওর সঙ্গে রতার যেদিন মারপিট হয়েছিল, পরদিনই সকালে বৌদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া রতার?"

কাল রাতের ব্যাপারটা অবশ্য অন্য। পুরোটাই ওর দোষ। পিচবোর্ড কলের দিকটায় আবছা অন্ধকারে না বসলেই ভাল হত। শুভ্র কিন্তু একবার বারণ করেছিল।

আবার শুভ্রর কথা মনে হতেই সন্তু মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর মতো ভাল ছেলে আর হয় না। পাড়ায় ওর প্রচুর সুনাম। কালকের কথা যেভাবে ছড়িয়েছে, তাতে ক্ষতিটা ওরই বেশি হবে। সবাই বলবে, সন্তুর সঙ্গে মিশে ছেলেটার বদনাম হচ্ছে। লোকে যা বলে বলুক, সে নিয়ে সন্তু মাথা ঘামায় না। শুভ্র নিজে কিছু না মনে করলেই হল।

—সন্তু, যাওয়ার সময় একবার তুমি দেখা করে যেও। বৌদির গলা শুনে সন্তু চমকে তাকাল। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, ও খেয়াল করেনি। বৌদির হাতে একটা বাটি, ডিশ দিয়ে ঢাকা। বাঁহাতে কাচের গ্লাসে জল। টেবলের উপর বাটি আর গ্লাসটা রেখে বৌদি একটু দাঁড়ালেন। সন্তু বুঝে গেল, অপ্রিয় কিছু শোনার সম্ভাবনা আজ নেই। কানুনগো বৌদি যেদিন অসন্তুষ্ট হন, বাটি-গ্লাস সে দিন আনেন না। সকালে সেদিন সন্তুর কিছু খাওয়াও হয় না। খুব বেশি দেরি করে পড়াতে এলেই এটা হয়।

বুকটা কিঞ্চিৎ হালকা হয়ে গেল সন্তুর। বলল, "এখনই বলুন না। শম্পার অঙ্ক শেষ হতে দেরি আছে।"

শম্পার দিকে একবার তাকালেন বৌদি। ওকে মাথা নিচু করে অঙ্ক কষতে দেখে, তারপর বললেন, "দাদার গ্লাস ফ্যাক্টরিতে লেবাররা আবার ঝামেলা করছে। তোমার সেই বরানগরের বন্ধুটাকে একবার বলো, ওদের যেন থ্রেটেন করে দেয়।"

শুনে সন্তু হঠাৎ যেন আকাশে উড়তে শুরু করল। তা হলে থানার ব্যাপারটা নয়। তাড়াতাড়ি ও বলে উঠল, "কিছু চিন্তা করবেন না। আমি আজই বরানগরে গিয়ে চিতার সঙ্গে কথা বলব। লেবারদের দু'একজনের নাম বলতে পারবেন? চিতাকে দিয়ে এমন রগড়ান দেব, জিন্দেগিতে ভুলবে না।"

কথার ধরনে হেসে ফেললেন বৌদি। বললেন, "না, না বেশি মারধোর যেন আবার না করে। তোমার দাদাকে তো জানোই। ভীতুর রাজা। ঝুট-ঝামেলায় যেতে চায় না।"

কানুনগোদা আগে ঘড়ির ব্যবসা করতেন রাজাবাজারে। কী একটা গণ্ডগোল হওয়ায় সেই ব্যবসা তুলে দিয়ে গ্লাস ফ্যাক্টরি করেছেন বরানগরে। পঁচিশ-তিরিশজন লেবার কাজ করে সেই কারখানায়। মাসছয়েক আগে ওরা ইউনিয়ন করেছে। সেই সময় কানুনগোদার সঙ্গে একপ্রস্থ ঝামেলা হয়েছিল লেবারদের। সন্তুর কথায় মধ্যস্থতা করে দেয় চিতা। আবার বোধহয় ওরা কোনও দাবি তুলেছে। বৌদি চলে যেতেই

শম্পাকে পড়ানোয় মন দিল সন্তু। পড়ানোর ব্যাপারে ওর সুনাম আছে এ বাড়িতে। কোনও কারণে সেটা নষ্ট করতে চায় না।

পড়ানো শেষ করার মুখে হঠাৎ সেই রিনরিনে গলা শুনতে পেল সন্তু, "তুলতুলি, তোর মাস্টারমশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

শম্পা বলল, "ফুলদি, ঘরে এসো না।"

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন না।"

—একটা কথা বলার ছিল। এ পাড়ায় তরুলতা মুখার্জি বলে কোনও মহিলাকে চেনেন ?

বিউটিফুলের গলা এমন মিহি যে, প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। সন্তু বলল, "ঠিকানাটা বলতে পারেন ?"

—না, ঠিক জানি না।

—তা হলে তো খুঁজে বের করা মুসকিল। উনি কি অনেকদিন ধরে এখানে আছেন ?

—হ্যাঁ। আসলে উনি আমার মায়ের বন্ধু। ছোটবেলার। মাঝে অনেকদিন মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আমরা দিল্লিতে ছিলাম বলে। কিছুদিন হল, বাবা ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছেন। মা শুনেছিলেন, ঘুঘুডাঙায় নাকি তরুমাসি থাকতেন। অ্যাড্রেস জানেন না।

—আপনার বাবা কোথায় চাকরি করেন ?

—পি আই বি-তে।

—আপনারা এখানে কোথায় থাকেন ?

শম্পা বলল, "নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে, মাস্টারমশাই। ফুলদিরা তিনতলায় থাকে।"

বারান্দায় ডাইনিং টেবলে বোধহয় বসে আছেন কানুনগো বৌদি। ওখান থেকেই বললেন, "ফুল তোমার দাদার সম্পর্কের বোনের মেয়ে। নিরালা বাড়িটা যখন তৈরি হচ্ছিল, খুকুমণিবাবুকে বলে আমিই ওদের একটা ফ্ল্যাট কিনিয়ে দিয়েছি।"

সন্তু বারান্দায় বেরিয়ে এল। প্রায় ন'টা বাজে। বিউটিফুলকে ও বলল, "দু-তিনটে দিন আমাকে সময় দিন। খুঁজে বার করবই।"

বৌদি বললেন, "আমিই ফুলকে বললাম, সন্তুকে গিয়ে বল। পারলে ও-ই তোর তরুমাসিকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

... ন'টার ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই সন্তু বেরিয়ে এল কানুনগো বাড়ি থেকে। একবার ভাবল, শুভ্রদের বাড়িতে যাবে। দু'পা এগোতেই হঠাৎ ওর মনে পড়ল, এখন তো ও বাড়ি থাকবে না। নিশ্চয়ই প্র্যাকটিসে গেছে। উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সন্তু। পেট এখন ভর্তি। চার ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্তি। হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন দিয়ে হাঁটার ফাঁকে ডানদিকে ও একবার পুকুরটার দিকে তাকাল। মিত্তিরদের ওই পুকুরটায় একসময় কালো টলটলে জল ছিল। এখন কচুরিপানায় ভর্তি। দু'পাশে দুটো বাঁধানো ঘাট অবশ্য এখনও আছে, তবে ভাঙাচোরা অবস্থায়। রোজ বিকালে ফুটবল খেলার পর সন্তুরা রকে একটা মেয়েকে রোজই বসে থাকতে দেখত। সিনেমার নায়িকা মমতাজের মতো দেখতে ছিল সেই মেয়েটা। কৃষ্ণা অথবা

কাবেরী... এই ধরনের একটা নাম ছিল মেয়েটার। দিব্য একবার লাইন মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মেয়েটা পাত্তাই দেয়নি। বছর চারেক আগে ওর বিয়ে হয় এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে। কী কারণে যেন বিয়েটা টেকেনি। এই ক'দিন আগে দমদম স্টেশনে মেয়েটাকে দেখে চমকে উঠেছিল সন্তু। কী বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে এখন, চেনাই যায় না। মিত্তির বাগান পুকুরের পাশ দিয়ে কখনও হেঁটে গেলে সন্তু মেয়েটার সেই আগেকার চেহারা এখনও মনে করতে পারে।

হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন দিয়ে মিত্তির বাগানের রাস্তায় ঢুকতেই ও দেখতে পেল খুকুমণিদাকে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি আর পাজামা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। এ দিকে কোথায় গেছিলেন খুকুমণিদা ? ইদানীং বহুদিন ওঁকে হাঁটতে দেখেনি সন্তু। মারুতি করে যান আর আসেন। নিরালা অ্যাপার্টমেন্টের গ্যারেজে ওঁর দুধ-সাদা মারুতিটা যেতে-আসতে অনেক সময় চোখে পড়ে।

সন্তুকে দেখতে পেয়ে খুকুমণিদা বললেন, "আরে, তোমার খোঁজেই এদিকে এসেছিলাম। সন্তু ভাই, আমার একটা উপকার করতে হবে। খুব বিপদে পড়েছি।"

সন্তু একটু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার ?"

—বরানগরে আমি বহুদিন আগে একটা জমি কিনেছিলাম ফ্ল্যাট করার জন্য। সেটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে।

—বরানগরে কোথায় ?

—কুটিঘাটের কাছে। যে ছেলেগুলো ঝামেলা করছে, শুনলাম ওদের সঙ্গে তুমি মাঝেমধ্যে আড্ডা মারতে যাও।

—কী চাইছে ওরা বলুন তো ?

—হাজার কুড়ি টাকা। ওরা কী একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করে। খেলার নাম করেই চাইছে। না হলে নাকি কাজ শুরু করতে দেবে না। এক সপ্তাহ ধরে লেবাররা বসে রয়েছে। আমার খুব লস হয়ে যাচ্ছে ভাই। তুমি একটা রফা করে দাও মাঝখানে থেকে।

খুকুমণিদার কথা শুনে সন্তু হেসে ফেলল। এ সব ব্যাপারে এখন চট করে ও বুঝে যায়। নিশ্চয়ই চিতার কাজ। ও আশ্বস্ত করার জন্যই বলল, "ঠিক আছে, আমি বলে দেব।"

খুকুমণিদা বললেন, "তোমাকে তো ধরাই মুসকিল। কানুনগোদার বাড়িতে শুনলাম সকালের দিকে রোজ পড়াতে যাও। আজ তোমাকে ধরতে গিয়ে দেখি, বেরিয়ে এসেছ।"

সন্তু বলল, "আজ ওদের সঙ্গে কথা বলে, কাল আপনাকে জানিয়ে দেব।"

—একতলায়। ঢুকেই বাঁদিকে। আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

খুকুমণিদাকে দেখলেই সন্তুর আজকাল একটা মুখ মনে পড়ে যায়। খুব মায়া মাখানো সেই মুখ। খুকুমণিদার বাড়ির দিকে মন টানে। ছুটে যেতে চায়। সন্তু আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে কাল একবার ওই বাড়িতে যেতে পারবে।

খুকুমণিদা চলে যেতেই, সন্তু বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। গায়ের টি-শার্টটা ঘামে ভিজে গেছে। পাল্টে নেওয়া দরকার। আরভিং ওয়ালেসের একটা বই আর্ধেক পড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেটা শেষ করে রানাকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। রানার কাছ

থেকে বই চেয়ে এনে পড়ার অভ্যাস ওর অনেকদিনের। রানাই ইংরেজি সাহিত্যে উৎসাহী করে তুলেছে ওকে। এক এক সময় সন্তুর মনে হয়েছে, ইংরেজি নিয়ে পড়লে খুব ভাল করত। রানা এখন আমেরিকানদের লেখা বই খুব কেনে। ওদের অবস্থা সচ্ছল। তাই কিনতে পারে। সন্তুর বই কেনার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমেরিকানদের লেখা কোন বই সদ্য বাজারে এল, সেই খবর খুব রাখে। রানাকে ও সেই খবর দেয়। রানাদের সঙ্গে এখন থেকে কোথায় দেখা হবে ঠিক নেই। পার্কের মাঠে আড্ডা দেওয়া চলবে না কিছুদিন। এটা ভাবতে ভাবতেই সন্তু একবার দাঁড়াল ভোম্বলদার দোকানের সামনে। কয়েকটা সিগারেট কিনে রাখা দরকার। কাল রাতে টোবাকো ফুরিয়ে গেছে। কেনার জন্য সিঁথির মোড় যেতে হবে। এ পাড়ায় পাওয়া যায় না। ওকে দেখে আপ্যায়ন করল ভোম্বলদা, "আসুন সনৎবাবু, অনেকদিন যে এদিকে আসেনই না।"

এ পাড়ায় ভোম্বলদাই একমাত্র ওকে সনৎবাবু বলে ডাকে। বাড়তি খাতির করে। গত বছর ভোম্বলদার বড় মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। সন্তু ওকে কয়েকদিন তখন পড়িয়ে দিয়েছিল। এই কারণে মাঝেমধ্যে ভোম্বলদার কাছ থেকে ধারে সিগারেট পাওয়া যায়।

পালের বাগানে সন্তুদের বাড়িটা একতলা। টালির চালের তিনটে ঘর। সামনে এক চিলতে উঠোন। বহু বছর আগে পালদের বাগানবাড়ি ছিল এই অঞ্চলটা। একবার পালদের আমন্ত্রণে কয়েকদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে ওই বাগানবাড়িতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণদেব। ধ্যানে বসতে যাতে তাঁর অসুবিধা না হয়, তার জন্য পালরা পঞ্চবটি বনের অনুকরণে একটা অখণ্ডমণ্ডলাকার বেদি তৈরি করে দিয়েছিলেন। বেদির মাঝে অশ্বত্থ গাছটা এখন বিরাট। সন্তুদের বাড়িটা ঠিক ওই বেদির গা ঘেঁষে। সন্তুর বাবা চাকরি করতেন কাশীপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরিতে। খুব সস্তায় জমিটা কেনেন। ছোটবেলায় সন্তু বহুবার ওই বেদিতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব হয়েছে।

দূর থেকেই সন্তু দেখল কাকার বউ ওই বেদির একপাশে বসে। বাড়িতে ও, কাকা এবং কাকার বউ ছাড়া আর কেউ থাকে না। খুব ছোটবেলায় সন্তু ওর মাকে হারায়। বাড়ির উঠোনে একটা কাঁঠালি চাঁপার গাছ আছে। সন্ধেবেলায় সুন্দর একটা গন্ধ উঠোনে ম ম করে। বাবা একবার বলেছিল, গাছটা নাকি মায়ের পোঁতা। সংসার করার খুব ইচ্ছে ছিল মায়ের। তাই বোধহয় বেশিদিন বাঁচলেন না। ওই কাঁঠালি চাঁপা গাছটাই মায়ের স্মৃতিচিহ্ন।

কাকার বউয়ের সঙ্গে সদ্ভাব নেই সন্তুর। শুভ্র একবার অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, কাকার বউকে কেন কাকিমা বলিস না ? ওর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব। তবু ওকে সব কথা বলা যায় না। এ সব মিঠে ডাকগুলো তৈরি হওয়ার জন্য একটা সম্পর্ক থাকা দরকার। গাণ্ডু কাকাটার জন্যই সেই সম্পর্কটা কোনওদিন তৈরি হতে পারেনি। লাইনের ওপারে জপুরের মেয়ে কাকার বউ। কাকা হঠাৎ একদিন বিয়ে করে, ঘরে এনে তুলেছিল। জেসপ কোম্পানিতে কাজ করত কাকা। বছর কয়েক আগে, ধর্মঘট হল কোম্পানিতে। সেই সময় ছাঁটাই হয়ে যায়। এখন কাকা ছোটখাটো ঠিকাদারির কাজ করে।

বাড়িতে সন্তুর ঘরটা সারাদিন প্রায় হাট হয়ে থাকে। কাকার বউ বাকি দুটো ঘর

দখল করে নিয়েছে। সন্তুর ঘরে একটা তক্তপোশ আর একটা আলমারি ছাড়া আর কিছু নেই। বাড়িতে যে সময়টুকু ও থাকে জানলার ধারে তক্তপোশে শুয়ে-বসেই কাটিয়ে দেয়। পাশের বাড়িটা চাঁদুদাদের। ওরাও বহুদিনের বাসিন্দা এই অঞ্চলের। চাঁদুদার মেয়ের নাম ঝুমঝুমি। যার জন্য সন্তু দু'দিন ধরে একটা খেলনা কিনে রেখেছে। পোলিও হওয়ায় ঝুমঝুমি ও বাড়ির বারান্দাতেই বসে থাকে। জানলা দিয়ে সন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। বাড়ির আর কারও সঙ্গে খুব দরকার না হলে ও কথা বলে না।

সন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজায় এসে দাঁড়াল কাকার বউ, "সন্তু রে সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোর কাকা পালিয়েছে।"

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল সন্তুর। কী বলল কাকার বউ! ঠিক বুঝতে না পেরে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ও বলল, "কা-কা পালিয়েছে মানে?"

—এই দ্যাখ, একটা চিঠি রেখে গেছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানায় নেই। টেবলে দেখি, এই চিঠি বাটি চাপা দেওয়া। এখন আমার কী হবে রে সন্তু!

কাকার বউ একটা চিরকুট এগিয়ে দিল। গলায় সত্যিকারের উদ্বেগ। যন্ত্রচালিতের মতো চিরকুটটা হাতে নিল সন্তু। এ সংসারে একমাত্র রোজগেরে লোক কাকাই। সে পালানো মানে পেটে টান পড়বে অন্য দু'জনের। চিরকুটটার দিকে নজর দিতেই দেখল মোদ্দা কথায় লেখা, ব্যবসায় প্রচুর টাকা দেনা। শোধ করার ক্ষমতা নেই। আমি চললাম। তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করে নিও।

চিরকুটটা আবার কাকার বউয়ের হাতে ফিরিয়ে দিল সন্তু। চারটে বানান ভুল। অর্থাৎ কাকারই লেখা। সন্তু ধপ করে বসে পড়ল তক্তপোশের ওপর।

কাকার বউ এগিয়ে এসে, দু'হাত ধরল সন্তুর। বলল, "একটা কিছু কর। তোর জন্যই এখনও বসে আছি। মাসখানেক ধরে পাওনাদাররা তাগাদা দিচ্ছিল। দু'একদিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারলে, মারবে ভয় দেখিয়েছিল।"

কাকার বউ এখনও বোধহয় বাসিমুখে। সন্তুর গা ঘিনঘিন করে উঠল। পরিষ্কার বাতাস নেওয়ার জন্য ও জানলার দিকে সরে গেল। এই মহিলাটিকে ও কোনওদিন সামনাসামনি কোনও সম্বোধন করেনি। জানলার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয়।"

—কী করে জানব। চন্দননগরে যাবে বলে মনে হয় না। গোবরা যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ।

চন্দননগরে শ্বশুরবাড়ি কাকার। শ্বশুর-শাশুড়ি অবশ্য বেঁচে নেই। শালা-শালাজরা বাড়ি করে ওখানে উঠে গেছেন। ওঁদের সঙ্গে কাকার বউয়ের সম্পর্ক খুব খারাপ। কাকার শালা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ভদ্রলোক খুব কালচার্ড। এদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ারই কথা।... গোবরা-তে থাকেন সন্তুর পিসি। সেখানেও যাওয়ার মুখ নেই কাকার।

কাকার বউ বলল, "একবার থানায় খবর দিলে হয় না? যা না।"

থানায়! আবার! সন্তু কথাটা পাত্তাই দিল না। দুঃসংবাদ শোনার ধাক্কাটা ও সামলে উঠছে। সব ফালতু ঝামেলা। আমি চললাম... এর মানেটা কী। পাওনাদার মারবে... দেখুক তো কেউ গায়ে হাত দিয়ে... সন্তু থাকতে কাকার গায়ে কেউ হাত

দিয়ে চলে যাবে... এমন মাস্তান এখানে কেউ আছে ? ভাবল.. আরভিং ওয়ালেসের বইটা আজ শেষ করে ফেলবে... বোধহয় তা হবে না। প্রথমে অল্প অল্প বিরক্তি, তারপর চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল সন্তুর।

কাকার বউ তাগাদা দিল, "কী রে, চুপ করে আছিস কেন ?"

সন্তু গম্ভীর গলায় বলল, "দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও।"

কথাটা বলল বটে, সন্তু কিন্তু মোটেই কাকাকে নিয়ে ভাবতে চাইল না। কাকার বউয়ের ওপর এখন বেশ রাগ হচ্ছে। শালা, তোমার সোয়ামী, খোঁজার দায়িত্ব তোমার। আমার তাতে কী আসে-যায়। আর সোয়ামী না, হাতি। এখন পতিব্রতা সাজা হচ্ছে ! থুঃ। সন্তু মনে মনে বলল, নীলু হাজরা গাণ্ডুটা যদি শোনে, কাকা পালিয়েছে ... নিরুদ্দেশ, তা হলে এক মিনিটও সময় নেবে না এ বাড়িতে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করতে।

কাকার বন্ধু বলে মাঝেমধ্যেই নীলু হাজরা এ বাড়িতে আসে। কাকার বউয়ের সঙ্গে পিরীতের সম্পর্ক। সন্তুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, বাবা। লোকটা হারামির বটগাছ। সোনার কারবার করে। মাঝে একবার বোম্বাই না কোথায় গেছিল। ফিরে একদিন এসেছিল এ বাড়িতে। বেছে বেছে দুপুর বেলায়। শালা, ভালমতন জানে ওই সময় কাকা বাড়িতে থাকবে না। নিজের ঘরে শুয়ে সন্তু তখন উপন্যাস পড়ছিল। বারান্দায় কাকার বউকেও দেখতে পাচ্ছিল। শুয়ে শুয়েই দেখল, মুখ হাসিতে ভরিয়ে, কাকার বউ দু'হাত মাথার পিছনে দিয়ে খোপা সামলাচ্ছে। সেভাবেই উঠোনের দিকে নেমে গেল দ্রুত পায়ে।

ওই খচ্চরটা এলেই কাকার বউয়ের দুটো হাত খোপা সামলাতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন ভঙ্গি করে যেন লাস্যময়ী তারকা। নীলু হাজরার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে তখন। ভাবতেই লজ্জা করে সন্তুর, ওই সময় কাকার বউয়ের বুকের দিকে তাকিয়ে নীলু হারামিটা কী যেন খোঁজে।

—কী ভাগ্যি হাজরাদা...তবু বোম্বে থেকে ফিরে আমার কথা মনে রেখেছেন। আসুন, আসুন। কাকার বউয়ের সাদর আহ্বান শুনে সন্তু মুখ ফিরিয়ে বইয়ের দিকে সেদিন মন দিয়েছিল। তার আগেই ও হাজরাকে এক ঝলক দেখে ফেলেছিল। শালার হাতে ছোট্ট একটা প্যাকেট।

—রমেন নেই ?

—না। ও তো সেই সাত সকালে বেরিয়ে গেছে।

—এ হে। তা হলে তো সন্ধেবেলায় এলেই ভাল হত।

—তাতে কী হয়েছে। আমি বুঝি কেউ না।

—সন্তুটাকেও যে দেখছি না।

—ও ঘরে। আপনি ঘরে আসুন না।

—না, না। তা হলে যাই। বিয়ের মরসুম আসছে। এখন কাস্টোমারদের ভিড় খুব দোকানে।

—বাব্বাঃ। এত পয়সা খাবে কে আপনার নীলুদা। সংসারে প্রাণী বলতে তো আপনারা তিনজন।

—একটা জিনিস এনেছিলাম ছবি, তোমার জন্য। কলকাতায় এ জিনিস পাওয়া

যায় না। এমন জিনিস তোমাকেই মানায়।

ডায়লগগুলো কানে আসছিল সন্তুর। ও কান খাড়া করে ছিল, জিনিসটা কী জানার জন্য। কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তারপর উজ্জ্বল হাসি কাকার বউয়ের, "বাব্বা, হাজরাদা আপনি পারেনও। এত জিনিস থাকতে .. . গিন্নির জন্য এনেছেন ?"

—তোমার মাথা খারাপ ! ওকে এসব মানায় ! মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে জিনিসটা শো কেসে দেখেই প্রথমে তোমার কথা মনে হল। মাপে হবে তো তোমার ? একটু পরে দেখো না।

—সাইজ কত ?

—ছত্রিশ। কারুকার্যটা দেখেছ ? বিদেশি মাল। দোকানের লোকটা বলল, সিঙ্গাপুরের।

তখন হাসছিল কাকার বউ। বলল, "আপনার বন্ধু যদি কোনওদিন জিজ্ঞেস করে কোত্থেকে পেলে, কী বলব, হাজরাদা এনে দিয়েছে ?"

নীলু হাজরা গলায় এক বালতি আবেগ ঢেলে বলেছিল, "সব দিন পরে এটা নষ্ট করো না ছবি। শুধু আমার সামনে পরে বেরোবে। কথা দাও।"

ডায়লগ শুনে গা পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল সন্তুর। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, জানলা দিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মারে। কিন্তু ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত ও দমন করে ফেলে। উঁকি না দিয়েও ও বুঝে গিয়েছিল জিনিসটা কী। মনে মনে একবার বলেছিল, আমার শালা কী। যার বউয়ের চরিত্রে এত ময়লা, সে বুঝুক।

বউয়ের এই সব ফস্টিনস্টি কি কাকা জানে না ? অবশ্যই জানে। কাকাটার একদম গার্ডস নেই। ঢঙ করে চিরকুট লিখে পালানো ... শালা, এখন খোঁজার দায়িত্ব এই সন্তুকে নিতে হবে। মাজাগি আর কী। কাকার বউটা ... মনে হচ্ছে সত্যিই খুব ঘাবড়ে গেছে। আরও ঘাবড়ে দিতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে পিরীত করার মজাটা আজ টের পাওয়াতে হবে। কাকার বউয়ের মুখের দিকে তাকাল সন্তু। বয়স কত হবে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ ? নাকি তারও কম। চোখমুখ ফোলা ফোলা। মাজা মাজা রঙ। কপালে আবার ময়ূরপঙ্খী টিপ লাগিয়েছে। একটা খারাপ কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সেটা চেপে রেখে ও মনে মনে বলল, কাকা যদি সত্যিই কোনওদিন আর ফিরে না আসে, এই মেয়েছেলেটার কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। নীলু হাজরা আছে। আমার এমনিই কোনও ভূত-ভবিষ্যৎ নেই। কাকা থাকলেই কী, গেলেই কী— ছেলে পড়িয়েও দু'বেলা চলে যাবে। কাকার বউটাকে আজ বেকায়দায় পাওয়া গেছে। কাঁদাতে হবে।

খুব সিরিয়াস মুখে সন্তু বলল, "কাকা সুইসাইড করে বসেনি তো ?"

—ওঃ, না। অস্ফুট গোঙানির শব্দ ছিটকে বেরোল কাকার বউয়ের মুখ থেকে। আঁচল উঠে এল মুখের কাছে। ভয়, প্রচণ্ড ভয় এখন সারা মুখটা জুড়ে। সন্তু আরও কঠিন হল। ডান দিকের বুকের কাছটায় আঁচল সরে গিয়েছে। সন্তু আন্দাজের চেষ্টা করল, হাজরার দেওয়া জিনিসটা কাকার বউ এখনও পরে আছে কি না।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল কাকার বউ। পাশের ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সন্তু বেশ আনন্দ পেল মনে মনে। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের

করল। কাল রাতে পার্কের মাঠে আড্ডা দেওয়ার সময়ই টোবাকো শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা সিগারেট অর্ধেক করে, বাকিটা বাক্সে রেখে দিল। তারপর তক্তপোশে আধ শোয়া হয়ে, আয়েস করে অর্ধেকটা ধরাল। সন্তুর দৃঢ় বিশ্বাস, কাকা আর যাই করুক, সুইসাইড করবে না। সুইসাইড করার জন্য কিছু সাহস থাকা দরকার। কাকার সেটা নেই। ধোঁয়ার কয়েকটা রিঙ ছেড়ে সন্তু মনে মনে বলল, কাকার আসল প্রবলেমটা কী ?

সিগারেট টানতে টানতেই সন্তু এবার মনস্থির করে ফেলল। কাকার ঘরে বহুদিন ও ঢোকেনি। উঠে, ওই ঘরের চৌকাঠে পা রেখে একটু জোরেই বলল, "হাজরা কাকাকে একবার খবর দিলে হত না ?"

বিছানায় উপুড় হয়ে ফোঁপাচ্ছিল কাকার বউ। উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "পারলে ওকে একবার ধরে নিয়ে আয়। এই বিপদে হাজরাদা ছাড়া...।"

কথা শেষ করতে দিল না সন্তু। গলা খাকরি দিয়ে বলল, "পুলিশ-হাসপাতাল পরে করা যাবে। জগা পাগলার থানে একবার গেলে বোধহয় কিছু হদিশ পাওয়া যেত।"

অকূলে যেন পাথার পেল কাকার বউ। সাগ্রহে বলল, "তাই যা। তা হলে পাঁচ সিকে পুজোও দিয়ে দিস।"

সবজি বাগানে জগা পাগলার ভর হয়। মনসা ঠাকুরের ওই মন্দিরে শনি-মঙ্গলবার দুপুরে বেশ ভিড় থাকে। স্নান সেরে জগা পাগলা পুজো করতে বসে। তারপর হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে ঠাস করে পড়ে যায়। সেই সময় ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তর দেয়। কাকার বউ বেশ কয়েকবার সেখানে গেছে। সন্তু জানে, জগা পাগলার উপর অন্ধ বিশ্বাস কাকার বউয়ের।

আঁচলের গিঁট খুলে কাকার বউ পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল সন্তুর দিকে।

সেটা হাতে নিয়ে সন্তু বলল, "এতে হবে ?"

—আরও পাঁচটা টাকা তা হলে নিয়ে যা।

হাতে দশ টাকা ... মনে মনে হিসাব করতে লাগল সন্তু ... দিনটা খারাপ যাবে না। আজ যা অবস্থা, বাড়িতে নিশ্চয় হাঁড়ি চড়বে না। একদিন না খেলে কাকার বউয়ের কিছু যাবে-আসবে না। কিন্তু বেলা দুটোর পর থেকেই খিদে নামক জন্তুটা মোচড় মারতে থাকবে সন্তুর পেটে। দশ টাকায় ভাইপোদার দোকানে পোনা মাছ দিয়ে ভাত-ডাল। মন্দ জমবে না। এরপরও পাতা কেনার পয়সা থেকে যাবে। ভাইপোদার দোকানে আর যাওয়া উচিত হবে কি ? মনে হয় না। গতকালই ও জেনে গেছে, পুলিশের নজর আছে এই দোকানটায়। ধুৎ, তাতে কোনও অসুবিধা নেই। সিঁথির মোড়ে এ রকম অনেক দোকান খোলা আছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্তু হাঁটতে থাকল সোনাপট্টির দিকে। নীলু হাজরা ভাল পয়সা করেছে। গয়নাটা নাকি বেশ ভাল তৈরি করে। পাঁচ-সাতজন কারিগরও আছে ওর দোকানে। সোনার কাজ-টাজ যারা করে, তারা দু'নম্বরি হয়। শালা, হাজরাটাও দু'নম্বরি। বাড়িতে বউ আছে, মেয়ে আছে। তবুও আশনাই করতে আসে পালের বাগানে। সোনাপট্টি থেকে পালের বাগান—প্রায় আধ কিলোমিটার পথ। হাজরা অবশ্য স্কুটারে আসে।

বেলা দশটা-সোয়া দশটা বাজে। কড়া রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে সন্তুর জল তেষ্টা

পেল। একটা কোকোকোলা খেলে হয়। মাস কয়েক আগে কোকোকোলা বাজারে এসেছে। এখনও সন্তু চুমুক দেয়নি। প্রথম প্রথম তো পাওয়াই যাচ্ছিল না। এখন ঢেলে বিক্রি হয়। একবার খেতে ইচ্ছে করা সত্ত্বেও সন্তু হাঁটতে লাগল। পাঁচ টাকার একটা নোট নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এর চেয়ে রাতে চিতার ঠেকে গিয়ে পাতা খাওয়া অনেক ভাল। মনটা হালকা হয়ে যায়। শরীরটা শূন্যে উঠে পড়ে। সকালে বিউটিফুল নামের সেই মেয়েটাকে দেখার পর থেকে, পাতা খাওয়ার ইচ্ছেটা বাড়ছে।

পিচবোর্ড কলের গলতি দিয়ে সোনাপট্টির দিকে যেতে সন্তুর আবার মনে পড়ল মেয়েটাকে। শুভ্রদের মতো ভাল ছেলে ছাড়া ওই মেয়েটার সঙ্গে আর কারও প্রেম হতে পারে না। সন্তু হঠাৎ পুলক অনুভব করল। যতদূর ও জানে, শুভ্রর কোনও প্রেমিকা নেই। পাড়ার কোনও মেয়ে ... ওর যোগ্যই নয়। একটা মেয়ের কথা দু'-একবার ও বলেছে। সন্তু একবার মেয়েটাকে দেখেওছে কলেজ স্ট্রিটে। গড়িয়াহাট না কোথায় যেন থাকে। সাউথ ক্যালকাটার কোনও মেয়ের সঙ্গে সন্তু কোনওদিন কথা বলেনি। কলেজ, ইউনিভার্সিটি ... ওর সব কিছুই উত্তর কলকাতায়। মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলায় কোনও উৎসাহ বোধ করে না শুভ্র। এ আগ্রহটা আছে দিব্য আর রানার। এ পাড়ায় রানাই একমাত্র ছেলে, যার সঙ্গে সমবয়সী সব মেয়ে কথা বলে।

মনে অদ্ভুত একটা ভাবনা এল সন্তুর। এই বিউটিফুল মেয়েটার সঙ্গে শুভ্রর পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়! শুভ্রর নিশ্চয়ই অপছন্দ হবে না। এই কথাটা মনে হতেই সন্তু মনে মনে ঘটকালি শুরু করে দিল। মনে মনে বলল, আমি যদি কোনও সময় প্রচুর ক্ষমতাবান হই, এ বিয়েটা আমি দেবই। পিসিমণিকে রাজি করানো, কোনও সমস্যা হবে না। বিউটিফুলের বাবা-মা? ওরা কারা তা জানি না। ওরা যদি শুভ্রকে না চায় ... গুলি করতেও আমি পিছপা হব না। সন্তু ডান হাতের তর্জনীটা পিস্তলের মতো ধরল। বিউটিফুলের অচেনা বাবা-মাকে লক্ষ্য করে দু'বার ফায়ারও করল।

সোনাপট্টি পৌঁছে দূর থেকে সন্তু দেখতে পেল নীলু হাজরাকে। ওকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য ও মনে মনে গল্প খুঁজতে লাগল। এমন গল্প যাতে কাছা খুলে নীলু খচ্চরটা দৌড়ে যায় পালের বাগানে।

—হাজরা কাকা। গলায় খানিকটা নাটকীয়তা এনে সন্তু চাপা স্বরে ডাকল নীলু হাজরাকে। ক্যাশবাক্সের সামনেই উনি বসে। আড়াল পড়ে যাওয়ায় সন্তু বুঝতে পারল না, লুঙি পরে আছে কি না। লুঙি পরা লোকদের ও সহ্য করতে পারে না। মুখটা যথাসম্ভব করুণ রাখার চেষ্টা করে ও উঠে এল দোকানটায়।

ক্যাশবাক্সের সামনে বসে এক ভদ্রমহিলা। গয়না মাপাচ্ছেন। বিয়ের মরসুম আসছে, দোকানে তাই বেশ ব্যস্ততা। সিলিং থেকে কয়েকটা বাতি নেমে এসেছে। ছোট্ট টুলের ওপর সোনার কাজ করছে কারিগররা। ঘরের ওই অংশটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। বছর খানেক আগে ডাকাতি হয়েছিল হাজরার দোকানে। বোধহয় সামলে নিয়েছে।

সন্তুর ডাকে তাকাল হাজরা। বলল, "কী ব্যাপার সন্তু। তোমার চোখ-মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

সন্তু ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে, একটু ইতস্তত করে বলল, "কাকা বাড়ি ছেড়ে চলে

গেছে। চিরকুটে লিখে গেছে আর কোনওদিন ফিরবে না।"

হাজরার মুখটা হা হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বলল, "কাল বিকালের দিকে এসে মাল নিয়ে যাবেন। মনে হয়, কোনও অসুবিধা হবে না।"

—ঠিক আছে, আমাকে ডোবাবেন না। বলে ভদ্রমহিলা উঠে পড়লেন। উনি দোকান থেকে নেমে যাওয়ার পরই হাজরা বলল, "কাকার কী হয়েছে বললে?"

—পালিয়েছে। পাওনাদারদের ভয়ে। হাজরার ঘাড়ের কাছে বড় একটা আব। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বলে সন্তু সেটা দেখতে পেল। ওদিকে তাকিয়ে থেকেই ও আবার বলল, "বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি আজ।"

হাজরা বলল, "এ সব কী বলছ তুমি! ছবি এখন কোথায়?"

—বাড়িতেই। সুইসাইড করতে চায়।

—সে কী! আর্তনাদ করে উঠল হাজরা, "আমরা থাকতে ছবিকে সুইসাইড করতে হবে! রমেনটা একটা রাসকেল। বুঝলে সন্তু, কিছু মনে করো না ... তোমার কাকা একটা দিনের জন্যও বউটাকে সুখে রাখতে পারল না। ছবির কথা ভাবলে ... কষ্ট হয়।"

হাজরার পাছায় একটা লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল সন্তুর। তবু গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে ও বলল, "তাই আপনার কাছে আমাকে পাঠাল। বলল, এই বিপদের সময় হাজরাদা ছাড়া আমাদের পাশে আর কেই বা দাঁড়াবে। গেলে এখুনি যান। না হলে, কী অবস্থায় দেখতে পাবেন, জানি না।"

হাজরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল এ সব শুনে। সন্তু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, গাণ্ডু কাকাটাকে খোঁজার জন্য আর সময় দিতে হবে না। ও নিশ্চিন্তে এবার রওনা দিতে পারে বরানগরে। কানুনগোদা আর খুকুমণিদার কাজ দুটো করে দিতে হবে। হাজরার দোকান থেকে সন্তু নেমে এল। বাইরে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর। হেঁটে বরানগর যেতে অন্তত মিনিট কুড়ি লেগে যাবে। টি-শার্টটা ঘামে ভিজে, গায়ে লেপ্টে রয়েছে। ওটা বদলানো দরকার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তু বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। আর তখনই দেখল, স্কুটারে চেপে ওর পাশ দিয়েই হাজরা হুস করে বেরিয়ে গেল।

... কিছুক্ষণ পর বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু হাজরার স্কুটারটা উঠোনে দেখতে পেল। কাকার ঘরের দরজা বন্ধ। একটু থমকে দাঁড়িয়ে, কী মনে হওয়াতে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে সেঁধিয়ে গেল। কাকার বউয়ের গলা পাচ্ছে এ ঘর থেকে।

—আমার কী হবে হাজরাদা। আমাকে ফেলে এইভাবে ও চলে গেল। যে করেই হোক, ওকে আপনি খুঁজে আনুন।

হাজরার গলা, "ছবি সোনা, উতলা হয়ো না।"

শোক আরও উথলে উঠল, "মেয়েদের স্বামীই যদি কাছে না থাকল, তা হলে এই শরীরটার আর দাম কী, বলুন হাজরাদা। আমার সর্বস্ব আপনাকে দিচ্ছি হাজরাদা ... শুধু ওকে এনে দিন।"

সন্তু কান খাড়া করে রইল। কান্না, ফোঁপানি আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। এরপর আর কোনও শব্দ নেই। সন্তু একটু উত্তেজনা বোধ করল। একটা কৌতূহল তীব্র হয়ে, ধাক্কা দিতে লাগল ওকে। কাকার বউয়ের বাসি মুখটা মনে পড়তেই হঠাৎ ওর

গাটা গুলিয়ে উঠল। ও এখন আন্দাজ করতে পারছে .. কাকার বিছানায় নীলু হাজরা কী করছে। ক্ষীণ গোঙানির শব্দও ওর কানে এল পাশের ঘর থেকে। চাপা একটা রাগ ক্রমশ দু'হাতে জড়ো হচ্ছে। এই রকম রাগ ও আর একবারই অনুভব করেছিল, রতাকে পেটানোর সময়। এক লাথি মেরে কাকার ঘরের দরজাটা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল ওর একবার। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বললও, বাস্টার্ড। কাকা, কাকার বউ ... এই বাড়ি ... এই ঘর ... সব কিছুর উপর হঠাৎ বিতৃষ্ণা অনুভব করল সন্তু। নিঃশব্দে ও উঠোনে নেমে এসে কাঁঠালি চাঁপা গাছটার কাছে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ডালপালাগুলো ছুঁতেই বুকের ভেতর থেকে উঠে এক দলা বাষ্প গলার কাছে এসে আটকে গেল।

ঝাপসা চোখেই হঠাৎ ও দেখতে পেল সদর দরজার সামনে একটা সাইকেল রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। রিক্সা থেকে দ্রুত নেমে এল হারানদা। অবাক হয়ে সন্তু দরজার দিকে এগোতেই হারানদা বলল, 'সন্তুবাবু, এখুনি চলেন ... দাদাবাবু আপনাকে যেতি বলেছে।"

পাত্তি

সওয়ারির আশায় কুমার আশুতোষ স্কুলের সামনে রিক্সা নিয়ে অপেক্ষা করছিল হারান। অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে অবশেষে ও ঠিক করল আটটা পঞ্চান্নর লোকালে যদি কোনও সওয়ারি না পায়, তা হলে খালি রিক্সা নিয়েই ফিরে যাবে। আগে স্টেশনের এই দিকটায় রাত ন'টা-সাড়ে ন'টাতেও গমগম করত। দোকানপাট সব খোলা থাকত। সওয়ারি পেতে কোনও অসুবিধা হত না। রাত দশটায় নেত্র সিনেমার নাইট শো ভাঙলে রিক্সা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এখন সিনেমায় তেমন ভিড়ই আর হয় না। কদাচিৎ, ভাল বই এলে লোকে টিকিট নিয়ে মারামারি করে। টিভিতে রোজ সিনেমা দেখায়। শুভ্র দাদাবাবু একবার বলেছিল, ওই জন্যই নাকি লোকে সিনেমা হলে যেতে চায় না।

রিক্সার সিটের ওপর ঠেস দিয়ে বসেছিল হারান। ওর চোখের সামনেই সিনেমার এটা বিরাট পোস্টার। একবারের বেশি ওই সব পোস্টারে তাকানো যায় না। একটা মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। শাড়িটা গায়ের সঙ্গে লেপটানো। খালি গায়ে একটা ছেলে ওই মেয়েটার নাভির কাছে মুখ ঠেকিয়ে রয়েছে। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর, ফর্সা, লম্বা, পেটানো চেহারা। অনেকটা শুভ্র দাদাবাবুর মতো। তবে দাদাবাবুর চুল অত লম্বা নয়। ফুটবল খেলে বলে ছোট ছোট করে কাটে। পোস্টারের ছেলেটার কোমরে একটা স্টেনগান ঝোলানো রয়েছে। হারানের খারাপ লাগে এই সব জিনিস দেখলে। হিংসা জিনিসটা মোটেই ভাল নয়। গান্ধীজি সব সময় এ কথা বলতেন। উনি যদি বেঁচে থাকতেন, সিনেমায় এত মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কখনওই হতে দিতেন না।

পোস্টারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে হারান একবার স্টেশনের সিঁড়ির দিকে তাকাল। স্কুলের কাছ থেকে আগে স্টেশনের সিঁড়িটা পরিষ্কার দেখা যেত। কয়েক বছর আগে, তিন মাথার মোড়ে স্বামীজির একটা মূর্তি বসানো হয়েছে। মূর্তিটা এখন

অবশ্য দেখা যায় না। বেদির চারপাশ ঘিরে হকারদের স্টল গজিয়ে উঠেছে। স্বামীজির কানে রেক্সিনের ব্যাগ ঝোলে। তবে এই হকারগুলো রাত আটটার মধ্যেই চলে যায়। বেশির ভাগ ডানকুনি লাইনের। পৌনে আটটার পর, ওই লাইনে আবার ট্রেন আসে সেই সাড়ে দশটায়।

ইদানীং রাত ন'টার পর থেকে স্ট্যান্ডে আর রিক্সা পাওয়া যায় না। রাজাবাগানে গোখনার ডেরায় তখন সাট্টার রেজাল্ট বেরোয়। রিক্সাওয়ালাদের একটা বড় অংশ ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্টেশন আর নেত্র সিনেমার মাঝে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান আছে। সেখানে দিনভর প্যাড লেখে পেন্সিলাররা। বাজারের আনাজওয়ালা থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা— সবাই আজকাল সাট্টা খেলে। খেলাটা কী, হারান জানত না। কানাইদার ছেলে রাতু একবার বলেছিল, এক টাকা খেলে ও নাকি একবার একশো পঁচিশ টাকা পেয়েছিল। রাত ন'টার পর রেজাল্ট বেরোলেই গোখনার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়। সাট্টা নিয়ে হারান এত দিন মাথা ঘামায়নি। আজ সকালে ওই ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো কোনওদিন মাথা ঘামাতও না। নেত্র সিনেমার পাশে ওই চায়ের দোকানটার দিকে চোখ পড়তেই হারানের সব কথা মনে পড়ে গেল।

...সকালে শুভ্র দাদাবাবু তাড়াহুড়ো করে কোথায় যেন বেরোচ্ছিল। হারানও রিক্সা বের করবে বলে তখন তৈরি হচ্ছে। নকশালদের কাছে সেবার মার খাওয়ার পর থেকে শুভ্র দাদাবাবুদের বাগানের এক পাশে, মালিদের পরিত্যক্ত একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছে হারান। নকশালরা এমন মেরেছিল যে ওকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়। আর জি কর থেকে বেরোবার পর, ঘুঘুডাঙ্গায় ফিরে এসে ও বসেছিল যতীনদার দীপ্তি ধৌতাবাসের রকে। নকশালরা ওর রিক্সাটা ভেঙেচুরে দিয়েছিল। হারান বুঝতে পারছিল না, কী করবে। সেদিনই শুভ্র দাদাবাবুর পিসিমণি ওকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে যান। দাদাবাবু সেই সময় সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দাদাবাবুকে রোজ স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার কাজটা পিসিমণি দিয়েছিলেন হারানের ওপর। নতুন একটা রিক্সাও উনি কিনে দেন। গত আঠারো-উনিশ বছর ধরে হারান শুভ্র দাদাবাবুদের বাড়ির একপাশেই রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম নিজে রান্না করে খেত। পিসিমণি এখন সেটাও করতে দেন না। দুপুর-রাতে খাবার পাঠিয়ে দেন মনার মায়ের হাত দিয়ে।

... শুভ্র দাদাবাবুকে বেরোতে দেখে ঘর ছেড়ে বাগানে এসেছিল হারান। দাদাবাবু ধর্মতলার দিকে গেলে বাইক নিয়ে যায়। সেটা আন্দাজ করেই ও গ্যারাজের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, বাগানের টিনের গেটটা খুলে রতা ঢুকছে, সঙ্গে আরও একটি ছেলে। হারান থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

বিশ্রী গলায় রতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "অ্যাই, তুই শুভ্র, না ?"

দাদাবাবু একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিল।

—কাল রাতে থানায় গিয়ে আমার নামে কী বলেছিস ?

হারান স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, শুভ্র দাদাবাবুর মুখটা লাল হয়ে গেল।

দাদাবাবুকে ও কোনওদিন রাগতে দেখেনি। কাউকে তুই-তোকারিও করতে দেখেনি। দাদাবাবু পালটা বলল, "এই বাড়িতে ঢোকার সাহস হল কী করে তোর ?"

প্রশ্নটা শুনে যেন একটু থমকে গেল রতা। পরক্ষণেই ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে

উঠেছিল, "ভাল ছেলে, ভাল ছেলের মতো থাকবি। আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবি না। একদম ফালা ফালা করে দেব।"

দাদাবাবু বলেছিল, "ভুল জায়গায় ভয় দেখাতে এসেছিস রতা। পারিস তো, রানার বাবার কাছে এখনই ক্ষমা চেয়ে আয়।"

—ও, খবর পৌঁছে গেছে তা হলে!

—ভাল চাস তো, এ পাড়া থেকে আজই সাট্টা ঠেক তুলে নিয়ে চলে যা।

—অ্যাই, অ্যাই, আমাকে ধমকাচ্ছিস নাকি?

ঠিক ওই সময় হারান দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিল। রতাকে বহুদিন ধরে ও জানে। দু'হাতে চাকু চালায়। ও রতাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলেছিল, "ঠিক আছে, তুমি এখন বাইরে যাও।"

রতার সঙ্গী ছেলেটা হঠাৎ বলেছিল, "শুয়োরের বাচ্চাটাকে পরে মাপা যাবে রতাদা। চলো, গোখনাদার কাছে যাই।"

বাগানের গেট পর্যন্ত যেতে যেতে খিস্তি-খেউড় করেছিল রতা। শুভ্র দাদাবাবু গুম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বলেছিল, "সন্তুটাকে একবার ধরে আনো তো হারানদা। আমি রানাদের বাড়িতে যাচ্ছি। ওখানে যেও।"

সন্তু দাদাবাবু ওই সময় থাকলে হয়তো খুনোখুনি বেঁধে যেত।

শুভ্র দাদাবাবুর মতো ঠাণ্ডা মেজাজের তো নয়। দুম করে হাত চালিয়ে দিত। হারান সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা বের করে দৌড়েছিল পালের বাগানের দিকে।

... সওয়ারির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সকালের ঘটনাগুলো ভাবছিল হারান। সন্তু দাদাবাবুকে পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা! বার তিনেক ঘুরে আসতে হয়েছিল ওঁর বাড়ি থেকে। বাড়িতে কেউ থাকে না। থাকলেও সাড়া দেয় না। সন্তু দাদাবাবুর কাকিমাটা যেন কী রকম। ওই বেলাতেও বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। চার বারের বার হারান যখন সন্তুবাবুর দেখা পেল, তখন ওঁরও চোখ-মুখ গম্ভীর। সন্তুবাবু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী হয়েছে গো হারানদা? শুভ্র কি বাড়িতে?"

রিক্সা চালাতে চালাতেই হারান বলেছিল, "না, রানাবাবুদের বাড়িতে রয়েচে। তোমাকে নে যেতে বলেছে।"

—ওঃ, বুঝেছি।

রানাবাবুদের বাড়িতে পৌঁছবার আগেই হারান সব কথা জানিয়ে দিয়েছিল। শুনে সন্তুবাবু বলছিল, "শুভ্রকে থ্রেটেন করতে রতা বাড়ি গেছিল! দাঁড়াও, আজ রাতেই শালার বাকি ক'টা দাঁত ফেলে দেব।"

... সারাদিন উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছে হারান। সন্তুবাবুকে পৌঁছে দিয়েই ও চলে গিয়েছিল রিক্সা খাটাতে। দুপুরে খেতে গিয়ে শুনেছিল, শুভ্র দাদাবাবু ফেরেনি। পাড়ার অবস্থা, নকশালরা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে বেশ ভাল ছিল কয়েক বছর। আবার অশান্তি শুরু হয়েছে। আবার হিংসা, মারামারি, বোমাবাজি...। হারান ভেবে পায় না, গুটি কয়েক লোকের জন্যই এই অশান্তি। সবাই মিলে বেরিয়ে এসে কেন ওদের শায়েস্তা করে না। দীপ্তি ধৌতাবাসের যতীনদা তো কাউকে ভয় পায় না। ওর দোকানে গান্ধীজির বড় একটা ছবি আছে। গান্ধীজিই হয়তো সাহস জোগান।

নকশালদের আমলে হিংসা কম দেখেনি হারান। রোজ রোজ খুন। এই অঞ্চলের

সব নকশাল ছেলেকে ও চিনত। প্রথম দিকে সবাই ছিল পাড়ার ছেলে। পরের দিকে নতুন নতুন মুখ দেখত। চোখ-মুখ দেখে ওদের কাউকে মনে হত না, খুন করতে পারে। কথাবার্তা বলত চমৎকার। মনে হত সব লেখাপড়া জানা ছেলে। পুলিশের ওপর কেন ওদের এত রাগ ছিল, কে জানে ?

সেই দৃশ্যটা এখনও হারানের চোখের সামনে ভাসে। শুভ্র দাদাবাবু তখন মায়ের কোলে। ওঁর অসুখ করেছিল। বিশ্বনাথ পার্ক থেকে দাদাবাবুর মা আর পিসিমণিকে তুলে ও যাচ্ছিল স্টেশনের কাছে রাম ডাক্তারের চেম্বারে। পেয়ারাবাগানে অমৃতলাল ওঝা স্কুলের কাছে একদল ছেলে রিক্সা আটকাল। পুরো অঞ্চলটা সেদিন অন্ধকার।

সওয়ারিদের দেখে একটা ছেলে বলেছিল, "মাসিমা, ওদিকে এখন যাবেন না।"

শুভ্র দাদাবাবুর মা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাচ্চার অসুখের কথা বলতেই অন্য একটা ছেলে হারানকে বলেছিল, "ঠিক আছে, চলে যাও। পর্দাটা নামিয়ে দাও। অন্য কোনওদিকে তাকাবে না।

সাইকেল রিক্সা বাঁক নিয়ে, ছবি তোলার দোকানের কাছে পৌঁছতেই হারানের চোখে পড়েছিল, ল্যাম্প পোস্টে আগুনে ঝলসাতে থাকা একটা দেহকে। ওই রাস্তাটুকু পেরোবার সময় আর ডানদিকে তাকাতে পারেনি। সেদিন যে কীভাবে ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছেছিল, হারান আজও মনে করতে পারে না। চেম্বারে গিয়ে শুনতে পেয়েছিল, নকশালরা একজন পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়েছে।

... সিনেমা হলে নাইট শোর হাফ টাইমের বেল পড়তেই হারানের মনে পড়ল, পিসিমণি চিরতা কেনার জন্য পয়সা দিয়েছিলেন। রোজ সকালে খেলতে যাওয়ার আগে শুভ্র দাদাবাবুর অভ্যেস চিরতার জল খাওয়ার। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। রাতে পিসিমণি গ্লাসে ভিজিয়ে রাখেন। স্কুলের উল্টোদিকেই দশকর্মার দোকান। একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। হারান রিক্সা থেকে নামল। চিরতা কিনে রাস্তার এপাশে আসতেই ও দেখল, মোটা মতো একটা লোক রিক্সায় চেপে বসেছে। পায়ের কাছে চামড়ার একটা সুটকেস।

দেখে হারান একটু বিরক্তই হল। চট করে ও কাউকে ওর রিক্সায় বসতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করে, তারপর সওয়ারি তোলে। অনেকবাজে অভিজ্ঞতা আছে ওর। স্টেশন থেকে নেমে একবার মোটামতন এক স্বামী-স্ত্রী ওর রিক্সায় উঠে সিঁথি মোড় যেতে চেয়েছিল। পেয়ারা বাগানের মুখে পুলিশ রিক্সা আটকায়। স্বামী-স্ত্রীর কোমরের কাছ থেকে পুলিশ হেরোইন প্যাকেট উদ্ধার করেছিল। বনগাঁ বর্ডার থেকে সব বেআইনি মাল আসে। এই রাস্তা দিয়ে পাচার হয়ে যায়।

রিক্সায় বসা লোকটাকে হারান চিনতে পারল না। মনে হল, এই অঞ্চলে নতুনই। বোধহয় ব্যস্ততা আছে। বলল, "কাঠগোলা যাব। কত নিবি ?"

কথা বলার ভঙ্গি শুনে হারান ঠিক করে নিল, সওয়ারি নিয়ে যাবে না। ভাড়ার কথা না তুলে ও পালটা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সুটকেসে কী আছে ?"

লোকটা হঠাৎ চটে উঠল, "সুটকেসে যাই থাক, তাতে তোর দরকার কী ?"

এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে হারান অভ্যস্ত। সারাদিনে অন্তত বার পাঁচেক ও এই কথা শোনে। কথা না বাড়িয়ে ও বলল, "আপনি নেমে যান। কাঠগোলার দিকে আমি যাব না।"

গজগজ করতে করতে লোকটা নেমে পড়ল, "তোদের আস্পর্ধা খুব বেড়ে গেছে। ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো হয়ে গেলি। এই জন্যই তো তোরা মার খাস।"

বয়স এখন পঞ্চান্নর বেশি। তাই এসব শুনে হারান আর রাগ করে না। স্ট্যান্ডের রিক্সাওয়ালারা অনেকেই ওকে পাগলা হারান বলে ডাকে। হারান তা জানেও। রিক্সার সিট তুলে ও চিরতার প্যাকেট ভিতরে রেখে দিল। একবার তাকিয়ে দেখল, লোকটা বংশীর রিক্সায় উঠেছে। এদিকে তাকিয়ে কী যেন বলছে।

স্টেশনের কাছটায় এখন লোকজন কম। মিষ্টির দোকানের দুই কারিগর উনুনে আঁচ দিচ্ছে। আর একটু পরেই রসগোল্লা আর লেডিকেনি ভাজতে বসবে। দোকানের সামনের রাস্তাটা প্রতিদিনই জল দিয়ে এই সময়টায় ওরা ধোয়। এই দোকানে খুব ভাল খাস্তা কচুরি পাওয়া যায়। সন্ধে বেলায় ভিড়ও হয় প্রচুর। খদ্দেরদের ফেলে দেওয়া শালপাতা, মাটির ভাঁড় দোকানের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। দোকানে ফাইফরমাস খাটা ছেলেদুটো সেই সব ঝাঁট দিয়ে বড় একটা ড্রামে তুলে রাখে। রোজ দেখে দেখে হারানের সব মুখস্ত হয়ে গেছে। স্কুলের নীচে কাপড়ের দোকানের মালিক বলাই দাস কাঠের পাল্লা সাজিয়ে এখন তালা দিচ্ছে দোকানে। হারান জানে, দোকান বন্ধ করার পর একটুকরো কাপড়ে আগুন ধরিয়ে, বলাই দাস সিঁড়ির সামনে রাখবে। তারপর কারও উদ্দেশে পাঁচ ছয়বার প্রণাম করে, হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে পথিক সঙ্ঘের দিকে। বৃষ্টির রাত ছাড়া কখনও লোকটা রিক্সায় চড়ে না।

রাম ডাক্তারের চেম্বারটা এখনও আছে। তবে উনি এখন আর বসেন না। ওঁর এক ভাইপো হোমিওপ্যাথি পাস করে ডাক্তার হয়েছে। সেই বসে রাতের দিকে। চেম্বারের পাশে টেলিফোন করার একটা দোকান বসিয়েছে মুকুলবাবু। বেশ কাঁচ-টাচ দিয়ে সাজানো। রাত বারোটা অবধি দোকান খোলা রাখে মুকুলবাবু। আগে নকশাল করতেন। সি পি এম ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করার সময় বোমা মারতে গিয়ে ওর ডান হাতটা উড়ে যায়। এখন সেটা ঢাকার জন্য পঞ্জাবি পরে থাকেন। ডান দিকের হাতাটা ঢল ঢল করে ঝোলে।

বাড়িই ফিরে যাবে কি না, হারান চিন্তা করছিল। ওদিকের কোনও প্যাসেঞ্জার পেলে ভাল হত। প্যাডেলে চাপ দিতে যাচ্ছে। এমন সময় মুকুলবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল শ্যামলী দিদিমনিকে। সঙ্গে আরও একজন মেয়ে। শ্যামলী দিদিমণি মাঝে মাঝেই আসে শুভ্র দাদাবাবুদের বাড়িতে পিসিমণির কাছে। ওকে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে যেতে দেখে হারান হর্ন বাজিয়ে ডাকল, "দিদিমণি, এদিক পানে এসো।"

স্টেশনের রিক্সা স্ট্যান্ডে হারান কখনও রিক্সা দাঁড় করায় না। অন্য রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে ওর খুব সদ্ভাবও নেই। ওরা প্যাসেঞ্জারের গলা কাছে।

গলা কাটে। স্টেশন থেকে বিশ্বনাথ পার্ক নিয়ে যেতে তিন টাকা চায়। সিঁথি মোড় পাঁচ টাকা। স্ট্যান্ডে ইউনিয়ন আছে। ওরাই মিটিং করে ভাড়া বাড়ায়। হারান ইউনিয়নের মেম্বার নয়। ওরা অনেকবার বলেছিল। মেম্বার করতে পারেনি। এই অঞ্চলে প্রথম যখন ও রিক্সা চালাতে শুরু করল, তখন মিউনিসিপ্যালিটি একটা দর বেঁধে দিয়েছিল। হারান এখনও সেই ভাড়া নেয়। প্রথম প্রথম অন্য রিক্সাওয়ালারা

খুব চটে যেত। কম ভাড়া নেয় বলে ওর সঙ্গে বাকবিতন্ডাও হত। হারানের ওই এক যুক্তি, "তোমরা ভাড়া বাড়াবার কে ? গরমেন্ট যবে বাড়াবে, তবে বেশি ভাড়া নেব।"

এই অঞ্চলটা এখন যে আর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে নেই, সেটা হারান জানে না। গান্ধীজি লোককে ঠকাতে বারণ করেছিল। ও সেটাই মনে প্রাণে জানে। অন্য রিক্সাওয়ালারা এখন আর হারানকে ঘাটায় না। লাইনের বাইরে থেকে সওয়ারি তুললেও কিছু বলে না। নকশালদের কাছে ওর মার খাওয়ার ঘটনা সবাই জানে।

শ্যামলী দিদিমণি হাসল হারানকে দেখে। মুখ ফিরিয়ে অন্য মেয়েটাকে বলল, "এই রিক্সায় এসে ওঠ রে ফুল্লরা। আমার চেনা।"

দু'জন রিক্সায় বসতেই হারান প্যাডেলে চাপ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল। এই শ্যামলী দিদিমণিকে ও ছোট্টবেলা থেকে দেখছে। শুভ্র দাদাবাবুর থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। বরদাবাবুর মেয়ে। কথাবার্তায় খুব ভাল। বিশ্বনাথ পার্কে আগে ওরা ভাড়া বাড়িতে থাকত। এখন ফ্ল্যাট কিনেছে নিরালা বাড়িতে। বরদাবাবু খুব সৎ প্রকৃতির লোক। পাড়ায় ওর খুব সুনাম। বহুদিন আগে নাকি খবরের কাগজে ওর একবার নাম বেরিয়েছিল। কোন একটা ব্যাঙ্কে নাকি কাজ করত। একদিন এক বিধবা মেয়েছেলে লকার থেকে গয়না তুলে, ভুলে ফেলে রেখে যায়। কয়েক লাখ টাকার গয়না। সেই পুঁটলি বরদাবাবুর চোখে পড়ে। যদি বাড়ি নিয়ে আসত, কেউ ধরতেও পারত না। বরদাবাবু তা করেনি। খুঁজে খুঁজে সেই গয়না ফেরত দিয়ে আসে। এই কারণে বরদাবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে হারান। জানতে ইচ্ছে করে, উনিও গান্ধীজিকে মানেন কি না।

সিটে বসে দিদিমণিরা কথা বলছে। শ্যামলী দিদিমণি বলল, "দিল্লিতে তোর দাদু-দিদা কোথায় থাকে রে ?"

—লক্ষ্মীবাই নগরে।

—তুই ফোন করাতে অবাক হয়নি ?

—হবে না আবার ! বাপীকে এত করে বলছি, টেলিফোন যাতে বাড়িতে তাড়াতাড়ি আসে ব্যবস্থা করো, গা-ই দিচ্ছে না। দিল্লিতে আমাদের বাড়িতে দু'টো ফোন ছিল।

—তোর দাদু-দিদা কী বলল রে ?

—খুব খুশি। খবরটা দিতে না পেরে এতক্ষণ আমার মনটা ছটফট করছিল শ্যামলীদি। ভাগ্যিস তুমি এখানে নিয়ে এলে, তাই এস টি ডি করতে পারলাম। দিদা বলল, একটা ভি সি আর কিনে পাঠিয়ে দেবে।

—বাঃ তাহলে তোদের বাড়িতে বসে রোজ সিনেমা দেখতে পাব। কোন কলেজে ভর্তি হবি রে ?

—দেখি। বাপী বলছে ব্রাবোর্নে। দেখি কী হয়।

—এখান থেকে যাতায়াতে অসুবিধা হবে কিন্তু। বরং যদি পারিস প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়ে যা।

এই সব টুকরো কথা শুনে হারান বুঝল, দিদিমণি পরীক্ষায় পাস করেছে। ও মনে মনে বলল, আমাদের শুভ্র দাদাবাবুও যেবার পাস করেছিল, পাড়ার সবাই খুব ভাল বলেছিল। দাদাবাবুর মাথা খুব ভাল পড়াশুনায়।

—শুভ্রদা কি কলকাতায় আছে হারানদা ? শ্যামলী দিদিমণির প্রশ্ন শুনে হারান

একবার পিছনে তাকাল।

—হ্যাঁ দিদিমণি।

—পিসিমণি ?

—উনি ফলতায় গেছেন।

—কবে আসবেন ?

—আজ-কালের মধ্যেই।

—শুভ্রদা কান্নাকাটি করছে না তো ? পিসিমণি-ছাড়া ওঁর জগত তো অন্ধকার।

—পিসিমণি তো আজ সক্কালেই গেচেন।

শ্যামলী দিদিমণি হাসতে লাগল। শুভ্র দাদাবাবুর কাছে মাঝে মধ্যে পড়া দেখাতে আসে দিদিমণি। অনেকদিন আগে, একবার পড়া পারেনি, শুভ্র দাদাবাবু কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। পিসিমণি খুব বকাবকি করেছিলেন সেদিন দাদাবাবুকে। সে কথা মনে পড়তেই খুব হাসি পেল হারানের।

কেদার দাস লেনের কাছটায় অন্ধকার। হারান অন্যমনস্ক ছিল। গর্তে চাকা পড়তেই রিক্সা লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী দিদিমণি বলল, "একটু দেখে চালাও না হারানদা। বয়স হয়েছে, এখন রিক্সা চালানো ছেড়ে দিলেও তো পারো। দাঁড়াও, শুভ্রদার সঙ্গে দেখা হলে আমি বলব।"

হারান একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, "আজ এই লাস্ট ট্রিপ দিদিমণি। এবার গাড়ি তুলে দেব।"

অন্য দিদিমণি হাসছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "শুভ্রদা ছেলেটা কে শ্যামলীদি ?"

—তুই এখনও দেখিসনি। নতুন এসেছিস তো। পাড়ার সবাই চেনে। কালো, বেঁটে, রোগা আর খুব আনস্মার্ট। মাঝে মধ্যে তোতলায়। শ্যা-শ্যামোলি বলে আমাকে ডাকে।

দাদাবাবুকে ভেঙাতে দেখে হারান একবার পিছনে তাকাল। দিদিমণি নিশ্চয়ই মজা করছে। বলল, "দাঁড়াও, দাদাবাবু এলি বলি দেব।"

শুনে দুই দিদিমণিই খিলখিল করে হেসে উঠল। ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবের কাছে কয়েকটা ছেলে বসে আড্ডা মারছিল। একজন ফুট কাটল, "এই, রাস্তায় মেয়েদের হাসি, বারণ।"

শ্যামলী দিদিমণি যেন শুনতে পেল না। হাসি চাপার ফাঁকে বলল, "দাদাবাবুর সব কিছু ভাল, না হারানদা।"

—নয়তো কী। ই পাড়ায় দাদাবাবুর মতো কটা ছেলি আর আছে, ধর্মত বলো।

—উ, ভীতুর ডিম। এ পাড়ায় ছেলে বলতে তো একটাই। শুভ্রদার বন্ধু সন্তুদা।

হারান আর কথা বাড়াল না। সন্তুবাবুও সত্যিই খুব ভাল ছেলে। আর রানাবাবুও। সকালে রতার শাসানির পর সারা দিন কী হল, ও জানে না। সন্তুবাবুর কথা মনে হতেই ও দ্রুত প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। পিচবোর্ড কলের কাছে বাঁ দিকে টার্ন নিল ও, পার্কের মাঠ বেড় দেওয়ার জন্য। ভাইপোদার দোকানের সামনে বেশ কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে। সামনের ঝাঁপ অর্ধেক খোলা। ভেতরে কম ওয়াটের একটা বাতি জ্বলছে। হারান এটুকু জানে, একটু পরেই প্যাড লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর সেই প্যাডগুলো নিয়ে সাইকেলে করে একজন দৌড়বে রাজাবাগানের দিকে।

গোখনার ডেরায়।

একটু পরেই নিরালা বাড়ির গেটের সামনে রিক্সা দাঁড় করাল হারান। ঘেমে গিয়েছিল। রিক্সা থেকে নেমে জামার হাতা দিয়ে তাই মুখের ঘাম মুছল। নতুন দিদিমণি ব্যাগ খুলে তিনটে টাকা বাড়িয়ে দিতেই হারান বলল, "না, না, আমি পঞ্চাশ পয়সার বেশি নিই না।"

দিদিমণি অবাক হয়ে বলল, "সে কী! যাওয়ার সময় যে তিন টাকা লাগল?"

শ্যামলী দিদিমণি বলল, "হারানদা পুরনো রেটে ভাড়া নেয়। তুই বুঝবি না, পরে বলব।"

—কিন্তু আমার কাছে খুচরো পয়সা তো নেই।

—ঠিক আছে। পরে দিবেন। হারান রিক্সায় উঠে পড়ল। সারাদিনে আজ পনেরো টাকার মতো রোজগার হয়েছে। এই টাকা পড়েই থাকবে পিসিমণির কাছে। পিসিমণি কিছু খরচ করতে দেয় না। বহুদিন ধরেই দেয় না। ওই টাকা প্রতি সপ্তাহে ব্যাঙ্কে জমা করে দেয়। নকশালরা যেবার সিঁথির মোড়ে গান্ধীজির মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, সে বছর থেকেই হারান টাকা জমাচ্ছে। তখন ও সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের একটা চালা বাড়িতে থাকত। টাকা লুকিয়ে রাখত বালিশের খোলে। সিঁথির মোড়ে গান্ধীজির মূর্তিটা ওই রকম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওর খুব রাগ হয়েছিল। আর সেইদিনই থানায় গিয়ে...।

না, পুরনো কথা আর মনে করতে চায় না এখন হারান। মনে মনে একটা ইচ্ছা ও পোষণ করে যাচ্ছে গত আঠারো-কুড়ি বছর ধরে। সিঁথির মোড়ে ওই জায়গাটাতে গান্ধীজির একটা মূর্তি বসাবে। তাই টাকা জমিয়ে যাচ্ছে। মূর্তির কত দাম ও জানে না। কাদের সাহায্য দরকার তাও জানে না। ইচ্ছাটা একমাত্র ও প্রকাশ করেছে দীপ্তি ধৌতাবাসের যতীনদার কাছেই।

গাড়ি ফেরার পথে পিচবোর্ড কলের কাছে পৌঁছতেই ভাইপোদার দোকানের সামনে রিক্সা আটকাল দুটো ছেলে। হারান ভাল করে তাকাতেই দেখল, একজন রতা। অন্য ছেলেটার হাতে ছোট একটা পুটুলি। রাস্তার এদিকে আলো নেই। আশপাশের বাড়ির আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

রতা এগিয়ে এসে হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে বলল, "এই রাজাবাগানে চল।"

রতাকে দেখেই হারান ঠিক করে ফেলেছিল, যাবে না। গম্ভীর হয়ে বলল, "অন্য রিক্সা ধরো। আমি লাস্ট ট্রিপ করি ফেলিছি।"

হারান প্যাডেলে চাপ দিতে যাচ্ছিল। পা দিয়ে আটকাল রতা, "যাবি না? দাঁড়া, দাঁড়া... সকালে ওই শূয়োরের বাচ্চার বাড়িতে তোকেই দেখেছিলাম, না?"

হ্যান্ডেলের ওপর থেকে রতার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে হারান বলল, "গালি দিবে না।"

ভাইপোদার দোকান থেকে আরও দু' তিনটে ছেলে বেরিয়ে এল।

—"কী হয়েছে রতাদা। ন'টা বাজতে আর মিনিট কুড়ি বাকি। এখনও প্যাড পাঠাতে পারলে না।"

—"দ্যাখ না, এই শালা বলছে, যাবে না।"

ছেলে দুটো কাছে এসে হারানের মুখ দেখল। একজন বলল, "আরে এ তো সেই

পাগলা রিক্সাওয়ালাটা। গান্ধীজির চামচা। এর পিছনে সময় নষ্ট করো না।"

হারানের চারপাশে ছোটখাটো ভিড়। পার্কের এদিকে রাস্তাটা এখন ফাঁকা। হ্যান্ডেলে রতার আঙুলের ফাঁস আরও শক্ত হয়ে উঠেছে। এই ছেলেগুলো যে ঠিক সুস্থ অবস্থায় নেই, হারান তা বুঝতে পারল। গান্ধীজি বলে গেছেন, অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নিচু করো না। মনে মনে ও ঠিক করল, আজ রতার কাছে হারবে না।

ছেলেটাকে ধমক দিয়ে থামাল রতা, "তুই চুপ কর। বানচোত, পেনসিলারের কাজ করিস অথচ একটা সাইকেলের ব্যবস্থা রাখতে পারিস না। তাস বাঁটা শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ। ন'টায় রেজাল্ট... তারপর পেমেন্ট বেশি দিতে হলে, কে দেবে রে?"

হারানের কনুইতে এখন রতার হাত। ওকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে সিট থেকে। বাঁ পাশ থেকে একজন ধাক্কাও দিল। ক্রমশ চড়ছে রতার গলা, "অ্যাই হারামির বাচ্চা। সময় নষ্ট করাবি না। তুই নিজে যেতে না চাস... তো অন্তত রিক্সাটা দে। না হলে তুই তো যাবিই... তোর রিক্সাও আর পাবি না।"

অন্ধকার ভেদ করে ঠিক ওই সময় একটা গাড়ির হেড লাইট এসে পড়ল পিচবোর্ড কলের দেয়ালে। ভিড়ের মাঝে একজন বলল, "রতাদা, বোধহয় ট্যাক্সি আসছে।"

হারানের শার্টের কলার মুচড়ে ধরল রতা। সাদা খদ্দরের শার্ট, বোতামগুলো খুব ছোট সাইজের। দু'একটা ছিঁড়ে পড়ে গেল রাস্তায়। হারানকে সামনে টেনে আনার চেষ্টা করতে করতে মুখ ফিরিয়ে রতা খিঁচিয়ে উঠল, "ভাল করে দ্যাখ। গাড়িটা যেন খোচরদের না হয়। কালই ওরা এসেছিল।"

রতা বাঁ দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। শরীরের সারা শক্তি ডান পায়ে জড়ো করল হারান। তারপর প্যাডেলে চাপ দিল। সামনের চাকাটা একবার গড়িয়ে গেল রতার পায়ের ওপর দিয়ে। উফ্, যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল একবার ও। শার্টের কলার থেকে ওর হাত ছিটকে গেছে। হারান ঠিক করল, বাঁ পায়ের প্যাডেলে জোরে চাপ দিলেই, ভিড় কেটে ও বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সেটা করার সুযোগই পেল না। ডান দিক থেকে চোয়াল লক্ষ্য করে একটা হাত উঠে আসতে দেখল ও। হাতটা চোয়ালে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা বোঁ করে একবার ঘুরে উঠল। মনে হল, অন্ধকার আকাশটা যেন চোখের সামনে নেমে এসেছে। তারার ফুলকি ফুটেছে। হ্যান্ডেলটা কোথায় ও বুঝতে পারল না। প্যাডেল থেকে পা খসে গেছে। জমিতে পা দেওয়ার জন্য ও একবার নীচের দিকে তাকাল। জিভের পাশে গরম অথচ নোনতা স্বাদ।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে। তবে কানটা এখনও কাজ করছে। ও শুনতে পেল, কেউ বলছে, নর্দমায় ফেলে দে। একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জারকে বেরিয়ে আসার জন্য কেউ বলছে। হারান অন্ধকার দিয়ে নীচে নামতে শুরু করল। ওর বুক পকেটে একজনের হাত। ওর সারা দিনের রোজগার নিয়ে গেল। কানের ভিতর তীক্ষ্ণ একটা শিসের আওয়াজ। সেটা থেমে যেতেই ও ক্ষ্যাপা গলায় একজনের গর্জন শুনতে পেল, "অ্যাই রতা, হারানদার গায়ে হাত তুললি কেন?"

অনেক চেষ্টা করে একবার চোখ খুলল হারান। দু' পা ফাঁক করে দাঁড়ানো শরীরটা দেখে নিশ্চিন্তে ও চোখ বুজল।

সন্তুবাবু... সন্তু দাদাবাবু।

জুড়ি

সকাল থেকেই একবার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কথা ভাবছিল শুভ্র। বিদ্যাসাগর ট্রফির খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আই এফ এ-র শতবর্ষে, এ বারই প্রথম এই ট্রফি চালু হয়েছে। বাংলার সব ইউনিভার্সিটি টিম খেলছে। প্রথম দুটো ম্যাচে শুভ্র খেলেনি। এখন যা অবস্থা, যাদবপুরকে হারাতে না পারলে কলকাতা সেমিফাইনালে যেতে পারবে না। এই ট্রফিতে শুভ্র আদৌ খেলতে চায়নি। জোর করে ওকে টিমে রেখেছেন বি কে সি। এই কারণে চার-পাঁচদিন ধরে ও ক্লাবের প্র্যাকটিসেও যেতে পারছে না।

খবরের কাগজের খেলার পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল শুভ্র নিজের ঘরে বসে। মনার মা এসে বলল, "দাদাবাবু, তোমার বন্ধু এয়েচে।"

চোখ সরিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, "কে, রানা?"

—না গো। সেই গুণ্ডাপানা। পালের বাগানে থাকে।

বলার ধরনে শুভ্রর বেশ হাসি পেল। সন্তু ঘরে ঢুকতেই ও বলল, "পাড়ায় তোর কী ইমেজ হয়েছে শোন। মনার মা বলছে, তোমার সেই গুণ্ডাপানা বন্ধুটা এয়েচে।"

কোনও কথা না বলে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল সন্তু। সবুজ রঙের একটা টি-শার্ট পরে এসেছে, বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে ওকে। এত সকালে সন্তু কোনওদিন আসে না। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। রতার সঙ্গে ঝামেলার পর থেকে কয়েকদিন বেশ উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছে শুভ্র। সন্তুর কোনও খবর না পেয়ে। ওকে দেখে তাই বেশ ভাল লাগল। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবলে রেখে, চেয়ারটা ও টেনে নিল বিছানার দিকে। আজ সকালে কোনও কাজ নেই। দু'জনে মিলে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারা যাবে।

সন্তু হঠাৎ উঠে বসল। পকেট থেকে ওকে একটা ক্লাসিকের প্যাকেট বের করতে দেখে শুভ্র বলল, "আরে ব্বাস, তুই তো এ কদিনে বেশ বড়লোক হয়ে গেছিস রে সন্তু। দয়া করে এখন আর সিগারেট ধরাস না। পিসিমণি যে কোনও সময় ঘরে আসতে পারে।"

ঘরে ঢোকার পর থেকে এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সন্তু এবার হাত বাড়িয়ে বলল, 'মহৎ আত্মত্যাগের জন্য ... শুভ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ... আপনাকে ধন্যবাদ।"

সন্তু মাঝে মধ্যে ওর ওপর গার্জেনগিরি করে। আর সেটা শুরু করার আগে এ রকম নাটকীয় কথাবার্তা বলে। সেই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করে শুভ্র বলল, "ভ্যানতাড়ামি না করে, সোজাসুজি বল।"

—বিদ্যাসাগর ট্রফির প্রথম দুটো ম্যাচ না খেলার কারণ কী শুভ্রনীলবাবু?

—পায়ে চোট।

—ঝুট। বিলকুল ঝুট। পায়ে নয়, তোর ... তোর ইয়েতে চোট।

সন্তুকে খিঁচিয়ে উঠতে দেখে শুভ্র চোখ সরিয়ে নিল দরজার দিকে। সন্তু এবার আজেবাজে কথা বলতে শুরু করবে। সেগুলো যেন পিসিমণির কানে না যায়। সকালের জল-খাবার দেওয়ার জন্য পিসিমণি এখুনি আসবে।

দরজা থেকে জানলার দিকে চোখ সরাতেই শুভ্র দেখতে পেল, বাগানের পাশ দিয়ে

বেথুন স্কুলের বাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখন সাড়ে ন'টা বাজে। রোজ এই সময়টাতেই ওই বাস এ পাড়ায় ঢোকে। নীল রঙের বাসটা দেখেই শুভ্রর হঠাৎ দিব্যর কথা মনে হল। চাকরিতে ঢোকার আগে রোজ ও এই সময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত। কথা ঘোরাবার জন্য শুভ্র বলল, "দিব্যটার কী খবর রে? ওর সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ-ই নেই।"

দিব্যর প্রসঙ্গ ফুৎকারে উড়িয়ে দিল সন্তু। রাগী রাগী গলায় বলল, "ও সব ফালতু ছেলের কথা ভাবার সময় আমার নেই। ফর ইওর ইনফরমেশন, আর্য চৌধুরীর সঙ্গে সম্প্রতি আমার দেখা হয়েছিল বরানগরে।"

সন্তুর মুখে আর্যর নামটা শুনে শুভ্র একটু থমকে গেল। আর্য ভ্রাতৃ সঙ্ঘে খেলে। এবার ইউনিভার্সিটি টিমেও আছে। থাকে কুটিঘাটের দিকে। ওর সঙ্গে সন্তুর পরিচয় হল কী করে? কথাটা শুভ্রর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সন্তু কোনও উত্তর দিল না। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে, ভেতরের তামাক ও মনোযোগ দিয়ে বের করতে লাগল। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য শুভ্র ভাবল, একবার বলে, সিগারেটটা নষ্ট করছিস কেন।

বাঁ হাতের তালুর ওপর মশলাগুলো সন্তু রাখছে। সিগারেটটা এক সময় কাগজের নলের মতো হয়ে গেল। সেটা সাবধানে বিছানার ওপর রেখে সন্তু এবার একটা পুরিয়া বের করল পকেট থেকে। পুরিয়ার ভেতর ব্রাউন রঙের গুঁড়ো। সিগারেটের মশলার সঙ্গে সেই গুড়ো মেশাতে মেশাতে সন্তু বলল, "তুই তো জানিস, বরানগরে আমার এমন একটা ঠেক আছে, যেখানে আজকাল আমি প্রায় সারাদিনটাই কাটাই। আর্য বলে ছেলেটাও ওখানে মাঝেমধ্যেই আসে।"

শুভ্র এতক্ষণ ওর মশলা বানানো দেখছিল। আজকাল খৈনি খাওয়ার ব্যাপক চল হয়েছে। ময়দানে খুব কম প্লেয়ারই আছে, যাঁর এই বদভ্যাসটা নেই। সন্তুও খৈনি খায় কি না, সেটা দেখার জন্যও অপেক্ষা করছিল। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে ও সন্তুকে দেখছে। এর মধ্যেই ওর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। গুঁড়ো মাখানো মশলা কিন্তু সন্তু মুখে পুরল না। সিগারেটের কাগজে ফের ভরতে লাগল। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে ঠাসছে। সিগারেট বানানোর কাজটা হয়ে যাওয়ার পর, অদ্ভুত ব্যাপার, পুরো সিগারেটটা জিভে ঠেকিয়ে একবার ভিজিয়ে নিল সন্তু।

একটু অবাক হয়েই শুভ্র প্রশ্ন করল, "এটা আবার কী ধরনের সিগারেট খাওয়ার ঢঙ রে সন্তু?"

—পাতা খাচ্ছি।

—পাতা? সেটা আবার কী?

—তুই বুঝবি না। তোরা ব্রাউন সুগার বলিস।

কথাটা বলেই সন্তু ভেজা সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। শুভ্রকে চমকে দেওয়ার জন্যই যেন আজ ও এসেছে। ঠিক করে রেখেছে, কোনও কিছুতেই বিচলিত বোধ করবে না।

লম্বা একটা টান মেরে সন্তু বলল, "ব্রাউন সুগার খুব কস্টলি হয়ে গেছে রে। শুকনো অবস্থায় খেলে তিন টানেই শেষ। তাই ভিজিয়ে নিলাম।"

অবলীলায় এসব কথা বলতে শুনে শুভ্র যেন শক খেল। আহত গলায় বলল,

"তুই ড্রাগ অ্যাডিক্ট, সন্তু ? থানায় তা হলে সেদিন ওরা ঠিকই ধরেছিল। কে তোকে এই বাজে অভ্যাসটা ধরাল ?"

সন্তু নির্লিপ্তভাবে বলল, "কিছু প্রশ্ন আছে শুভ্র, যার কোনও উত্তর হয় না।

প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কিছু ইচ্ছে থাকে। থাকে কি না তুই বল।

এই যে বিদ্যাসাগর ট্রফির দুটো ম্যাচ তুই ইচ্ছে করে খেললি না, কেন এটা করলি, উত্তর দিতে পারবি ? তুই খেলতে চাইলে আর্য চৌধুরী টিমেই ঢুকতে পারে না। ও তোর কাছে এসে নাকিকান্না কেঁদেছিল বোধহয়, ইউনিভার্সিটি টিমে খেলতে না পারলে সেন্ট্রাল এক্সাইজে চাকরিটা পাবে না। আর, অমনি তুই গলে গেলি। তোর পায়ে চোট হয়ে গেল ...।"

ধরা পড়ে যাওয়ায় সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারল না শুভ্র। জানলার দিকে তাকিয়েই ও বলল, "আসলে কী জানিস। আর্যদের অবস্থা ভাল নয়। এই চাকরিটা ওর খুবই দরকার।"

খিকখিক করে হাসল সন্তু। তারপর বলল, "আর্য তোকে একটা বড় সাইজের গুল মেরে গেল ... আর শুনে তুইই গিলে নিলি। আর্যকে তুই ভাল করে জানিস ? ছেলেটা এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। আরে, চিতাদের পাড়ায় থাকে। পাড়ার ছেলেদের কাছে গপ্প মেরেছে, শুভ্রনীল চ্যাটার্জি খারাপ ফর্মে, তাই চান্স পাচ্ছে না। বোঝ, বানচোত আমার সামনেই তোর সম্পর্কে গুল ঝাড়ছে।"

শুনে বিশ্বাস হচ্ছিল না শুভ্রর। আর্য এ কথা বলেছে ? সন্তু অবশ্য মিথ্যে বলার ছেলে নয়। আজ পর্যন্ত কোনওদিন শুভ্র ওকে মিথ্যে বলতে শোনেনি। বরং মিথ্যেবাদীদের ও দু'চোখে দেখতে পারে না। দিব্যর সঙ্গে ওর ঝগড়া লাগার কারণই একটা মিথ্যে কথা বলা নিয়ে। শুভ্রর মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল, সন্তুর কথাগুলো শুনে। কোচ ভোলা সোম বারবার শুভ্রকে অনুরোধ করেছিল রবীন্দ্র ভারতী ম্যাচটা খেলে দিতে। আর্যর সুবিধার জন্যই ও খেলতে চায়নি। পায়ে চোট আছে বলে, জার্সিটা পর্যন্ত সেদিন গায়ে দেয়নি। আর্য এ রকম অবিশ্বাসের কাজ করল ভেবে শুভ্রর একটু রাগই হতে থাকল। বাবা বলতেন, কাউকে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। কিন্তু কাউকে ঠকিয়ে সবার অবিশ্বাসের পাত্র হওয়া উচিত নয়। বাবার এই কথাটা মনে হতেই শুভ্র ভেতরে জমতে থাকা রাগ তৎক্ষণাৎ দমিয়ে ফেলল।

আধশোয়া অবস্থায় সন্তু সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও মিটিমিটি হাসছেও। শুভ্র সিগারেট খায় না। ওর ঘরে তাই কোনও অ্যাশট্রে নেই। সন্তুকে মেঝেতে ছাই ফেলতে দেখে ও তাড়াতাড়ি একটা কাপ এগিয়ে দিল।

—তুই এত ভাল মানুষ কেন রে শুভ্র। সবাই কেন তোকে টুপি দিয়ে যায় ? ... পরের ম্যাচটায় তুই খেল। তোর ধারে-কাছে আর যে-ই হোক, আর্য চৌধুরী আসতে পারে না। খেলাধূলা আমার কপালে নেই। আমিও তা হলে আজ তোর মতো ইউনিভার্সিটি টিমে খেলতে পারতাম। কী রে, কোনও কথা বলছিস না যে !

কোনও কথা বলার ছিল না শুভ্রর। আর্য চৌধুরীর কথা ও মন থেকে এখন ঝেড়ে ফেলতে চায়। সন্তুর আক্ষেপ শুনে ওর মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটা সময় সন্তু আর ও পাশাপাশি খেলত। স্কুল টিমে সবাই ওদের ভয় করত। বঙ্কিম কাপে সন্তুর রেকর্ডও আছে তেইশ গোল করার। কিন্তু ওর কী যে হল, বাবা মারা যাওয়ার

পর থেকে আর বুটই পরল না। শুধু কী ফুটবল, ক্যারাটে আর টেবল টেনিসেও তখন ও খুব নাম করেছিল। বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্তা অসিত ব্যানার্জি ওকে বক্সিংয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। ওর পাঞ্চের জোর দেখে শুভ্রদের বলেছিল, একদিন না একদিন সন্তু ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হবেই। কিন্তু একদিন ও সব কিছুই ছেড়ে দিল।

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য শুভ্র এবার বলল, "তুই কেন এসব বাজে অভ্যাস ধরলি সন্তু। জানিস, ড্রাগশুদ্ধ ধরা পড়লে তুই জেলেও যেতে পারিস।"

আবার খিকখিক করে হাসল সন্তু। বলল, "বাজে অভ্যাস? মোটেই তা নয়। জানিস শুভ্র, পাতা খাওয়ার পর আমার মনে প্রচুর আনন্দ হয়। চেজ করে পাতা খাওয়ার যে কী আনন্দ, তুই ফিল করতে পারবি না। চেজ করা কাকে বলে, সে তো আবার তুই জানিস না। তোদের নিয়ে খুব মুসকিল। ওসব আমি রাতের দিকে করি, চিতার ডেরায়। শুভ্র তুই চিন্তাও করতে পারবি না, তখন কী হয়। মনে হয়, এই শরীরটা যেন আমার নয়। আমার মধ্যেই নেই। হাত নেই, পা নেই। তুই নেই, রানা নেই, রাধি নেই। আমি শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সামনে ফিকে জ্যোৎস্নার মতো একটা আলো। দূরে একটা কাঁঠালি চাপার গাছ ... সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধে চারদিক ভরে আছে। কাঁঠালি চাঁপার ওই গাছটার দিকে আমি যাওয়ার খুব চেষ্টা করছি। ছোঁয়ার জন্য যেতে পারছি না। পারছি না রে। ওই মিষ্টি গন্ধটা আমি একদিনই পেলাম রাধির চুলে। আমার হাতে ও তখন ডেটল লাগাচ্ছিল। কাঁঠালি চাঁপার গাছটা কিন্তু দূরেই রয়ে গেল। সেই গাছটারে, তুই দেখেছিস, মা যেটা পুঁতেছিল আমাদের বাড়ির উঠোনে।"

শুভ্র অবাক হয়ে শুনছিল সন্তুর কথাগুলো। কাপে ছাই ফেলার চেষ্টা করছে ও। অন্য হাতে মাথার চুল টানছে। ওর চোখ-মুখে সূঁচ ফোটানো যন্ত্রণার চিহ্ন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই হঠাৎ ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। সন্তুর মুখে একটা নতুন নাম শুনে তীব্র কৌতূহলে শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, "রাধি কে?"

সন্তুর মুখে ফের সেই মিটিমিটি হাসি। সিগারেটের শেষ অংশটুকু কাপের মধ্যে ফেলে ও বলল, "নামটা জেনে রাখ। বাকিটা শুনে তোর কাজ নেই। আর হ্যাঁ, কোনওদিন যদি এই সনৎ রায়চৌধুরীকে তোর দরকার হয়, খবদর্দার হারানদাকে আর পালের বাগানে পাঠাবি না।"

—কেন, ও বাড়িটা এখন আর তোদের নেই?

—বাড়ি আছে। বাড়ির মালিকানাও যায়নি। আমিই শুধু গৃহত্যাগ করেছি।

—সে কী? তা হলে তুই কোথায় থাকিস?

—বরানগরে। চিতার ডেরায়। ওর সহচর হয়ে।

শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, "গৃহত্যাগের কারণটা কী?"

—অন্য কিছু নয়। অন্তত রতার ভয়ে নয়। কারণটা স্কিন ট্রেডিং। আমার গাণ্ডু কাকাটা পলাতক। কাকার বউ স্কিন ট্রেডিং শুরু করেছে, কাকার এক বন্ধুর সঙ্গে।

শুভ্রর মোটেই ভাল লাগছিল না এই কথাগুলো শুনতে। সন্তুদের বাড়ি ও খুব বেশি যায়নি। ওর কাকিমাকেও দেখেনি। আসলে সন্তুই চায়নি, ও পালের বাগানে যাক। কিন্তু নিজের কাকিমা সম্পর্কে এসব কী বলছে সন্তু! শুভ্র প্রসঙ্গটা পালটাতে

চাইল।

ওকে বাঁচিয়ে দিল টেলিফোন। রিঙ হচ্ছে শুনে চেয়ার ছেড়ে ওঠে ফোনটা ধরতেই শুনল, "এটা কি শুভ্রদের বাড়ি?"

—হ্যাঁ।

—সন্তু আছে?

—হ্যাঁ ধরুন। কোত্থেকে বলছেন?

—বলুন বরানগর থেকে, চিতা।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে শুভ্র বলল, "অ্যাই তোর ফোন।"

—নিশ্চয়ই চিতার। আসার সময় তোর নাম্বারটা ওকে দিয়ে এসেছি। ইন কেস অব এমার্জেন্সি, যেন ফোন করে।

সন্তু ফোন ধরতে উঠে যেতেই শুভ্র ফের চেয়ারে এসে বসল। এই চিতা ছেলেটাকে ও দু'-একবার দেখেছে। যেদিন হারানদা মার খেল, সেদিন ও খুব সাহায্য করেছিল। রোগা লিকলিকে চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে। সন্তুর মতো অত লম্বা নয়। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলে চিতাকে হয়তো শুভ্র চিনতেও পারবে না। অথচ ওই ছেলেটার ভয়ে সিঁথির মোড় আর পুরো বরানগর কেঁপে ওঠে। সেদিন শুভ্রকে খুব সম্মান দিয়ে কথা বলেছিল চিতা। হারানদাকে বরানগরে নার্সিংহোমে ভর্তি করেই চলে যায়নি, সারারাত তিন-চারটে ছেলেও রেখে গিয়েছিল, পাছে কোনও দরকার হয়। চিতার ভয়েই সম্ভবত, নার্সিং হোমের ডাক্তার সারা রাত আর বাড়ি ফিরে যাননি। সত্যি, ওই ছেলেটা সেদিন পাশে এসে না দাঁড়ালে শুভ্র খুব বিপদে পড়ে যেত হারানদাকে নিয়ে। প্রচুর রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল হারানদার। চিতার কথায়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ বোতল রক্ত সেদিন চলে আসে নার্সিংহোমে। পরে অবশ্য অত রক্তের আর দরকার হয়নি।

চিতার সঙ্গে ফোনে সন্তু কথা বলছে। শুভ্র শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা। সন্তু বলছে, ওই ডিলটা হয়ে গেল ... বাঃ ... কত? ... দশ হাজার ... ঠিক আছে ... ধুস, খুকুমণিদা রাজি হয়ে যাবে ... পরে দেখা যাবে ... থার্টি পার্সেন্ট আমার ... আগরওয়াল ব্যাটাকে ছাড়বি না ... হ্যাঁ, ফিফটি থাউজেন্ড ... না, ওর নীচে নামবি না ... না রে, রতার লোকজন কাউকে দেখলাম না ... আমার সেফটি নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ... হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমার সঙ্গে আছে ... শুভ্র ছাড়লে হয় ... ভাল আছে ... ওপরে ওঠার সময় হারানদাকে একবার দেখে এসেছি ... ছাড়ছি রে ...।

শুভ্র আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল সন্তুর কথা শুনে। থার্টি পার্সেন্ট, ফিফটি থাউজেন্ড ... এসব কথা ঠিক বুঝতে পারছিল না। ফোন ছেড়ে সন্তু ফের বিছানায় উঠে বসতেই ও জিজ্ঞাসা করল, "ব্যবসা শুরু করেছিস নাকি আজকাল?"

—সন্তু বলল, "উ ... এক ধরনের ব্যবসাই।

—কিসের?

—মাসল ট্রেডিং

—মানে?

—দাঁড়া তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, সেদিন রতাকে আমরা যা করলাম, সেটা

আদতে এক ধরনের সোস্যাল সার্ভিস। বল, নয় কি না। রতা নামক একটি লোক সমাজকে দূষিত করছে, অতএব ওকে দমন করো, হটাও। আমরা রতাকে ধোলাই দিলাম। ভাঙচুর করলাম। লোকের কল্যাণ করলাম। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটা ভাব, আমার...তোর ব্যক্তিগত কোনও লাভ হল না। উল্টে ক্ষতিই হল। রতা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই আমার ওপর ঝাল ঝাড়বে। আমি ঝুঁকি নিয়ে, শক্তি ক্ষয় করে একটা অ্যামেচারিশ কাজ বোকার মতো করে ফেললাম। এবার ধর, ওই কাজটাই যদি কারও কাছ থেকে আমি কন্ট্রাক্ট নিতাম, তা হলে আমার ফায়দা হত। এই যেমন ধর, আমাদের খুকুমণিদা...কুটিঘাটে একটা ফ্ল্যাটবাড়ি তুলতে চান। পাড়ার ছেলেরা হুজ্জুত করছে, বাড়ি তুলতে দেবে না। খেলার মাঠ নাকি নষ্ট হয়ে যাবে। খুকুমণিদা আমাকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছে ... নির্বিঘ্নে বাড়ি তোলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বদলে কুড়ি হাজার টাকা। আমি, চিতা আর তেওয়ারি— তিনজনে মিলে কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী, ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বললাম। খানিকটা মাসল খানিকটা মানি পাওয়ার দেখাতেই, ছেলেগুলো রাজি হয়ে গেল। খুকুমণিদা কুড়ি হাজার দেবে, তার থেকে আমরা দশ দেব ওদের। বাকি দশ আমাদের তিনজনের। এক-দু'দিনের রোজগার সোয়া তিন হাজার। মন্দ কী?

শুভ্র বলল, "এ তো গুণ্ডামি।"

—আমি মনে করি না। ইট ইজ পিওরলি বিজনেস। তুই মিডলম্যানের, নেগোসিয়েশনের কাজটা করে দিচ্ছিস। এতে কোনও অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। তুই কোনও আইন ভাঙছিস না। ধর, যে কারণে সেদিন আমরা রতাকে পেটালাম, আসলে সেটা তোকে বা রানার বাবাকে বাড়িতে এসে ভয় দেখানোর জন্য। সাট্টা খেলা চালু রেখেছে বলে নয়। গত তিন-চারদিন খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সাট্টা এমন কিছু অপরাধ নয়। জামিনযোগ্য অপরাধ। ওর থেকে অনেক ক্ষতিকারক ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে আমাদের চারপাশে। বধূহত্যা, ধর্ষণ...।

শুভ্র বলল, "তুই একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে। তোর মুখে এসব কথা মানায় না।"

সন্তু একটু চটে গিয়েই বলল, "কেন মানায় না? খাঁটি সত্যি কথাটা বলছি বলে। তুই বলবি, সাট্টা খেলাটা নৈতিক অপরাধ। মানছি, তা হলে তো এসব অপরাধীকে ধরতে, ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে। শোন ... আলিপুরে একটা জায়গা আছে... একটা ক্লাব ... যেখানে শনিবার সকালে কিছু হ্যাজব্যান্ড-ওয়াইফ হাজির হয়। এমন কাপল, যাঁদের গাড়ি আছে। এবার গাড়ির চাবিগুলি একটা বক্সে রেখে ঘেঁটে দেওয়া হয়। এরপর ওয়াইফরা একটা করে চাবি তোলে আর চাবির যিনি মালিক, তার সঙ্গে আউটিংয়ে যায়। রবিবার রাতে ঠিক ওই জায়গায় ফিরে এসে, আবার সতীসাধ্বীরা তাদের অরিজিন্যাল হ্যাজব্যান্ডের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যায়। এটাকে তা হলে তুই কী বলবি? সমাজের উঁচু তলায় এসব জিনিস আকচার হচ্ছে। এগুলো নৈতিক অপরাধ নয়!"

শুভ্র বলল, "সাট্টার সঙ্গে বউ বদলাবদলির তুলনা ঠিক হল না। তুই এক কাজ কর, কয়েকদিনের জন্য বরং আমাদের ফলতার বাড়িতে বেড়িয়ে আয়।"

সন্তু উড়িয়ে দিল কথাটা, "আরে, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। তিনটে বাড়িওয়ালা, দুটো প্রোমোটার আর একজন চিটারের হাতে ঝাড় খাওয়া লোক, এখন

আমার পিছনে ঘুরছে। ওই যে বললাম, কন্ট্রাক্ট দেবে। মিনিমাম কুড়ি হাজার টাকা রোজগার। কারও ভাড়াটে তুলে দিতে হবে, কারও জমি দখলের ব্যাপার। রতাকে পেটানোর পর থেকেই আমার গুড উইল বেড়ে গেছে রে। এখন বিজনেসটা পার্টনারশিপে করছি। এক্সপেরিয়েন্স বেড়ে গেলে ভাবছি, একাই করব। ফলতায় গঙ্গার হাওয়া খাওয়ার সময় আমার হাতে এখন নেই।"

শুভ্র অসহায়ের মতো বলল, "সন্তু, এসব তোর কাজ নয়। যে কোনও দিন তুই পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যাবি।"

—পুলিশ! তুই হাসালি শুভ্র। তুই কি জানিস, ভাইপোদার দোকান থেকে সেদিন সাট্টার ঠেক তুলে দেওয়ার পর ও সি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পলিটিক্যাল পার্টির দুই নেতা আমার কাছে লোক পাঠাচ্ছে দু'বেলা— আমাদের পার্টিতে চলে এসো। কী বুঝলি?"

শুভ্র আরও একবার বলল, "এসব ছাড়। নর্মাল লাইফ লিড কর। এই কদিনে কী করে তোর এত পরিবর্তন হয়ে গেল সন্তু?"

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সন্তু বলল, "নর্মাল লাইফ তোদের মতো ভাল ছেলেদের জন্য। যাক গে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোর বাথরুমে হাত-মুখ ধোয়া যাবে?"

—যা না। বাইরে তোয়ালে রয়েছে।

সন্তু বিছানা থেকে নেমে বেরিয়ে যেতেই শুভ্র পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। বৃষ্টি হলে ভাল হয়। দু'তিন দিন ধরে গুমোট গরম। পুকুরের দিকে তাকিয়ে শুভ্রর মনটা শান্ত হয়ে গেল। সন্তুর কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছিল। ওর জীবনটা হঠাৎ উলটো খাতে বইতে শুরু করেছে। ও বুঝতে পারছে না, অনিবার্য টানে কীভাবে অন্ধকার জগতের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ফলতায় শুভ্রদের ইটভাটায় ম্যানেজারের পোস্টটা এখন খালি আছে। সন্তু যদি সেটা নিত, ওর পক্ষেও ভাল হত। লজ্জায় এ কথাটা ও সন্তুকে বলতে পারছে না। সন্তু রিফিউজ করলে মনে খুবই দুঃখ পাবে। হয়তো বন্ধুত্বেই চিড় ধরবে। ও ভীষণ অভিমানী ছেলে। মাঝে মাঝে এমন এক ধরণের পাগলামি করে, তখন ওকে অন্য মানুষ বলে মনে হয়।

... বহুদিন পর ওর এই পাগলামিটা ফের শুভ্র দেখতে পেল রতাকে পেটানোর দিন। ঘটনা ঘটার সময় ও বাড়িতে বসে টিভি দেখছিল। হঠাৎ একটা ছেলে এসে খবর দেয়, পিচবোর্ড কলের রাস্তায় হারানদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্র দৌড়ে যায়। ভাইপোদার দোকানের কাছে নিয়ে দেখে, সন্তু আর একটা ছেলে, দোকানটা ভাঙচুর করছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। পাড়ার লোকেরা সবাই রাস্তায় নেমে এসেছে। ভিড়ের মাঝ থেকে খুকুমণিদা বেরিয়ে এসে বলেছিল, "শুভ্র, শিগ্গীর তুমি ভরতদার চেম্বারে যাও। ওখানে হারানকে নিয়ে গেছে।" খুকুমণিদার বলার ভঙ্গিতে ওর মনে হয়েছিল, হারানদা বোধহয় বেঁচে নেই। পা চালিয়ে জহরলালের দোকানের কাছে পৌঁছতেই ও দেখেছিল, ল্যাম্প পোস্টে রতাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আরও একটা ছেলে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রতার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছিল, সারা শরীরে বেধড়ক মারের চিহ্ন।

রতাকে দেখার মতো মানসিক অবস্থা শুভ্রর তখন ছিল না। পাশ কাটিয়ে ভরত ডাক্তারের চেম্বারে যেতেই ও দেখেছিল, টেবলে হারানদা নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে আছে। ঠোঁটের কাছটা ফুলে রয়েছে। খদ্দরের সাদা শার্টটা লাল হয়ে গিয়েছে। শুভ্রকে দেখে ভরতদা বললেন, "এখনই হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে। হেড ইনজুরি আছে।"

খুকুমণিদা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শুভ্র টের পায়নি। উনি বললেন, "গাড়ি আমার সঙ্গেই আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওকে নিয়ে চলো।"

হারানদার দিকে তাকিয়ে শুভ্রর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল রতার উপর। একটা বয়স্ক লোককে কেউ এভাবে আঘাত করতে পারে? ওর ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে রতার পাছায় তিনটে লাথি মারে। কিন্তু রাগ ফলানোর সময় ওটা নয় বলেই টেবলের কাছে গিয়ে অচেতন শরীরটাকে ও পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোবার সময় বলেছিল, "আমার নাম করে কেউ একবার সন্তুকে ডেকে আন। নার্সিং হোমে যেতে হবে।"

খুকুমণিদাই বোধহয় বলেছিলেন, "এখন ডাকলে কী আর ও আসবে। সন্তুর মাথায় খুন চেপে গেছে। রতাকে এমন মার মেরেছে, মাস দুয়েক বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না।"

সে দিন রাত্তিরটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল শুভ্রর। হারানদাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতেই পুরো ব্যাপারটা ও শুনে নিয়েছিল। ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করে ও ছুটে গিয়েছিল থানায়। খুকুমণিদার খুব পরিচিত থানার ও সি বিপ্লব ঠাকুর। প্রায়ই নাকি ওনার বাড়িতে যান। রতার নামে ডায়রি লিখিয়ে, ফের নার্সিং হোমে ফিরে এসে সন্তু আর রানাকে দেখতে পেয়েছিল শুভ্র। ওরা না থাকলে হারানদাকে হয়তো বাঁচানোই যেত না।

... বাথরুম থেকে ফিরে এসে সন্তু বলল, "চান করে নিলাম রে শুভ্র। তোর বাথরুমটায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই, তোরা কপাল করে জন্মেছিস।"

স্নান করায় সন্তুকে আরও তাজা দেখাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে শুভ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঠাট্টা করেই বলল, "একটু আগে তুই তো বললি ঘুম পাচ্ছে।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্তু চুল আঁচড়াচ্ছে। মুখ না ফিরিয়েই বলল, "তোর জন্য আমি একটা মেয়ে দেখেছি।"

সন্তু আবার গার্জেনগিরি করছে দেখে শুভ্র বলল, "ঘটকালিতেও নেমে পড়েছিস নাকি আজকাল। যতদূর জানি, এতে মাসল পাওয়ার লাগে না।" ইচ্ছে করেই শুভ্র খোঁচাটা মারল।

হো হো করে হেসে উঠল সন্তু, "লাগে রে। পরের দিকে। বাপ-মাকে ঠাণ্ডা করতে।"

—এটাও কি সে রকম কেস?

—হতে পারে। বাপ-মাকে আমি দেখিনি। তবে তোর জন্য যাকে সিলেক্ট করেছি... রিয়েলি বিউটিফুল।

—নিজের কথা আগে ভাব, সন্তু।

—কে বলল, ভাবিনি?

—কই বলিসনি তো !

—সময় হলেই জানবি। তুই তো জানবিই। তার আগে আমাকে প্রচুর রোজগার করতে হবে। খুব অল্প সময়ে, প্রচুর।

—কেন, মেয়েটা কি প্রচুর রোজগার করা বাবার মেয়ে ?

—একেবারেই না। বরঞ্চ উলটো। আমার মতোই অনাথ, সহায় সম্বলহীনা, অপরের বাড়িতে আশ্রিতা... ইত্যাদি ইত্যাদি।

—এই অঞ্চলের বাসিন্দা, না বরানগরের ?

সন্তু সাবধানী গলায় বলল, ব্যস, ব্যস, ফারদার কোনও কোশ্চেন না। অনেকটাই বলে ফেলেছি।"

শুভ্র ঠাট্টা করে বলল, "তোর মনে যে প্রেম গজিয়েছে, দিব্যকে সেটা বলব ?"

—আবার কেন মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিস শুভ্র। বানচোতের নাম শুনলেই দিনটা আমার খারাপ যায়। সে দিন চিতা আর আমি কলেজ স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছিলাম। বিডন স্ট্রিটের মোড়ে, বেথুন স্কুলের উল্টো দিকে দেখি, সেজেগুজে গাড্ডুটা দাঁড়িয়ে আছে।

দরজার সামনে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে শুভ্র চমকেই উঠল। মুখ খারাপ শুরু করলে সন্তুকে তখন থামানো মুশকিল। শুভ্র মনে মনে প্রার্থনা করল, পিসিমণি যেন না হয়। তাহলে ও খুব লজ্জায় পড়ে যাবে।

"শুভ্রদা, আসব।" মনার গলা।

শুভ্র সোৎসাহে ডাকল, "আয়। আয়।"

পর্দার পাশে মনার সহাস্য মুখ। ইদানীং কেব্‌ল টিভির ব্যবসা করছে মনা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বেশ কিছুদিন বেকার বসে ছিল। ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে এখন ভালই চালাচ্ছে। শুভ্র ব্যাঙ্কে গ্যারান্টার হয়ে ওকে লোন পাইয়ে দিয়েছিল গত বছর। ও জিজ্ঞাসা করল, "কী রে, তোর ব্যবসা কেমন চলছে ?"

—ভালই। তবে আট ফুট অ্যান্টেনায় এখন আর চলছে না শুভ্রদা। ভাবছি, একটা বারো ফুটের কিনব। তা হলে কাস্টমারদের এ টি এন-টা দেখাতে পারব।

—ব্যাঙ্ক লোনটা শোধ করেছিস ?

খুশি খুশি গলায় মনা বলল, "সে কবে শোধ হয়ে গেছে। এখন কাস্টমার অনেক বেড়ে গেছে। প্রায় শ' দেড়েক। ষোল ফুট অ্যান্টেনা লাগাতে পারলে সবথেকে ভাল হত। এখানে আর কারও নেই। তোমার খুব সুবিধা হত শুভ্রদা। চ্যানেল নাইনটাও তাহলে দেখতে পেতে। কী, চেষ্টা করব নাকি, বলো।"

শুভ্র বলল, "বারো ফুটেরটা কত দাম রে ?"

—প্রায় সাতাশ হাজার। মুশকিল হচ্ছে, মিত্র কুটিরের বুড়ো খুব চশমখোর। ওর বাড়ির ছাদে অ্যান্টেনা বসিয়েছি বলে, এমনিতেই প্রফিটের থার্টি পার্সেন্ট নিচ্ছে। প্লাস ছাদের ঘরটার ভাড়া সাতশো টাকা। আরও একটা অ্যান্টেনা লাগালে বুড়ো হয়তো ফিফটি পার্সেন্ট চেয়ে বসবে।

মনার কথা শুনতে শুনতে বেশ মজা পাচ্ছিল শুভ্র। কতই বা বয়স ওর। বছর আঠারো। ওর মায়ের সঙ্গে ছোটবেলায় এ বাড়িতে খুব আসত। ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটত। এখন কথা বলছে পাক্কা বিজনেসম্যানের মতো। প্রথম দিকে

এই অঞ্চলে কেব্‌ল টিভির লাইন কেউ নিতে চায়নি। বাচ্চাদের পড়াশুনো লাটে উঠবে বলে। সেই সময় শুভ্র ওকে খুব সাহায্য করেছিল। চেনা লোকদের বলে দিয়েছিল লাইন নিতে। একটু মজা করার জন্যই ও জিজ্ঞাসা করল, "মাসে এখন তোর কত থাকছে রে ?"

মনা বলল, "খারাপ না। তবে কদ্দিন থাকবে জানি না। গরমেন্ট আবার ট্যাকস চাইছে। মাসে চার হাজার টাকা। আজই চিঠি এসেছে। আমাদের ইউনিয়ন মামলা করে দিয়েছে।"

শুভ্র একবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে দেখল, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওকে শুনিয়েই মনাকে বলল, "সৎভাবে বিজনেস করছিস, এটাই বড় কথা।"

শুনে হাসতে হাসতে উঠে বসল সন্তু। কয়েক সেকেন্ড পর হাসি থামিয়ে ও মনাকে বলল, "এই এদিকে আয়। যা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবি। না বললে জানিসই তো, আমার রাগ। ব্যাঙ্ক লোন নেওয়ার সময়, কত পার্সেন্ট ঘুষ দিয়েছিস ম্যানেজারকে ?"

—ফাইভ পার্সেন্ট, সন্তুদা।

—পাড়ায় পাড়ায় লাইন টানার জন্য, পার্টির ছেলেদের তুই কত দিয়েছিস ?

—একেক পাড়ায় একেক রকম, সন্তুদা।

—শনিবার রাতে নিশ্চয়ই ব্লু ফিল্ম দেখাস। থানার লোকদের আজকাল কত দিচ্ছিস ?

—পাঁচশো টাকা, সন্তুদা।

—যা, এটাই সৎ বিজনেস। করে খা।

শুভ্রর দিকে তাকিয়ে, একবার অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সন্তু আবার বালিশে মুখ গুঁজল। শুভ্র খুব গম্ভীর হয়ে গেল। শুকনো গলায় একবার মনাকে বলল, "কোনও কিছু বলবি ?"

—না, তেমন কিছু না। মাকে দিয়ে পিসিমণিই খবর পাঠিয়েছিল আসার জন্য। কেব্‌ল-এ পিকচার নাকি ভাল আসছে না। এসে দেখি, এখনও উনি ঠাকুর ঘরে। এদিকটায় মাঝে মাঝে ভোল্টেজ ড্রপ করছে। ডি বি মিটার দিয়েও দেখলাম। মনে হয়, বুস্টিং করে যেতে হবে।

মনার মুখে অনেক নতুন কথা শুনতে পেল শুভ্র। সন্তুর কাছ থেকে পালাবার ছুতো খুঁজছিল ও। মনাকে বলল, "তা হলে ড্রয়িং রুমেই চল। টিভিটা খারাপ হলে পিসিমণি আবার খুব একা হয়ে যায়।"

বারান্দা ঘুরে, ড্রয়িংরুমে এসে শুভ্র আরাম করে সোফায় বসল। ইউনিভার্সিটিতে বোধহয় আর যাওয়া হল না। হাত উল্টে ও দেখল, প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। মোটর বাইকে গেলেও, পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা বেজে যাবে। আজকাল আবার বহু রাস্তায় ওয়ান ওয়ে। ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। অত বেলায় পৌঁছলে বি কে সি-র সঙ্গে দেখাও হবে না। সেই তিনটে, সাড়ে-তিনটে পর্যন্ত উনি ক্লাস নেবেন। তার আগে ফ্রি হবেন না। গেমস ইনচার্জ হলেও, আসলে উনি ইকনমিক্স পড়ান।

মনা টিভি সেট নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে তাকিয়ে একবার বলল, "সন্তুদার গায়ে খুব জোর, না শুভ্রদা ?"

শুভ্র বলল, "কী করে বুঝলি ?"

—আমি তো সেদিন জহরলালের দোকানের সামনে ছিলাম। রতার সঙ্গে সন্তুদার মারপিট হচ্ছে শুনে দৌড়ে গেছিলাম। উফ্, কী বলব শুভ্রদা, বাঁ পায়ে ঘুরে ডান পায়ে সন্তুদা এমন একটা লাথি মারল রতাকে, ঠিক অজয় দেবগণের স্টাইলে। রতা পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল।

—অজয় দেবগণটা আবার কে, মনা।

—সে কী ! তুমি জানো না ? বীরু দেবগণের ছেলে। বোম্বে সিনেমার ফাইট মাস্টার।

—সন্তু যা বলল, সেটা কি ঠিক ?

—কোনটা শুভ্রদা ?

—তুই ব্লু ফিল্ম দেখাস।

ঘাড় নাড়ল মনা, "হ্যাঁ। তাও তো আমি সফট দেখাই। নাগেরবাজারে ওরা তো থ্রি এক্স দেখায়।"

শুভ্র গম্ভীর হয়ে বলতে যাচ্ছিল, আর দেখাস না। পিসিমণিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল। হাতে প্রসাদের থালা। ঘরে শুভ্রকে দেখে পিসিমণি বলল, "কী রে, ইউনিভার্সিটি গেলি না ?"

—বেরোচ্ছিলাম, এমন সময় সন্তু এসে গেল।

শুভ্রর মাথায় পুজোর ফুল ছোঁয়ালেন পিসিমণি। পরনে লাল গরদের শাড়ি। এই বেশে দুর্দান্ত দেখায় কিন্তু পিসিমণিকে। শুভ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—সন্তুকে কিছু খেতে টেতে দিয়েছিস ?

শুভ্র বলল, "না, একেবারে লাঞ্চ করব। পার্সে মাছ আছে পিসিমণি, সন্তু কিন্তু খুব পছন্দ করে পার্সে মাছ।"

—দেখি, ফ্রিজে আছে কি না।

পিসিমণি চলে যেতেই নিজের ঘরে ফিরে এল শুভ্র। তাকিয়ে দেখল সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চোখ-মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দীর্ঘ শ্বাস ফেলল শুভ্র। সন্তুকে ও প্রথম দেখে স্কুলে, ক্লাস ফাইভে। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল সন্তু। তবু প্রতিদিন পিছনের বেঞ্চে বসত। দিব্যই তখন ওর খুব বন্ধু। পাশাপাশি বসত। দু'জনে মিলে ক্লাসে নানারকম বদমাইসিও করত।

ক্লাস সেভেনেই একদিন সেই ঘটনাটা ঘটল। সে সময় ইতিহাস পড়াতেন অতুল স্যার। ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে একটা প্রশ্ন লিখতেন। ছাত্রদের উত্তর লিখতে বলতেন পনেরো মিনিটের মধ্যে। সময় পেরিয়ে গেলেই ঝটপট সবার খাতা কেড়ে নিতেন। একদিন পিছনের বেঞ্চে খাতা লেখার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন সন্তুকে। টুকলি করার অপরাধে কান ধরে ওকে টেনে আনেন সামনের দিকে।

সেদিনের সেই ঘটনা এখনও ভোলেনি শুভ্র। তখন ও ক্লাসে ফার্স্ট বয়। বসত একেবারে স্যারের টেবলের কাছে। খুব রাগী ছিলেন অতুল স্যার। রেগে গেলে ঘনঘন নস্যি নিতেন। শুভ্রর মনে আছে, স্যারের টেবলের ওপর সন্তুর হাত। অতুল স্যার বেত মেরে যাচ্ছেন। আর বলছেন, "কেন তুই টুকলি করছিলি ? এই বয়সেই জোচ্চুরি শিখছিস !"

সন্তু বারবার বলেছিল, "আমি টুকলি করিনি স্যার। পড়াটা আমাকে ধরুন, আমি পারব।"

বেতের আঘাতে ওর হাতের তালু সিঁদুরের রঙ হয়ে গিয়েছিল। তবুও ওর চোখ-মুখে যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন ছিল না। হাতটা সরিয়ে নিচ্ছিল না টেবল থেকে। শুভ্রর মনে হয়েছিল, ও সত্যি কথাই বলছে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই হাঁফিয়ে গিয়েছিলেন অতুল স্যার। বেত ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছিলেন, "পাক্কা ক্রিমিনাল হবি তুই একদিন। এত মার খেলি, তবু চোখে জল নেই!" স্যার সেদিন এত রেগেছিলেন, পরের সাতটা দিন ইতিহাস ক্লাসের সময় নিল ডাউন করিয়ে রাখতেন সন্তুকে দরজার সামনে। অন্য কেউ হলে ওই ক'দিন শাস্তির ভয়ে স্কুলেই আসত না। সন্তু কিন্তু একদিনও কামাই করেনি।

বাড়ি ফিরে শুভ্র সেদিন পিসিমণির কাছে সন্তুর গল্প করেছিল। সব শুনে পিসিমণি কিন্তু বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, ছেলেটা কোনও অন্যায় করেনি। তুই আলাদা করে ওকে জিজ্ঞাসা করিস তো একদিন।"

শুভ্র তর্ক করেছিল, "না পিসিমণি, স্যার ওকে নিজের চোখে টুকলি করতে দেখেছে।"

ডাইনিং টেবলের উল্টো দিকে বসে খেতে দিচ্ছিলেন পিসিমণি। শুভ্রর কথা শুনে বলেছিলেন, "আমরা বড়রা অনেক সময়, অনেক কিছু ভুল বুঝি। একদিন ছেলেটাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসিস।"

ক্লাস সেভেনে ওই সময় খুব বদনাম হয়ে গিয়েছিল সন্তুর। সবাই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত... টুকলিবাজ বলে। টিফিনের সময় ও ক্লাস ছেড়ে বেরোতেই চাইত না। সেই দিন থেকে দিব্যর সঙ্গে আর কথা বলত না। ওই রকম চঞ্চল ছেলে সন্তু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। শুভ্রর মনে আছে, স্কুলে ছুটি হয়ে যাওয়ার পর একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে। হারানদা তখন রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ওর রিক্সায় কালীবাড়ি পর্যন্ত এসে শুভ্র দেখেছিল, সন্তু বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে যাচ্ছে। রিক্সা থামিয়ে ও সেদিন জোর করেই তুলে নিয়েছিল সন্তুকে। সেদিনকার কথাগুলোও ওর মনে আছে।

—সনৎ, তুই কোথায় থাকিস রে?

—পালের বাগানে।

—আমাদের বাড়িতে যাবি?

—না।

—চল না, আমার পিসিমণি তোকে দেখতে চেয়েছে।

—তোর পিসিমণি আমার কথা জানল কী করে?

—আমি বলেছি।

—ও সেই টুকলি করার কথা বুঝি?

—হ্যাঁ। পিসিমণি সব শুনে কিন্তু বলেছে, তুই টুকলি করিসনি।

—তোর পিসিমণি ঠিকই বলেছে।

—যাবি, আমাদের বাড়ি?

—চল।

boiboi.net

এসব টুকরো কথাবার্তার মাঝেই রিক্সা এসে থেমেছিল শুভ্রদের বাড়ির সামনে। বাগানের গেটে রিক্সা ঢুকতেই সন্তু চারদিকে তাকিয়ে বলেছিল, "এই শুভ্রনীল, আমাকে এখানেই নামিয়ে দে। তোরা বড়লোক। তোর সঙ্গে আমার কোনওদিন বন্ধুত্ব হবে না।"

শুভ্র তবুও সেদিন ওকে ছাড়েনি। জোর করে পিসিমণির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিনই অবশ্য দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় পালের বাগান থেকে সন্তু আসত শুভ্রদের বাড়ি। হারানদার রিক্সায় দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে যেত। ফিরতও একসঙ্গে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা পর্যন্ত, লজ্জায় শুভ্র কোনওদিন জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, সন্তু সত্যিই সেদিন টুকেছিল কি না। কিছুদিন মিশেই ও বুঝতে পেরেছিল, সন্তু খুব অভিমানী ছেলে। তাই পুরনো ক্ষতে আর আঘাত দিতে চায়নি।

... সন্তুর ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে শুভ্র পুরনো দিনের কথাই ভাবছিল। অতুল স্যারের সঙ্গে এখনও মাঝে মধ্যে ওর দেখা হয় রেডি গলি অথবা চিড়িয়ামোড়ে। দেখা হলেই স্যার এখনও জিজ্ঞাসা করেন, "শুভ্রনীল, সনৎ কেমন আছে?" সন্তুকে ভোলা স্যারের পক্ষে সম্ভবও নয়। লাঞ্ছনার জবাব ও দিয়েছিল, সেবার ইতিহাসে হায়েস্ট নম্বর তুলে। শুভ্রকে সরিয়ে ক্লাস সেভেনে ও-ই সেবার প্রথম হয়েছিল।

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন অতুল স্যার ওকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। স্কুল থেকে একগাদা প্রাইজ নিয়ে বেরিয়ে আসছিল ওরা দু'জন। গেটের সামনে ছাত্রদের ভিড়। এরপর গানবাজনা হবে। শুভ্রর মনে আছে... হারানদার রিক্সায় ওঠার আগে হঠাৎ সেই ঘটনা... দিব্য হাত বাড়িয়ে কনগ্রাচুলেসন্স জানাতে গিয়েছিল সন্তুকে। ধাক্কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল সন্তু। প্রাইজগুলো রিক্সার সিটে রেখেই বাঁ হাতে ঠাস করে ও এক চড় মেরেছিল দিব্যকে। তারপর ডান হাতে আরেকটা। শুভ্র সেদিন সরিয়ে না নিলে দিব্যকে হয়তো ও মেরেই ফেলত।

রিক্সায় আসতে আসতে সন্তু নিজেই বলেছিল, "এই চড়গুলো ওর পাওনা ছিল। অতুল স্যারের ক্লাসে, জানিস শুভ্র, সেদিন ও-ই টুকছিল। স্যারকে আসতে দেখে বইটা আমার দিকে ঠেলে দেয়।"

শুভ্রর হাত থেকে প্রাইজগুলো সেদিন পড়ে যাচ্ছিল, এ কথা শুনে। পিসিমণির মুখটা তৎক্ষণাৎ ওর মনে পড়েছিল। শ্বাসরোধ করে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "স্যারকে সেদিন বলিসনি কেন?"

—স্যার, আমার কথা বিশ্বাসই করতেন না। সপ্তাহে দু'দিন স্যার দিব্যর বাড়িতে গিয়ে পড়ান।

রিক্সা চালাতে চালাতে হারানদা সব কথা শুনছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল, "তুমি ঠিক কাজ করো নাই সন্তু দাদাবাবু। স্যাররে সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল তোমার। গান্ধীজি শিখায়েছে, সত্য কথা বলতে।"

... সেই সব দিন কত সুন্দর ছিল। শুভ্র জানে, সন্তুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা গত বারো-তেরো বছরে অনেক নিখাদ হয়ে উঠেছে। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আর দেরি করা যায় না। সন্তুকে জাগাবার জন্য ও বেশ জোরেই ধাক্কা দিল। ঘুমের মাঝে পাশ ফিরল সন্তু। ওর কোমর থেকে কী

যেন একটা বিছানায় পড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়েই শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শুভ্রর। বিস্ফারিত চোখে ও তাকিয়েই রইল।

বিছানার উপর একটা রিভলভার!

পাত্তি টু সিঙ্গল

দিনটা যে আজ খুব ভাল যাবে, এমন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না কেলে পাঁচু। গুমটির ভেতর বসে থেকে থেকে পায়ে খিল ধরে গেল, অথচ তেমন কারবার নেই। পাল্টার আসুক বা না আসুক, সারাটা দিন এখন ওকে অপেক্ষা করেই যেতে হবে। এ পাড়ায় সাট্টায় ভাল লোডিং হয় শুক্রবারে। শনি-রবি বোম্বাইয়ের খেলা নেই বলে। কেলে পাঁচু মনে মনে হিসাব করল, তখনও পর্যন্ত লোডিং হয়েছে হাজার দেড়েক টাকার। অথচ, অন্যদিন বেলা বারোটার মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি টাকার প্যাড লেখা হয়ে যায়।

সাট্টার একজন অভিজ্ঞ পেনসিলার হিসাবে কেলে পাঁচু অবশ্য জানে, এতে ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। এই কারবারে আর যাই হোক, সকাল দেখে অন্তত সারাদিন আন্দাজ করা যায় না। যখন আসবে, পাল্টারদের ভিড় একা সামলানো যাবে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে তাই সারাদিন ও বসে থাকে। পাল্টাররা সবাই ওর খুব চেনা। জনমজুর, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা থেকে কোটপ্যান্ট পরা বাবু— সবাই। এ অঞ্চলে পেনসিলার হিসাবে ওর বেশ সুনাম আছে। সবাই জানে, পাঁচু দু'নম্বরি না। নম্বর মিললে, নিয়ম হচ্ছে, দিনের দিন পেমেন্ট। বিশ্বাস করে বলে অনেকে পরদিন সকালেও টাকা নিয়ে যায়।

আসলে কেলে পাঁচুর ঠেকটাও খুব ভাল জায়গায়। চিড়িয়ামোড় আর সি আই টি স্টপেজের মাঝে, বি টি রোড থেকে একটু ভেতরে। গোপেশ্বর দত্ত স্কুলের ঠিক পিছনে। ওই অঞ্চলটায় কালোয়ার পট্টি। আশপাশে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস, মোটর পার্টসের দোকান ছাড়াও দু'তিনটে ধাবা আর পঞ্জাবি রেস্তোরাঁও আছে। কয়েক পা দূরত্বেই ট্যাক্সি আর রিক্সা স্ট্যান্ড। ভোর ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত— অনবরত লোক যাতায়াত করে। পাঁচুর এত পাল্টার যে, একেক দিন দম ফেলারও ফুরসত পায় না।

ইদানীং সবজি বাগান বস্তির একটা ছেলে— বিল্লা ওর কাছে খুব ঘুরঘুর করছিল। এঁড়েদার ছেলে, পনেরো-ষোল বছর বয়স। ক্লাস এইট অবধি গিয়েছিল স্কুলে। তারপর ছেড়ে দেয়। ঘরে বসে থাকার জন্য বাপের লাথ খাচ্ছিল। বাপটা চিৎপুরের ফুটপাতে বসে ফল বিক্রি করে। বিল্লাটাকে ওস্তাগর করতে চেয়েছিল। মেটেবুরুজে পাঠিয়েছিল এক কারিগরের কাছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বিল্লা পালিয়ে আসে মেটেবুরুজ থেকে। কেলে পাঁচুর ঠেকে প্রথম দিকে বিনা কারণেই ও আসত। ফাই ফরমাস খেটে দিত। ক্রমশ প্যাড লেখার কাজটা নিজের থেকেই শিখে ফেলে। পাঁচু ওকে মাইনে দিয়ে রেখেছে। বিল্লা এমনিতে বেশ চটপটে ছেলে। সাট্টার ব্যাপারটা এখন বেশ বুঝে গেছে। পাল্টারদের সঙ্গে ও খুব ভাল

সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে।

শুধু প্যাড লেখাই নয়, বিল্লা মাঝেমধ্যে নানা রকম খবর এনেও দেয়। কেলে পাঁচুর জীবনটা এখন বাঁধা হয়ে গিয়েছে, কাঠের ছোট্ট এই গুমটিতে। সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটায় এসে ঢোকে। ধাবায় খেতে যাওয়া ছাড়া, একেবারে ও বেরোয় সেই রাত বারোটা-সাড়ে বারোটায়। জগতে আর কোথায় কী হচ্ছে, ও জানতেই পারে না। শনি-রবিবার কখনও সখনও অবশ্য যায় রাজাবাগানে গোখনার গদিতে। এ অঞ্চলে সাট্টার মালিক ওই গোখনা। হারামির বাচ্চাকে পাঁচু দু'চোখে দেখতে পারে না।

সাট্টার সঙ্গে দিন-ভোর জড়িয়ে থাকলেও বিল্লার একটা গুণ লক্ষ্য করেছে কেলে পাঁচু। রোজ সময় করে খবরের কাগজটা পড়ে। বউবাজারে রশিদকে নিয়ে যাবতীয় খবর ও শোনে বিল্লার কাছেই। বোমায় যে দিন রশিদের গদি উড়ে গেল, ব্যাটাচ্ছেলে সেদিন বউবাজার পর্যন্ত ঘুরে এসেছিল। রাতে সব খবর দিয়ে, শেষে বলেছিল, দিন কয়েক এখন হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ঘুরতে হবে পাঁচুদা। সাট্টা-ফাট্টা বন্ধ রাখতে হবে।

কেলে পাঁচু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী শুনে এলি, রশিদ মিঞাকে নিয়ে ? ওর কী হবে ?"

—কী আর হবে। জেলের ঘানি টানবে। পুলিশ কিছুদিন সাট্টার ঠেকগুলোতে রেইড করবে। তারপর যে কে সেই।

বিল্লার, সেদিনের কথাগুলো সত্যি সত্যি মিলে গেছে। ব্যাটা খুব বুদ্ধি ধরে। লাইনে যদি টিকে থাকে, তা হলে একদিন নাম করবে। এই সেদিন যেমন খবর নিয়ে এল, ঘুঘুডাঙায় রতা পেনসিলার মার খেয়েছে। পেনসিলাররা কখনও ঝুট ঝামেলায় থাকে না।

কৌতূহলের সঙ্গেই ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "রতার কেসটা কী রে বিল্লা ?"

—ভদ্দর ছেলেদের সঙ্গে রোয়াবি করতে গিয়েছিল।

—কেন রে ?

—ওই আর কী, মাস্তানি। ভদ্দর ছেলেদের সঙ্গে কখনও মাস্তানি করতে আছে ? কার কোথায় জানা, চেনা— তুমি জানতেও পারবে না। রতা সেই ভুলটাই করেছে। ও পাড়ায় খবরের কাগজের একজন রিপোর্টার থাকে। তার ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে ঝামেলা।

—কিন্তু ওকে এ রকম পেটাল কে রে ?

—ওই, সন্তু বলে একটা ছেলে। আমি চিনি না। তবে শুনেছি, আগে ক্যারাটে শিখত।

—ছেলেটার সাহস আছে। হ্যাঁ রে, রতার খবর শুনে গোখনা কিছু করেনি ?

—এখনও কিছু করেনি। তবে ওকে তো জানোই, ছ' মাস চুপচাপ বসে থাকবে। তারপর হঠাৎ একদিন শোধ তুলে নেবে।

—শালা, রিয়েল হারামির বাচ্চা। বলে কেলে পাঁচু কারবারে মন দিয়েছিল।

ইদানীং বিল্লার ওপর একটু বেশিই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পাঁচু। আজকাল থানার ওপর আর ভরসা করা যাচ্ছে না। হুটহাট রেইড হচ্ছে লালবাজার থেকে। কে এক

সার্জেন্ট মাঝে মাঝেই উৎপাত করছে দু' চারজন সঙ্গে নিয়ে এসে। কয়েকদিন আগে, কাশীপুর থেকে তুলে নিয়ে গেছে বাবুলালকে। ওর লোকজনকে এমন মার মেরেছে, শুনে আঁতকে ওঠার মতো। গোখনাকেও হয়তো কোনওদিন তুলে নিয়ে যাবে। তবে অনেক বড় বড় গাছে ওর টিকি বাঁধা আছে। ওকে কিছু করা চাট্টিখানি ব্যাপার না। দমদম স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড়, সিঁথিরমোড় থেকে বেদিয়া পাড়া— গোখনার এরিয়া। থানা থেকেই এরিয়াটা ঠিক করে দিয়েছে। মাঝে আর কোনও মাস্তান নেই।

পাল্টার নেই, কাঠের গুমটিতে বসে বসে আজ এ সব কথাই ভাবছে কেলে পাঁচু। এই সময়টায় এত আলিস্যি করার সুযোগ পায় না অন্যদিন। কলাবাগান আর ভূতনাথের ওপেন খেলাটা হয় দুপুর দু'টোর সময়। এখনও ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। খেলার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে প্যাড লেখা বন্ধ করে দেবে পাঁচু। গোখনার কাছ থেকে রানার আসবে সাইকেলে করে। প্যাডের কাউন্টার ফয়েলগুলো নিয়ে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যাবে রাজাবাগানের দিকে। গদিতে বসে গোখনার লোকজন সব হিসাব করবে।

গোখনার ওপর ভীষণ রাগ কেলে পাঁচুর। মা-বোনদের ইজ্জত দিতে জানে না। কাঁচা পয়সা হাতে এসে গেলে সবারই একটু-আধটু মাগীবাজির শখ-আহ্লাদ হয়। কিন্তু তাই বলে নিজের লোকেদের মা-বোনকে নিয়ে টানাটানি, পাঁচুর পছন্দ নয়। একটা বেকার ছেলেকে হিসাবপত্র রাখার জন্য কাজ করাচ্ছিল গোখনা। হঠাৎ তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। ছেলেটার দিদি দেখতে শুনতে ভাল। একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। গোখনা গিয়ে...। পেটে বাচ্চা এসে যাওয়ায় ওই ছেলেটার দিদি দমদম স্টেশনের কাছে ইলেকট্রিক ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে, এই ক'দিন আগে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটার মায়ের সে কী কান্না! গোখনার সঙ্গে পাঁচুর আলাপ বছর দশেক আগে। মাত্র একদিনই, কোনও একবার পুজোর সময় ও গোখনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল। বউ যমুনাকে দেখে হারামখোরের চোখ যেন চকচক করে উঠেছিল। পাঁচু ওই চোখটা চেনে। স্পষ্ট দেখেছিল ও, খাবার টেবলে যমুনা যখন বিরিয়ানি দিচ্ছে, সেই সময় বুকের আঁচল একটু সরে গিয়েছিল। গোখনা একদৃষ্টিতে বুকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দিন তিনেক পর, গোখনা হঠাৎ একটা কাজে ওকে নৈহাটি পাঠায়। ফিরে এসে যমুনার কাছে শোনে, বাড়িতে নাকি গোখনা ওকে খুঁজতে এসেছিল। সেইদিন থেকে, পাঁচু সাবধান হয়ে গেছে। গোখনা অবশ্য মাঝে মাঝেই বলে, "একদিন দাওয়াত-টাওয়াত দাও পাঁচুদা। এত কামাচ্ছ। বউয়ের হাতে রান্না একটু খাওয়াও।" পাঁচু হেসেই উড়িয়ে দেয় এখন সে কথা। আর মনে মনে খিস্তি মারে।

গোখনার মতো বাজে লোকেরা সব কিছু করতে পারে। হয়তো পাঁচ-সাতদিনের জন্য লক আপেই ঢুকিয়ে দিল। আর সেই সুযোগে, বাড়িতে এসে...। সাবধান, খুবই সাবধানে থাকে পাঁচু আজকাল। বিল্লাকে মাঝেমধ্যে ও দাঁড় করিয়ে রাখে বি টি রোডের মুখে। নানা ধরনের লোক যাতায়াত করে। কার মনে কী আছে, জানা মুসকিল। কে শালা এসপেশাল হয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল, বোঝার সাধ্যি নেই। থানা থেকে মাঝে মাঝে এসপেশাল আসে। মানে সাদা পোশাকের পুলিশ। বিল্লা ঠিক বুঝতে পারে। সন্দেহজনক কাউকে গলিতে ঢুকতে দেখলেই, মোড় থেকে সিটি মেরে

জানিয়ে দেয়, সাবধান হতে। গুমটির মেঝেতে কাঠের একটা পাল্লা তুললেই, বাক্সের মতো একটা খাঁজ আছে। বিল্লার সিটি শোনামাত্র পাঁচু তাড়াতাড়ি প্যাড-ট্যাড খাঁজে ঢুকিয়ে দেয়। আর, গুরুতর কিছু হলে বিল্লা নিজেই দ্রুত পায়ে চলে আসে গুমটির দিকে। বসে বসে গোখনা বানচোতের কথাই ভাবছিল পাঁচু। হঠাৎ দেখল, দ্রুত পায়ে বিল্লা এদিকেই আসছে। পাঁচু একটু সতর্ক হয়ে গেল। বিল্লার হাতে মুড়ির ঠোঙা। খেতে খেতেই ও ইশারা করল পিছনের দিকে। একটা বাইশ-চব্বিশ বছরের ঢ্যাঙা ছেলে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। ঢ্যাঙা হলে কী হবে, বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। দেখে মনে হয় ভদ্রঘরের। পরনে জিন্‌সের প্যান্ট, সবুজ রঙের টি-শার্ট। ছেলেটা সোজা এসে দাঁড়াল গুমটির সামনে। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে পাঁচু বুঝে ফেলল, ছেলেটা একটু বেয়াড়া ধরনের। ওই বয়সী যারা নতুন সাট্টা খেলে, তারা ওভাবে আসে না। বি টি রোডের মুখে প্রথমে একটু ঘোরাঘুরি করে, চেনা লোক দেখলে একদম ভেড়ে না।

ছেলেটা একটু রুক্ষভাবেই জিজ্ঞাসা করল, "অ্যাই, এখন কোন খেলাটা হচ্ছে?"

প্রশ্ন শুনেই কেলে পাঁচু বুঝে নিল, সাট্টা সম্পর্কে ছেলেটার কোনও ধারণাই নেই। নিয়মিত যারা খেলে, সেই পাণ্টাররা কোনওদিন এই ছেলেমানুষি প্রশ্নটা করবে না। থানার লোক? তাও না। ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল পাঁচুর। বুকে সাহস এনে ও বলল, "আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে স্যার। কেন এই বাজে জিনিসের মধ্যে ঢুকছেন?"

স্যার, কথাটা বলতে চায়নি। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নতুন যারা খেলতে আসে, তাদের প্রত্যেককেই একথা বলে পাঁচু। নিজে সাট্টা চালায়, তবু বলে। সাট্টা যে কী সর্বনাশা নেশা, ওর থেকে ভাল আর কে জানে? কত গরিব লোকের, মেহনত করে রোজগার করা টাকা এতে নষ্ট হয়, সে তো ও নিজের চোখেই রোজ দেখতে পাচ্ছে। লোকে রেসের মাঠে যায়, সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসে। সাট্টাও সে রকম। দিনান্তের রোজগারটা জলে যায়।

ছেলেটা একটু কড়া গলায় বলল, "শালা জ্ঞান দিবি না। যা বলছি, কর। তোদের কী সব নম্বরের খেলা হয়, চট করে লিখে দে।"

বিল্লার সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল কেলে পাঁচুর। অন্যদের সময় ও নিজেই অনেক সময় ফিগার আর পাত্তির নম্বর বলে দেয়। বিশেষ করে, প্রথম যারা খেলতে আসে, এমন পাণ্টারকে। এ লাইনে বহুদিন আছে বলে, একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। ওই দিন কোন ঘর খুলতে পারে, সেটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সব সময় অবশ্য নম্বর মেলে না। কোনও কোনও সময় মেলে। আর মিলে গেলেই পাণ্টারদের নেশা বেড়ে যায়। ফিগার মিলে গেলে এক টাকার বাজিতে পাওয়া যায় ন'টাকা। পাত্তিতে এক টাকায় একশো পঁচিশ। পাত্তি সে পাত্তি মিলিয়ে দিতে পারলে এক টাকায় পাণ্টার পায় আট হাজার টাকা।

ছেলেটাকে সামলাবার জন্য এবার এগিয়ে এল বিল্লা। পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "স্যার ফিগার লেখান আট। আর পাত্তি ১২৫। কে বি, আর বি এন খেলুন না, স্যার। রাত আটটায় একবার খবর নেবেন। তা কত খেলবেন স্যার?"

বার কয়েক স্যার শুনেই বোধহয় একটু ভিজল ছেলেটা। বিল্লা পারে বটে! কথাবার্তায় মাস্টার। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে ছেলেটা জিজ্ঞাসা

করল, "তুই রোজ খেলিস ?"

বিল্লা একটু লজ্জার ভান করে বলল, "এই, মাঝেমধ্যে, একটু-আধটু শখ হলে স্যার। আমি এই কাছাকাছি থাকি। তাই সব জানি। ওই নাম্বার লাগান, খারাপ হবে না।"

দু'একজন চেনা পাণ্টার আসছে। এই উটকো ঝামেলাটাকে যত তাড়াতাড়ি সরানো যায়, ততই মঙ্গল। কেলে পাঁচু তাই তাড়াতাড়ি বলল, "ওই দু'টো নম্বর কি লিখব, স্যার ?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল। শুনে লাল রঙের প্যাডটা টেনে নিয়ে পাঁচু লিখতে শুরু করল। দেশলাই বাক্সের চেয়ে সামান্য বড় সাইজের হয় প্যাড। পঞ্চাশটা করে পাতা এক সঙ্গে। ধর্মতলায় চাঁদনির কাছে কিনতে পাওয়া যায়। পেনসিলারদের অবশ্য কিনতে হয় না। বুকিরাই এসব পাঠিয়ে দেয়। দিনে এ রকম দশটা প্যাড লাগে পাঁচুর। যে পেনসিলারের যত বেশি প্যাড লাগে, বুকির কাছে তত বেশি খাতির তার।

প্যাডের প্রতি পাতায় আলাদা আলাদা নম্বর থাকে। লেখার সময় শেখ পাঁচু অবাক হয়ে দেখল, পাতার নম্বর ১২৫। নম্বর নিয়েই ওর কারবার। কেন জানে না, হঠাৎ ওর মনে হল, এই ছেলেটার নম্বর আজ মিললেও মিলতে পারে। আটের ঘর শেষবার খুলেছিল দিন পাঁচেক আগে। সেদিন পাত্তি হয়েছিল ১৩৪। শেখ পাঁচু হিসাব করল, পাত্তিটা যদি মেলে, আজ তা হলে এই ছেলেটাকে সাড়ে বারোশো টাকা দিতে হবে।

প্যাডের পাতাটা ছিঁড়ে ও তুলে দিল ছেলেটার হাতে। তলায় কার্বন দেওয়া। কাউন্টার ফয়েল পাঁচুর কাছেই থেকে যাবে। রেজাল্ট বেরোবার পর নম্বর যদি মেলে, তা হলে ও সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেবে পাণ্টারকে।

পাতায় লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখছে ছেলেটা। বিল্লাকে জিজ্ঞাসা করল, "কে বি, আর বি এন-টা কী রে ?"

বিল্লা গলায় মধু ঢেলে বলল, "কে বি মানে স্যার, কলাবাগান। আর বি এন হল ভূতনাথ। আপনি ওই দু'জায়গায় খেললেন। ঠিক আছে স্যার, রাতে তা'লে আসবেন।"

ছেলেটা বলল, "বোম্বেতে যে খেলাটা হয়, সেটা কেন দিলি না ? শুনেছি, ওটাই তো সব থেকে বড়।"

শুনে পাঁচুই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ওসব অনেক রাত্তিরে খেলা হয় স্যার।" ... যত শিগ্গির সম্ভব, ছেলেটাকে ও ভাগাতে চাইছিল। কেননা, ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছিল, দু'চারজন চেনা পাণ্টার কাছে আসতে দোমনা করছে নতুন মুখ দেখে।

প্যাডের পাতা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ছেলেটা এবার হাঁটতে শুরু করল বি টি রোডের দিকে। পাঁচু জানে, একটু তফাতে বিল্লা এবার ওর পিছু নেবে। তেমন সন্দেহ হলে, সিঁথির মোড় পর্যন্তও হেঁটে যাবে। নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত ও ফিরবেই না। রাস্তার দিকে একবার তাকিয়ে শেখ পাঁচু প্যাড লেখায় মন দিল।

—পাঁচুদা, একটা বোম্বে লাগাও...।

সমুর গলা শুনে পাঁচু একবার মুখ তুলে তাকাল। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে সমু। মুখে হাসি। বিল্লারই সমবয়সী ছেলে। রিক্সা চালায়। ব্যাটাচ্ছেলে সকালের

দিকে একবার কে বি, আর বি এন খেলে গেছে দু' টাকার। আবার এসেছে।

হাসিমুখেই সমু কথা শেষ করল, "ওপেন আর ক্লোজ— দুটোতেই। মাইরি বলছি, আজ আর আসব না।"

অন্যের প্যাড লিখতে লিখতে পাঁচু বলল, "তোর কি কোনওদিন আক্কেল হবে না সমু? এই তো সকালে লাগিয়ে গেলি। ফের এয়েচিস? মায়ের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যা না।"

আগে হলে সমু রেগে যেত। বলত, তোমার কী? এখন এই ধরনের কথা শুনতে ও অভ্যস্ত। বলল, "বরানগরে একটা টিপ মেরে এলাম। কড়কড়ে পাঁচ টাকা। ভাবলাম, দু' টাকা খেলে যাই। জুড়ি লাগাও, পাঁচ আর সাত।"

—তোর মা কেমন আছে রে? আগে তবু মাঝে মধ্যে এদিকে আসত। অনেকদিন দেখি না।

—মায়ের কথা আর বোলো না। বাবুদিগের বাড়ি খেটে খেটে ওর শরীরটে উচ্ছন্নে গেছে। কোন দিন শালা, রতনবাবুর ঘাটে নে যেতে হবে কে জানে?

কেলে পাঁচু ধমক দিল, "চুপ মার ব্যাটা।"

সমুকে বকল বটে, কিন্তু প্যাড লিখে দিল। সমুর মা-বাবাকে অনেক দিন ধরেই চেনে পাঁচু। সবজি বাগানের বস্তিতে একসময় সমুদের ঘরের পাশেই ওরা থাকত। কাশীপুরে একটা পাটের গুদামে কাজ করত সমুর বাবা। সমু যখন খুব ছোট, সেই সময় কাশির রোগে ধরল ওর বাবাকে। কাশতে কাশতেই লোকটা একদিন মরে গেল। বউদি খুব ভাল পালংশাকের তরকারি রাঁধত। সাত চড়েও কোনও রা বেরোত না। সেই ঠাণ্ডা স্বভাবের বউদি পরের বাড়িতে রান্না করার কাজে লাগল। এর কিছুদিন পরেই, কেলে পাঁচু বউ যমুনাকে নিয়ে উঠে আসে গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির পাশে একটা ভাড়া বাড়িতে।

সমুকে দেখলেই পাঁচুর, নিজের ছেলের কথা মনে হয়। এক সময় শ্যামু আর ও একসঙ্গে বস্তির উঠোনে খেলে বেড়াত। এখন শ্যামু ক্লাস এইটে পড়ে। ওর এক পিসি থাকে খিদিরপুরে। শ্যামু এখন তাঁর কাছেই থেকে পড়াশুনো করে। পিসিই ওকে ভর্তি করে দিয়েছে সেন্ট টমাস স্কুলে। নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি পাঁচু। ওর খুব ইচ্ছে, শ্যামুকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবে। কোর্টের উকিলবাবুদের মতো যেন ও ইংরাজিতে কথা বলতে পারে।

শ্যামুকে ও ইচ্ছে করেই নিজের কাছে রাখেনি। কুড়ি বছর ধরে ও এই পাঁক ঘাটছে। ধরেই নিয়েছে, মরার পর ওর স্থান হবে নরকে! তবে পেট ভরাবার জন্যে বহু লোক তো খুন-খারাপিও করে। সেটা আরও খারাপ কাজ, আরও পাপ। শ্যামু দাঁড়িয়ে গেলেই ওকে আর পেনসিলারের কাজ করতে হবে না।

রোজ রোজ পাল্টারের গালাগাল, তাদের পরিবারের অভিশাপ, বুকির চোখ রাঙানি, মাস্তানদের জুলুম আর পুলিশের ভয় ভাল লাগছে না। নয় নয় করেও ওর বয়স হয়ে গেল চল্লিশের কাছাকাছি।

বেলা প্রায় একটার সময় গুমটিতে ফিরে এল বিল্লা। পাঁচু ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বলল, "না, ভয়ের কিছু নেই। ছেলেটা রামলাল আগরওয়াল লেনের একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।"

—তুই ওর পিছু পিছু এদ্দূর গেছিলি !

—সাবধানের মার নেই পাঁচুদা।

—বাব্বাঃ, পারিস বটে। এতক্ষণ প্যাড লিখে লিখে জেরবার হয়ে গেলুম। একটা জর্দা-পান নিয়ে আয় ব্যাটা।

—এখন খাবে কেন। বউদি তো খাবার নিয়ে আসবে এট্টু পর। তখন একেবারে খেও।

কেলে পাঁচু প্রশ্রয় দেওয়ার হাসি হাসল, "শালা মাক্ষিচুস। আজ আর খবর-টবর শোনালি না।"

বিল্লা বলল, "কী খবর আর দেব। তোমার ভাল লাগবে না। সিঁথির মোড়ে চাঁদুর সঙ্গে দেখা। বলছে, পাঁচুর কাছে থেকে আখেরে তোর লাভটা কী। বরং আমার মিনিবাসে হেল্পার হয়ে যা। কালে কালে ডেরাইভারিটা যদি শিখে নিতে পারিস, তোর হিল্লে হয়ে যাবে। কী হারামি বলো, লোকটা।"

কেলে পাঁচু একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই তাকাল বিল্লার দিকে। ওর মুখে সদ্য গোঁফের রেখা। তবে বুদ্ধির ছাপ আছে। সত্যিই তো, সাট্টায় এই ছেলেটার ভবিষ্যতই বা কী। চাঁদু মন্দ বলেনি। ড্রাইভারি শিখে নিতে পারলে ছেলেটা একদিন ভাল চাকরিও পেয়ে যেতে পারে। অথবা অন্য কোনও হাতের কাজ শিখলেও পারে। স্বার্থপরের মতো ও নিজে বিল্লাকে জড়িয়ে রেখেছে।

কেলে পাঁচু বলল, "চাঁদুকে তুই কী বললি ?"

—বললাম, পাঁচুদাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বাপ যখন লাথি মারছিল, তখন ও আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

—চাঁদু কিন্তু কথাটা খারাপ বলেনি ব্যাটা। সকালের দিকে কোথাও ডেরাইভারি শিখতেও তো পারিস।

—তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

—ঠিক আছে, দাঁড়া। মদন বুড়ো আসুক। তোর কথা তা'লে বলে দেখব।

—মদন বুড়ো মানে...ওই বিবি বাগানের লোকটা ?

—হ্যাঁ। বত্রিশ নম্বর রুটে গাড়ি চালায়। তোর বউদির পিসতুতো দাদা। আমার যদি মনে না থাকে, ভাবীকে বলিস। ও-ও ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আমি যখন তোর মতো ছিলাম, তখন কেউ আমাকে এ সব কথা বলেনি রে। তোর মতো বয়সে আমাকেও বাবা তাড়িয়ে দেছল।

দু'জন পান্টারকে আসতে দেখে পাঁচু চুপ করে গেল। বিল্লা বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। এই আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লোকজনের ভিড় থাকবে। বেলা দু'টোর সময় গোখনার লোক প্যাডগুলো নিতে আসবে। তারপর ঘণ্টাখানেক আবার ফাঁকা। ওই সময়টায় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেয় পাঁচু আর বিল্লা। বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দেয় যমুনা। বেশির ভাগ দিন অবশ্য নিজেই নিয়ে আসে। গুমটির ধারে কাছে আসে না। বলা আছে, রামলখনের ধাবায় ও অপেক্ষা করে। পাঁচু ওখানেই খেয়ে নেয়।

....বেলা দু'টোর সময় ধাবায় পৌঁছেই ও দেখল, এক কোণে যমুনা বসে আছে। বেঞ্চের ওপর টিফিন কেরিয়ার। এই সময়টায় ধাবায় ভিড় থাকে না বললেই চলে।

রাত আটটার পর বসার জায়গা পাওয়া যায় না। বাইরে ড্রামে রাখা জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে পাঁচু ভেতরে ঢুকল।

ক্যাশ কাউন্টারে বসা রামলখন ঠাট্টা করে বলল, "ইতো বিজনেস করলে কী করে চলবে পাঞ্চুবাবু। ভাবীজি আধ ঘন্টা বইসে আছেন ধাবায়।"

মৃদু হেসে পাঁচু এল যমুনার কাছে। সাদা খোলের ওপর ছিট ছিট কটন শাড়ি পরে এসেছে। পায়ে হাওয়াই চটি। যমুনার দিকে একবার তাকিয়ে ও মনে মনে বলল, "বউটা আমার দেখতে খারাপ না।"

টিফিন ক্যারিয়ার খুলে ও দেখল, ভাত, পালং শাকের তরকারি, আর বাঁধাকপি দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝোল। তরকারি দিয়ে ও ভাত মাখা শুরু করতেই যমুনা বলল, "আজ লোডিং কেমন হল গো ?"

রোজই এটা ও জানতে চায়। যত লোডিং হবে অর্থাৎ বোর্ডে বাজির টাকা পড়বে, পেনসিলারের তত লাভ। কেন না, তত বেশি কমিশন। একশো টাকায় কমিশন আট টাকা। সব জায়গায় অবশ্য এক নিয়ম নয়। এক বুকির কাছে একেক রকম কমিশন। কেউ ছয় পার্সেন্ট দেয়, কেউ সাত।

খেতে খেতেই পাঁচু বলল, "মন্দ না। এখনও পর্যন্ত হাজার তিনেক টাকার মতো।"

শুনে যমুনা একটু খুশিই হল। এবার চাপা স্বরে বলল, "বাগনান থেকে জামাইবাবু এয়েচে।"

কখন ?

—খানিক আগে। তোমার সনে কথা বলতে চায়।

—কথা বলতে চায় তো রোববার আসে না কেন ? সারা দিনটা বাড়িতে থাকি। এখন আমার ফুরসত আছে ?

—অনুর বিয়ে ঠিক হয়েছে। নেমন্তন্ন করতে এয়েচে।

—ও। এই ব্যাপার। বিয়ে কবে ?

—এই মঙ্গলবার।

—ছেলে কোথাকার ?

—সাঁকরাইলের। জুট মিলে কাজ করে।

—বাঃ।

খেতে খেতেই মনে মনে যমুনার প্রশংসা করছিল শেখ পাঁচু। রান্নাটা খারাপ করে না। এখন তো আর খাওয়া-পরার অভাব নেই সংসারে। কমিশন বাবদ দিনান্তে শ' তিনেক টাকা রোজই হাতে থাকে। বাজি মারলে পান্টাররাও অনেক সময় বখশিস দেয়। সেই টাকা ও কখনও সাট্টায় লাগায় না। অন্য পেনসিলাররা সাধারণত যা করে থাকে। এ'ছাড়াও অন্য রোজগার আছে। সারাটা দিন ঘরেই বসে থাকত যমুনা। সময় নষ্ট না করে এখন ও নানারকম সেলাইয়ের কাজ করে। মেটেবুরুজ থেকে ওস্তাগরের লোকেরা কাজ দিয়ে যায়।

খেতে খেতেই পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, "আমার খোঁজে কেউ এসেছিল ?"

—হ্যা, স্বপনদা।

—এখানে আসেনি তো।

—টাকাটা আমার কাছে দিয়ে গেল। সাতশো টাকা।

—তা হলে বাকি রইল আর আড়াইশো।

—টাকাটা আবার অন্য কিছুতে খরচ কোরো না। অনুর বিয়েতে একটা কিছু তো দিতেই হবে।

—ভাল একটা বেডকভার দিয়ে দাও। আমি ভাবছি, স্বপনের কথা। সাচ্চা লোক। কী বলো।

ঘাড় নেড়ে যমুনাও স্বীকার করল। স্বামীকে গোগ্রাসে খেতে দেখে ও বলল, "তোমার খুব খিদে পেয়েছিল বুঝি। সকালে কি খেয়েছিলে?"

—আলু পরোটা।

....এই সব টুকরো কথাবার্তার মাঝেই কেলে পাঁচু খাওয়া শেষ করল। রাতে বাড়ি ফিরতে প্রায় একটা বেজে যায়। বোম্বের ক্লোজের খেলাটা হয় বারোটার সময়। খবর আসতে, আর পেমেন্ট দিতে দিতে আরও আধ ঘণ্টা। রাতের খাবার ঢেকে রেখে দেয় বউ। অনেক অনেক দিন আবার ওর জেগে থাকার ক্ষমতাও থাকে না।

টিফিন ক্যারিয়ার সাজিয়ে নিচ্ছে বউ। একটু পরেই কাঁটাকলের গলি দিয়ে চলে যাবে বাড়ির দিকে। মুখ ধুয়ে এসে পাঁচু গামছায় মুখ মুছে নিল। যমুনার যত্ন আত্তির কোনও তুলনা নেই। গামছাটাও সঙ্গে নিয়ে আসে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে মনটা ওর তৃপ্তিতে ভরে গেল। আগে খুব সাজতে ভালবাসত যমুনা। ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার থেকে সেটা হঠাৎ কমে গিয়েছে। শরীরটা এখনও এমন আঁটোসাটো রেখেছে যে, আরেকবার বিয়ের জন্য বসানো যায়। দু'জনেই একটার বেশি সন্তান কখনও চায়নি। বাগনানে ওর সব বান্ধবীদের পাঁচ-ছ'টা করে ছেলে-মেয়ে। ওদের এমন ভগ্নস্বাস্থ্য, কখনও কখনও দেখা হলে পাঁচু চিনতেই পারে না।

যমুনা বাড়ি চলে যাওয়ার পর ধাবায় কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়ার অভ্যেস আছে পাঁচুর। দড়ির খাটিয়া সব সময় দাঁড় করানোই থাকে। বি টি রোড দিয়ে যে সব ট্রাক রাতের দিকে জি টি রোড ধরে অথবা ব্যারাকপুরের দিকে যায়, খাওয়ার পর তাদের ড্রাইভাররা কখনও কখনও খাটিয়ায় জিরিয়ে নেয়। একটা খাটিয়া পেতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল পাঁচু। গোপেশ্বর দত্তর রাজবাড়ির বাগানটা ঠিক পিছনেই। সেখান দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে। খাটিয়ায় শুলেই তন্দ্রা এসে যায়। নিশ্চিন্তে, আলস্যে ওর মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের কথা।

...জীবনটা ওর অন্য খাতে বয়ে গেল স্রেফ বাবার এক পাগলামিতে। চিৎপুরে গগন কালু লেনে এক সময় ওদের নিজস্ব বস্তি ছিল, দশ-এগারো ঘর ভাড়াটেসহ। বাবা কাজ করতেন জাহাজে। নয়-দশ মাসই বাড়ির বাইরে থাকতেন। উনি যখন দেড়-দু'মাসের জন্য বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রতিটা দিনই মনে হত পুজোর দিন। বাইরে থেকে কত কী আনতেন বাবা। উনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার কিছুদিনের মধ্যে মা মারা গেলেন।

কেলে পাঁচু সেই সময় বিবিবাজারের স্কুলে পড়ত। ওর বয়স তখন পনেরো। আর ওর দাদা পিয়ারুর বয়স আঠারোর মতো। বাবা বসে না থেকে মুন্সির কাজ ধরলেন চিৎপুরের হোটেল আলিসানে। ওখানেই কী যে হল, বাবা হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন ওঁর চেয়ে বছর চল্লিশ কম এক বিধবাকে। দুই ভাই কিছুতেই নতুন মাকে

মেনে নিতে পারেনি। দাদার সঙ্গে রোজ রোজ ঝগড়া হত বাবার। ভাড়াটেদেরও উসকানি ছিল। দ'দার সঙ্গে আলাপ ছিল প্যারাডাইস সিনেমার গেটম্যান খসরুর। একদিন দাদা রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল খসরুর কাছে। সিনেমা হলের কাজে লেগে পড়ল। আর দাদার দেখাদেখি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে পাঁচু আশ্রয় নিল ফুটপাতে।

....খাটিয়ায় শুয়ে সেই সব দিনের কথা ভাবলেই পাঁচুর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। বাবা যদি বিয়ে না করতেন, তা হলে ওদের দুই ভাইয়ের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত না। এখনও পাঁচুর মাথায় ঢোকেনি, ওই বয়সে বাবার বিয়ে করার দরকার হল কেন ? আরও বোঝেনি, বাবার ঔরসে ফের কী করে তিন ভাই-বোন হয়। চিৎপুরে আর্মড ফোর্স ব্যারাকের পিছনেই বাজার ছিল। এখন নেই। সেখানে বাড়ি উঠে গিয়েছে। সেই বাজারে ফুটপাতে আনাজ বিক্রির ব্যবসায় নেমে পড়েছিল পাঁচু এক বন্ধুর পরামর্শে। সেই বন্ধুটিই স্বপন। এখন হাতিবাগানের বাজারে ফলের দোকান করেছে।

স্বপনের কাছ থেকে সামান্য টাকা নিয়ে পাঁচু ব্যবসা শুরু করেছিল। খুব ভোরে উঠে শেয়ালদার কোলে মার্কেটে যেত। আনাজ কিনে এনে বাজারে বসে যেত। খুব কষ্টের ছিল সে দিনগুলো। বর্ষা আর শীতের মরসুমেই কষ্টটা হত খুব বেশি। যাতায়াতের পথে বাবা ওকে দেখতেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা কখনই বলতেন না। বছর দু'য়েক ফুটপাতে ওইভাবেই কাটিয়ে ছিল পাঁচু। ও যেখানে শুতো, সেই জায়গাটা একবার দেখিয়ে ছিল যমুনাকে। দেখে তো বউয়ের মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। সেই ফুটপাতে থাকার সময়ই পাঁচুর নাম হয়ে যায় কেলে পাঁচু। কেননা বাজারে আরও একজন পাঁচু আনাজ বিক্রি করত। গায়ের রঙটা তার তুলনায় কালো বলে লোকে কেলে পাঁচু বলে ডাকতে শুরু করেছিল।

বাজারের পাশেই বিরাট একটা বাড়ি ছিল— লতিফ মঞ্জিল। ওই বাড়িতে থাকত কয়েক ঘর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার। ওরা সবাই চিনত পাঁচুকে। মাঝে মাঝে ফাইফরমাস খাটাত। দোতলার বারান্দা থেকে কোনও কোনও দিন মিস লিন্ডা ডাকত, "হাই পাঞ্চু, কাম হিয়ার।" ডাক শুনে ও বারান্দার ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়াত। উপর থেকে মিস লিন্ডা বলে দিত, দোকান থেকে কী আনতে হবে।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা সবাই খুব ভাল ছিল। নামগুলো এতদিন পর আর মনে নেই সব। এক সাহেব খুব মাল খেত। কোনও কোনও দিন রাতে বাড়ি ফিরবার সময় চুর হয়ে থাকত, টাল খেয়ে পড়েও যেত দরজার সামনে। পাঁচু ধরে ধরে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসত তিনতলায়। সাহেব পরদিন ডেকে ইনাম দিত পাঁচ-দশটাকা।

মিস লিন্ডাই একদিন ওকে ডেকে বলেছিল, "পাঞ্চু, ইউ কাম করেগা ? নোকরি ?"

পাঁচু ঘাড় নেড়েছিল। হাতের আঙুলের মুদ্রা দিয়ে বুঝিয়ে ছিল, "মিস লিন্ডা, কিতনা রুপিয়া মিলেগা ?"

—থ্রি হান্ড্রেড। তিনশো রুপিয়া। খুশ হ্যায় ?

আনাজ বিক্রি করে সেই সময় ওর রোজগার হত মাসে শ'দুয়েক টাকা। পাঁচু ভেবেছিল, মন্দ কী। মিস লিন্ডার সঙ্গে গিয়ে একদিন নোকরিটা পেয়েও গেল ও। বি টি রোডেই একটা মোটর পার্টসের দোকানে। ওখানে টায়ার রিসোলিংয়ের কাজই

হত বেশি। দোকানের মালিক থাকত ভবানীপুরে। কাজটা পাওয়ায় একটা সুবিধা হল, ফুটপাতে আর রাত্রিবাস করতে হত না। রাতে দোকানে শোয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

....খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে থাকতে পাঁচুর একবার মনে হল, টায়ারের দোকানে কাজ করার সময় যদি রামলালের সঙ্গে দেখা না হত, তা হলে কি সাট্টার লাইনে কোনওদিন ঢোকার কথা ও ভাবত? নিশ্চয়ই না। কী কুক্ষণেই না জামির হোটেলে দেখা হয়েছিল রামলাল ভাইয়ের সঙ্গে! ওই সময় দু'বেলা ওই হোটেলে খেতে যেত কেলে পাঁচু। খাওয়ার টেবলেই রামলালের সঙ্গে আলাপ। অনেক পরে, অন্তত বছর দু'য়েক বাদে ও জানতে পেরেছিল, রামলাল সাট্টার পেনসিলার।

মনে আছে, রামলাল ভাই সেদিন বলেছিল, "ফোকটে কিছু মাল কামাতে চাস, পাঁচু ভাই?"

মালের প্রচণ্ড দরকার তখন পাঁচুর। কিছু দিন আগে দাদার বিয়ের সময় তখন ও প্রথম দেখে যমুনাকে। নতুন বউদির কী যেন হয় মেয়েটা। গোলাপি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে সারা বাড়িতে ঘুরঘুর করছিল সে দিন। প্রথম দিন দেখেই পাঁচু অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেছিল। জানত না, আরও একজনের চোখও মেয়েটার দিকে পড়েছে। সে হল, ওরই সমবয়সী গোবিন্দ। বিয়ের দিনই গোবিন্দর সঙ্গে ওর চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছিল— কে মেয়েটাকে তুলতে পারে দেখা যাক। গোবিন্দ তখন টেম্পো চালায়। ভাল ইনকাম করে। ওর বাবা-মাও উৎসাহী ছিলেন যমুনা সম্পর্কে। অন্য দিকে, টায়ারের দোকানে চাকরিটা ছাড়া আর কিছুই নেই পাঁচুর। চিৎপুরের বাড়ি আর বস্তিটা তখন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাবা নাকি ক্ষেপে ক্ষেপে ধার নিয়েছিলেন আলিসন হোটেলের মালিকের কাছ থেকে। প্রায় আশি হাজার টাকা। সেটা উশুল করার জন্য হোটেলের মালিক বাড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে।

রামলালের কথায় তাই রাজি হয়ে গিয়েছিল পাঁচু। খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "ফোকটে মালটা আসবে কোত্থেকে ভাই?"

—আরে চল না আমার সঙ্গে। তুই শুধু নম্বর লাগাবি।

পাঁচুর মনে আছে, জামির হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে ওরা দু'জন গিয়েছিল বিবিবাজারের এক সাট্টা ঠেকে। সাট্টা সম্পর্কে সেই সময় কোনও ধারণাই ছিল না কেলে পাঁচুর। ও দেখল, সাট্টার লোকজনের সঙ্গে খুব খাতির রামলাল ভাইয়ের। একটা মোটর গ্যারাজের এক কোণে কুপি জ্বালিয়ে কী যেন লিখে লিখে দিচ্ছে একজন। অন্যরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে রেজাল্ট জানার জন্য।

রামলাল জানতে চেয়েছিল, "পকেটে কিছু মাল আছে ভাই?"

কেলে পাঁচু ঘাড় নেড়েছিল। গোটা কুড়ি টাকা পকেটে পড়ে ছিল। তখন ওর মাস মাইনে, মেপে খরচ করতে হয়।

—তা হলে গোটা দুই টাকা ছাড়। দেখো, তোমার কিসমতে পাত্তি লেগে যায় কি না।

পকেট থেকে পাঁচু দু' টাকার একটা নোট বের করে দিতেই রামলাল কুপির কাছে বসে থাকা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আজ বোম্বের ওপেনে কী হয়েছে রে? কত পেমেন্ট দিলি?"

লোকটা সালাম ঠুকে বলেছিল, "ওস্তাদ, ফিগারে তালা লেগেছিল। আর পাত্তিতে ১২৩। খুব বেশি পেমেন্ট দিতে হয়নি।"

রামলাল খুশি হয়ে বলেছিল, "বহুত আচ্ছা, এবার ক্লোজে লাগা। ফিগারে চেম্বার আর পাত্তিতে ১২৪।"

—ঠিক আছে ওস্তাদ। বলে খসখস করে কী যেন লিখে একটা কাগজের টুকরো রামলাল ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল লোকটা। পাঁচু কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাই, তোমরা কী সব কথা বলছ ? ফিগারে তালা....মানে কী ?"

হো হো করে হেসে উঠেছিল রামলাল, "একদিনে কিচ্ছু বুঝতে পারবি না ভাই। সাট্টা খেলার অংক সহজ না। এখানে অনেক রকমের খেলা হয়। ফিগার খেলা, মানে শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে তোকে যে কোনও একটা নাম্বার বলতে হবে। যেমন কি না, আমি বললাম ফিগারে চেম্বার। তার মানে ফিগারে সাত নম্বর। ইংরাজির সেভেন। চেম্বার কখনও দেখেছ ভাই ? আমরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কিছু কোড ব্যবহার করি। যাতে অন্যরা বুঝতে না পারে। যেমন ওই লোকটা বলল, ফিগারে তালা...তালা মানে ছয় নাম্বার। ইংরাজির সিক্স অনেকটা তালার মতো, তাই না ?"

কেলে পাঁচু উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। এ যেন রহস্যময় জগৎ। কুপির আলো, পরিত্যক্ত মোটর গ্যারেজ, চাপা ফিসফিসানি—সব কিছুই অদ্ভুত। রামলাল ভাইকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "পাত্তি কথাটার মানে কী ভাই ?"

রামলাল বুঝিয়ে দিয়েছিল, "পাত্তি হল আর একরকম খেলা। তোকে তিনটে নাম্বার বলতে হবে। কম থেকে বেশি। যেমন আমি তোর হয়ে খেললাম, ১২৪। এক দুই চার। তুই ১৪২ খেলতে পারবি না, বুঝলি ? এ বার এক দুই চারে যোগ দে। হলো গিয়ে সাত। দ্যাখ, ফিগারে আমি খেলছি সাত অর্থাৎ চেম্বার। এখন ক্লোজের খেলায় যদি ১২৪ ওঠে, তা হলে এখনই আড়াইশো টাকা পেয়ে যাবি তুই।

বুকটা ধুকপুক করে উঠেছিল পাঁচুর। দু' টাকার বাজি খেলে আ-ড়া-ই-শো টাকা ! এ তো প্রায় এক মাসের মাইনে !

....ওই দিনটার কথা ভেবে পাঁচু মুচকি হেসে উঠে বসল খাটিয়াতে। রামলাল ভাইয়ের কায়দা সেদিন বুঝতে পারেনি। আজ বোঝে। তাজ্জব কী বাত, সেদিন রাতে সত্যি সত্যিই ও আড়াইশো টাকা পেয়ে গিয়েছিল। নকশালদের আমল সেই সময়। রোজ খুনোখুনি হচ্ছে কলকাতায়। রাত একটার সময় পকেটে সেই টাকা নিয়ে পাঁচু একটু ভয়ে ভয়েই বি টি রোড দিয়ে ফিরেছিল টায়ারের দোকানে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক লাফে ও অনেকটা বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিল।

খাটিয়ায় বসে বি টি রোডের দিকে একবার তাকাল পাঁচু। সি আই টি স্কুলে এখনও ছুটি হয়নি। বাড়ির ছায়াগুলো রাস্তায় এসে পড়েছে। আর আধ ঘণ্টা পর থেকে, মরার সময় নেই পেনসিলারদের। আসল কারবারটা ওই সময়ই। এত খাটাখাটনি, অথচ লাভের গুড় খেয়ে যাবে গোখনা। নয় ভাগ টাকার এক ভাগ পাবে পান্টার। বাকি প্রায় সবটাই যাবে গোখনার গর্ভে। আর সেই পয়সায় ও স্ফূর্তি করবে, মাগীবাজিতে ঢালবে। ....দূর, ঘেন্না ধরে গেল নিজের উপর। উপায় নেই, অন্য কিছু করার যে উপায় নেই ! না হলে গোখনার মুখে লাথি মেরে ও চলে যেত অন্য কোনও

জীবিকায়।

এই অঞ্চলে সাট্টার কারবার হাত-বদল হওয়ার কোনও উপায় নেই এখন। পার্টির সঙ্গে গোখনার যা খাতির, তাতে ওর পড়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না পাঁচু। সেই সঙ্গে পুলিশও হাতের মুঠোয়। গোখনাকে আটকাবে কে? এক সময় নকশাল করত ও। বহুদিন জেলেও ছিল। তখন দমদম-ঘুঘুডাঙা অঞ্চল কাঁপত বুলগানিনের নামে।

ওয়াগন ব্রেকিং থেকে শুরু করে, নেত্র আর লীলা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করা—সবই করত ওর ছেলেরা। জেল থেকে গোখনা বেরিয়ে আসার পর বুলগানিন একদিন মার্ডার হয়ে যায়। গোখনা ওর সাম্রাজ্য কেড়ে নেয়। এখন পার্টির দাদাদের স্নেহচ্ছায়ায় গোখনা এলাকা বাড়িয়ে নিয়েছে। ও আর এখন অ্যাকশানে যায় না। টেলিফোনে টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে দেয়। রতা, কালুয়া, কাটা বাবলা, হিংলে, কাজল—সব এরা সব ওর লোক। একেকজন একেকটা এরিয়া দেখে। তবে এদের কারও হিম্মত নেই গোখনাকে সরিয়ে গদিতে বসার।

শুয়ে শুয়েই কেলে পাঁচু ভাবতে লাগল, গত ইলেকশনের পর থেকে গোখনাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কেউ দেখায়নি। ওর লোকেদের গায়ে আঁচড়ও তাই পড়েনি। অন্য পার্টির লোকেরা গোখনাকে জুজুর মতো দেখে। একটাই মাত্র ঘটনা ঘটেছে সেদিন, ঘুঘুডাঙায় পার্কের মাঠের কাছে। ওখানকারই একটা ছেলে রতাকে নাকি বেদম পিটিয়েছে। ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। ছেলেটার খোঁজ খবর করলে কেমন হয়, ভাবল পাঁচু। বিল্লাটাকে বলতে হবে। কে জানে, এই ছেলেটাই হয়তো কালে কালে এ লাইনে নাম করে ফেলবে। গোখনার হাত থেকে বাঁচবার জন্য একবার গিয়ে কথা বলবে নাকি? কেলে পাঁচু মনস্থির করতে পারল না।

খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ল কেলে পাঁচু। আর আলিস্যি করার সময় নেই। রামলখনের ধাবা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ও ফিরে এল কাঠের গুমটিতে। আশপাশে আল-ফাল লোকের গজল্লা বেশি। ও এসব পছন্দ করে না, বিরক্ত হয়। কিন্তু কিছু বলার নেই। গোখনা-হারামির লোকও থাকতে পারে। গুমটির সামনে সামান্য গণ্ডগোল মানে পুলিশের দৃষ্টি পড়া। কিছু দিন ধরে লালবাজারের অ্যান্টি রাউডির লোক আনাগোনা করছে এ অঞ্চলে। এক ঠেকের খবর অন্য ঠেকে পৌঁছে যায় লোক মারফত।

....সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কলাবাগান আর ভূতনাথের রেজাল্ট বেরিয়ে যেতেই কেলে পাঁচু ঝটপট পেমেন্ট দিয়ে দিল পান্টারদের। ফিগার মিলিয়েছে সতেরো জন। বেশির ভাগই চার আনা আট আনা খেলেছিল। স্লিপ মিলিয়ে চার আনার জন্য দু' টাকা চার আনা নিয়ে গেল ওরা। যে পান্টার যত পয়সা বাজি ধরবে, পাবে তার ঠিক নয়গুণ।

ভিড় কিছুটা পাতলা হয়ে গেল রাত আটটা-সোয়া আটটার মধ্যে। এখন বাকি বোম্বের খেলা, ওপেন আর ক্লোজ। তার ফল জানার জন্য আবার লোক জড়ো হবে রাত ন'টা থেকে। গুমটি থেকে বেরিয়ে এল শেখ পাঁচু। সব মিলিয়ে আজ লোডিং হয়েছে প্রায় চার হাজার টাকার মতো। বিকালের দিকে গাড়ি থামিয়ে, এক কালোয়ারই নাকি খেলে গেছে পাঁচশো টাকার বাজি। বিল্লা ব্যাটা কোথায় গেল কে জানে? এই সময়টায় ও হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। শরীরটাকে পিছন দিকে ঠেলে আড় ভাঙতে

লাগল পাঁচু। আজ পেমেন্ট দিতে হয়েছে প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর টাকা। নিয়ম হচ্ছে পেনসিলাররাই দিয়ে দেয় টাকা। তারপর নিজের কমিশন কেটে রেখে, বোর্ডের বাকি টাকাটা দিয়ে আসে বুকির ঘরে।

আড় ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কেলে পাঁচু ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দুপুরের সেই ছেলেটা! বেশ লম্বা, পেটানো চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করে নিল, নম্র ব্যবহার করতে হবে। দশ টাকা লোড করে গেছে, নম্বর মেলেনি। শুনে খচেও যেতে পারে। হাসিমুখেই ও বলল, 'আসুন স্যার। এত দেরিতে? স্লিপটা একটু দেখাবেন?"

ছেলেটা পকেট থেকে বের করে দিল স্লিপটা। কুপির আলোয় সেটা ধরে, নাম্বার মেলাবার ভঙ্গি করে পাঁচু একবার গুমটির গায়ে লাগানো ছোট্ট বোর্ডের দিকে তাকাল। খেলার খবর এলেই রেজাল্টটা ও লিখে দেয় ছোট্ট ওই বোর্ডে। লোকে নাম্বার মিলিয়ে নেয়। আপশোসের ভঙ্গিতে ছেলেটাকে ও বলল, "না স্যার, ব্যাডলাক। মেলেনি।"

—মেলেনি? কোন নাম্বারটা উঠেছে।

—নৌকো স্যার...মানে, নয়।

একবার অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ছেলেটা। তারপর বলল, তোদের খেলাটা কোথায় হয়, বল তো বাপ।"

জিজ্ঞাসার ধরনে বিপদের গন্ধ পেল কেলে পাঁচু। অন্য কেউ হলে তেরিয়া মেজাজে উত্তর দিত। কিন্তু এই ছেলেটা...ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়। ওর চওড়া কবজিটা যদি একবার চালায়, হাতুড়ির মতো নেমে আসবে। পাঁচু গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল, "সে তো জানি না স্যার। আমাদের কাছে শুধু খবরটা আসে।"

—হুঁ। বলে কী যেন ভাবল ছেলেটা। তারপর বলল, "কলাবাগান না হয় বুঝলাম, মার্কাস স্কোয়ারের দিকে। ভূতনাথটা কোথায় বাপ?"

—শুনেছি, নিমতলা শ্মশানের দিকে।

—হুঁ, ওখানে ভূতনাথের একটা মন্দির আছে বটে। ঠিক হ্যায়, আবার দেখা হবে রে। তার আগে একটু খোঁজখবর নিতে হবে।

আর কোনও কথা না বলে, ছেলেটা হাঁটতে শুরু করল বি টি রোডের দিকে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল পাঁচুর। উফ্, এই ছেলে, বড় কঠিন ছেলে। ভাবতে ভাবতেই ও ফের গিয়ে বসল গুমটিতে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গুমটির সামনে হাজির হল কালা। জিজ্ঞাসা করল, "এই যে একটা ছেলে এখুনি চলে গেল, কী জন্য তোমার কাছে এসেছিল গো পাঁচুদা?"

কালোয়ার পট্টির উঠতি মাস্তান, এই কালা। ওকে না ঘাটাবার জন্যই নির্লিপ্তভাবে পাঁচু উত্তর দিল, "লোকে আমার কাছে কী জন্য আসে জানিস না?"

—আই বাপ, এই তো সেই ছেলেটা..রতাকে মেরে সেদিন যে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

চমকে উঠে পাঁচু একবার তাকাল বি টি রোডের দিকে। দেখল লম্বা একটা দেহ ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে, সিঁথির মোড়ের দিকে।

পাত্তি টু পাত্তি

সি আই টি স্টপে বাস থেকে নেমেই একবার বাঁ দিকের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শুভ্র। আজ আর বাইক নিয়ে মাঠে যায়নি। পিসিমণিকে আনার জন্য ভোলাদা গাড়ি নিয়ে ফলতায় যাচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি মাঠে ওকে নামিয়ে দিয়ে যায়। সাধারণত গাড়ি নিয়ে মাঠে যেতে চায় না শুভ্র। কলেজে পড়ার সময় দিন কয়েক গাড়ি নিয়ে প্র্যাকটিসে গিয়েছিল। অন্য ছেলেরা একটু দূরে দূরে থাকত, টিপ্পনি কাটত। বাইক নিয়ে গেলে অবশ্য অস্বস্তিতে পড়তে হয় না। অন্যরা ট্রেনে বা বাসে ঘামতে ঘামতে মাঠে আসে। খেলতে নামার আগেই ওদের শরীর থেকে প্রচুর ফ্লুইড বেরিয়ে যায়। ফের সেই ফ্লুইড নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ওরা জানে না। শুভ্র একবার বলতে গিয়েছিল। ওরা হাসাহাসি করায় থেমে যায়।

মন্দিরের দেয়ালে মাথা ঠেকাল শুভ্র। রোজ একবার করে মা কালীকে প্রণাম করে মাঠে যাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফেরার সময়ও একবার করে দাঁড়ায় মন্দিরের সামনে। এখানকার পুরোহিত শুভ্রর চেনা। মন্দিরে থাকলে তিনি প্রসাদি ফুল, সিঁদূরের টিপ ছুঁইয়ে দেন। মঙ্গলবার আর শনিবার সন্ধ্যায় খুব ধুমধাম করে পুজো হয় এখানে। কাসর-ঘণ্টার শব্দ শুনে হঠাৎ শুভ্রর মনে হল, আজ তো শনিবার। পাড়ায় নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের ফাংশান আছে। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু। ফাংশানের কথা মনে হতেই, শুভ্র একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ আগে ওর বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। নীরেনদা বারবার বলে দিয়েছিলেন, ঠিক সময়ে ফাংশানে হাজির হতে। বিদ্যাসাগর ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচ আছে শুনেও বলেছিলেন, "তোরা যদি ঠিক সময়ে না আসিস, তা হলে আমার ফাংশান করে লাভটা কী?"

নীরেনদা... নীরেন বসু এই অঞ্চলের কাউন্সিলার। শুভ্রদের বাড়ির কাছেই থাকেন। পড়ান মেদিনীপুরের কোন এক কলেজে। পাড়ায় নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন উনি। গান-বাজনা-আঁকা সব কিছু ওখানে শেখানো হয়। কিছু নামী শিল্পী আছেন, সপ্তাহে একদিন করে এসে ছোটদের শেখান। শনি-রবি আর ছুটির দিনগুলোতে— ছেলে মেয়েদের ভিড়ে গিজগিজ করে নবজাতকের বাড়িটা। শুভ্র নিজেও এক সময় আঁকা শিখত ওখানে। একটু বড় হতেই আঁকা-টাকা ছেড়ে ফুটবলে মন দেয়। বছরে একবার করে, নীরেনদা দু'দিন ধরে ফাংশান করেন নবজাতকের। পাড়ার ছেলে-মেয়েরাই নাচ-গান করে। তবে বড় আকর্ষণ নাটক। বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, রানা এখনও নাটকে অভিনয় করে। ফাংশানের সময় রানা বেশ সময় দেয় নবজাতকে। নাটকের রিহার্সাল দেওয়া, প্রোগ্রাম তৈরি করা থেকে স্টেজ নিয়ে মাথা ঘামানো— সব ব্যাপারে ও থাকে নীরেনদার সঙ্গে। ফাংশানের দশ-বারো দিন আগে থেকে রানার দেখা পাওয়া মুসকিল হয়ে যায়।

নবজাতককে অবশ্য দু'চোখে দেখতে পারে না সন্তু। বলে প্রেমজাতক। ছোটবেলায় শুভ্রর দেখাদেখি ও ভর্তি হতে চেয়েছিল একবার নবজাতকের আঁকার ক্লাসে। সেই সময় নবজাতকের সেক্রেটারি ছিলেন মহীতোষদা। সন্তুর কথাবার্তাতেই

হোক, অথবা পোশাক আশাক দেখে, তেমন সন্তুষ্ট হননি মহীতোষদা। ওকে তখন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাগ সম্ভর এখনও যায়নি। ফাংশানের কথা উঠলেই ও বরাবর নির্লিপ্ত থাকে। বলে, "প্রেমজাতকের অনুষ্ঠান নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।"

শুভ্র প্রথম দিকে একবার রেগেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই, তুই এত ভাল একটা অর্গানাইজেশনকে ভ্যাঙাস কেন রে?"

—কেন, নামটা খারাপ দিয়েছি? তোদের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অনেকেরই তো প্রেম করেই বিয়ে।

মুখে নবজাতকের বিরুদ্ধে কথা বললেও ফাংশানের দিন সম্ভ কোনওবার গরহাজির থাকে না। স্টেজের ধারে-কাছে থাকে না। দাঁড়ায় একেবারে পিছনের দিকে। সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায়, আড্ডায় নীরেনদার ষষ্ঠিপুজো করে। রানাকে চটিয়ে দেয়।

ফাংশানের কথা মনে হতেই, শুভ্র পা চালিয়ে রাস্তা পেরোল। মন্দিরের উল্টো ফুটে রিক্সা স্টান্ড। দূর থেকে দেখতে পেল স্টান্ডে একটিই মাত্র রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সেটি হারানদার। শুভ্র যেদিন বাইক নিয়ে মাঠে যায় না, সেদিন সন্ধ্যার দিকে অন্য সওয়ারি ফেলে হারানদা দাঁড়িয়ে থাকে রিক্সা স্টান্ডে। শুভ্র যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ অপেক্ষা করে। অনেকদিন বকাবকি করা সত্ত্বেও হারানদাকে টলানো যায়নি। আজ অবশ্য বকাঝকার কোনও কারণ নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য ওর রিক্সা দরকার।

রিক্সার কাছে এসে দাঁড়াতেই শুভ্র দেখল, সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়ে কথা বলছে হারানদার সঙ্গে। বোধহয় কোথাও নিয়ে যেতে বলছে।

—না, দিদিমণি, তোমারে নে যেতি পারব না।

মেয়েটা বলল, "চলো না হারানদা। আমার তাড়াতাড়ি আছে।"

—না, দিদিমণি। দাদাবাবু এখুনি ফিরবে। তেনার জন্য বসে আছি। বলতে বলতেই শুভ্রকে দেখে ফেলল হারানদা। বলল, "এত দেরি করলে কেন আজ দাদাবাবু। ফলতা থেকি পিসিমণি কখখন এসি গেছে। তোমার জন্য ঘর-বার করছে।"

মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল শুভ্র। আর তাকাতেই ওর বুকের কাছটায় হঠাৎ ধক করে উঠল। এই তো সেই মেয়েটা! যার সম্পর্কে জানার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে একটা তীব্র কৌতূহল ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই শুভ্র কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেল।

রিক্সা স্টান্ড থেকে ঘুঘুডাঙা—ওদের পাড়ায় যেতে হলে, একটা কালোয়ার পট্টি পেরোতে হয়। ওই রাস্তায় বেশিরভাগ দিনই আলো থাকে না। এই সন্ধ্যায় একটা মেয়েকে একা হেঁটে যেতে দেওয়া উচিতও নয়। শুভ্র ঠিক করে নিল, ও নিজে হেঁটে যাবে। নিছক ভদ্রতা করেই ও জানতে চাইল, "আপনি কি নিরালা বাড়িতে যাবেন?"

মেয়েটা সরাসরি উত্তর দিল না, শুভ্রর দিকে তাকালও না। হারানদাকে লক্ষ্য করে বলল, "নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে যাব। শ্যামলী দিদিমণিদের বাড়ি।"

গলার স্বরটা রিনরিনে, শুভ্রর খুব ভাল লাগল। মনে মনে একটু আহত হলেও ও

আবার তাকাল মেয়েটার দিকে। টিকোলো নাকে ঘাম চকচক করছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে, শুভ্র ভাবল এই মেয়েটার জন্য বাড়ি অবধি কেন, হাঁটতে হাঁটতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে ও চলে যেতে পারে। একটু ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতেই হারানদাকে ও বলল, "কী হচ্ছেটা কী ; এনাকে পৌঁছে দাও। আমি হেঁটে যাচ্ছি। রাস্তায় অনেক রিক্সা পেয়ে যাব।"

বলেই আর অপেক্ষা করল না শুভ্র। হাঁটতে শুরু করল। পাশ দিয়ে রিক্সাটা চলে যাচ্ছে। সে দিকে আর তাকালও না। যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছে। শুভ্র একবার ভাবল, মেয়েটাকে ওই প্রশ্নটা করা কি বোকামি হয়েছিল ? এখন লজ্জা লাগছে। ও কোনও উত্তরই দিল না। খুব অহংকারী ? হতে পারে। পরক্ষণেই শুভ্রর মনে হল, উত্তর না দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক। একটা অচেনা, অজানা ছেলেকে ও বলতেই বা যাবে কেন, কোথায় যাবে ?

মেয়েটাকে প্রথম কোথায় ও দেখেছে, শুভ্র তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে করতে পারে। দোলের পরদিন নবজাতক লাইব্রেরিতে গিয়েছিল বই পাল্টাতে। হ্যারল্ড রবিন্সের 'এ স্টোন ফর ড্যানি ফিশার' বইটা খুঁজছিল র‍্যাকের মধ্যে। বইটার কথা বলেছিল স্বাতী। বই খোঁজার ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎই, উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের দিকে চোখ পড়েছিল। পাড়ায় আগে কখনও দেখেনি। পাড়ার মেয়ে বলে মনেও হয়নি শুভ্রর। উজ্জ্বল লাল রঙের টি-শার্ট, পরনে নীল জিনসের প্যান্ট। এ পাড়ার মেয়েরা এখনও এতটা মড্ হয়নি। আগের দিন বোধহয় রঙ খেলেছিল। ফর্সা মুখে তাই লাল রঙের আভা। মেয়েটা শ্যাম্পু করেছিল। চুল ফোঁপানো, কিন্তু পিছন দিকে বাঁধা। অসাধারণ লাগছিল দেখে। একটা বই খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছিল মেয়েটা। লাইব্রেরিতে ঢুকলে বেশিক্ষণ সময় নেয় না শুভ্র বই বাছতে। আগে থেকে ঠিক করে যায়। কিন্তু সেদিন বেরোতেই ইচ্ছে করছিল না। যতক্ষণ মেয়েটা লাইব্রেরিতে ছিল, ততক্ষণ থেকে গিয়েছিল শুভ্র।

পরে রাস্তায় বহুদিন দেখেছে এই মেয়েটাকে। এ অঞ্চলে প্রচুর নতুন বাড়ি হয়ে গিয়েছে। সবাইকে চিনতেও পারে না আজকাল শুভ্র। রানা অবশ্য প্রায় সবাইকে চেনে। মেয়েটার কথা ওকে জিজ্ঞাসা করব, ভেবেও শুভ্র বেশ কয়েকবার পিছিয়ে গিয়েছে। রানার পেটে কোনও কথা থাকে না। কালোয়ার পট্টির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুভ্র হালকা বোধ করল। মেয়েটা তা হলে, শ্যামলীদের বাড়িতে থাকে। নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে নতুন এসেছে। কিন্তু মেয়েটা হারানদাকে চিনল কী করে ?

হেঁটে আসার জন্যই ঘামে ভিজে গিয়েছিল শার্টটা। বাড়িতে ঢুকেই পিসিমণিকে ও বলল, "চট করে আমি স্নান সেরে নিচ্ছি। ফাংশানে যাওয়ার জন্য তুমি তৈরি হয়ে নাও ততক্ষণ।"

ফিরতে কেন দেরি হল, এ প্রশ্নটা করার সুযোগই দিল না শুভ্র পিসিমণিকে। বাড়ি ফেরার পর রোজ পিসিমণি দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেন, ম্যাচে আজ কী হল রে। সেটার জবাব দেবে না বলেই, শুভ্র তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেল। পিসিমণিকে ও সারপ্রাইজ দিতে চায়। বিদ্যাসাগর ট্রফির সেমিফাইনালে ও আজ হ্যাটট্রিক করেছে। আর্য চৌধুরীকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। ওকে বোকা বানানোর শাস্তি। মাঠে অনেক ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টার ছিল আজ। নিশ্চয়ই কাগজে কাল বড় করে

খবরটা বেরোবে। কাল সকালে পিসিমণি অবাক হয়ে যাবেন কাগজটা দেখে।

শার্ট খুলে ফেলে পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল শুভ্র। চান করার আগে গায়ের ঘাম শুকিয়ে নেওয়া দরকার। সোফার ওপর বসে ও পা তুলে দিল সেন্টার টেবলে। মেয়েটার কথা আবার মনে পড়ল ওর। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে ওকে এমনভাবে ভাবায়নি। স্বাতীর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে, তবে সম্পর্কটা তার বেশি এগোয়নি। কলেজে ওরা একসঙ্গে পড়ত। চার-পাঁচবার স্বাতীদের বাড়িতেও গিয়েছিল শুভ্র। মতিলাল বাড়ির মেয়ে। অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে স্বাতীও দু'একবার এ বাড়িতে এসেছে। ওকে খুব ক্যারিয়ারিস্ট মনে হয় শুভ্রর। খুব বেশি ধরনের বাস্তববাদী। কলেজ ছাড়ার পর স্বাতী কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন মাঝে মধ্যে ফোন করে। ওকে দেখার পর, হাসতে হাসতে পিসিমণি একবার বলেছিল, "এই মেয়ে স্বামীর বিজনেজ পার্টনার হতে পারে, কোনও দিন রান্না করে খাওয়াবে না।"

পিসিমণি কী ভেবে বলেছিল, কে জানে। স্বাতীকে নিয়ে কখনও কিছু ভাবেনি শুভ্র। একদিন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে হাঁটতে দেখেছিল সন্তু। পরে খুব খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। শুনে শুধু বলেছিল, "সম্পর্কটা আর বাড়াস না। এ সব মেয়ে খুব হিসেবি। তোর পক্ষে ভাল না।"

সোফা থেকে উঠে শুভ্র বাথরুমের দিকে এগোল। স্নান করতে ও বেশি সময় নেয় না। মনা ফ্যান্সি মার্কেট থেকে একটা টেলিফোন শাওয়ার এনে দিয়েছে, বৃষ্টির মতো জল বেরোয়। শুভ্রর খুব সুবিধা হয়েছে। চট করে স্নান সারা হয়ে যায়। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল শুভ্রর, মাথার ওপর শাওয়ারটা ধরে। জলে ভিজতে ভিজতেই চোখ বন্ধ করে ও ভাবতে লাগল, নীল রঙের সমুদ্রে ও সাঁতার কাটছে। দূরে একটা লাল রঙের জাহাজ। ডেকে দাঁড়িয়ে নিরালা বাড়ির ওই মেয়েটা। শ্যাম্পু করা ওর চুল হাওয়ায় উড়ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা একবার হেসে উঠল। সাঁতার কাটতে কাটতেই শুভ্র যাওয়ার চেষ্টা করল জাহাজের দিকে।

মাথার ওপর থেকে শাওয়ার সরিয়ে এনে শুভ্র নিজের ওপরই হঠাৎ একটু বিরক্ত হল। রিক্সা স্টান্ডে দেখা হওয়ার পর থেকে ও শুধু ওই মেয়েটার কথাই ভাবছে। কী বিশ্রী সব চিন্তা। আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতো, এ সব ফালতু চিন্তা না করাই ভাল। এক ধাক্কায় মন থেকে ও মেয়েটাকে সরিয়ে দিল। কাল বিকালের দিকে মেদিনীপুর যেতে হবে। পরশুদিন অরবিন্দ স্টেডিয়ামে বিদ্যাসাগর ট্রফির ফাইনাল বর্ধমান ইউনিভার্সিটি টিমের সঙ্গে। ট্রফিটা এ বার জিততেই হবে। ইউনিভার্সিটির হয়ে আর কখনও খেলার সুযোগ পাবে না শুভ্র। ফাইনাল ম্যাচটাই শেষ ম্যাচ।

স্নান শেষ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে শুভ্র দেখল, সিল্কের পাঞ্জাবি আর চোস্ত নিয়ে পিসিমণি দাঁড়িয়ে আছেন। মাথা মুছতে মুছতে ও জিজ্ঞাসা করল, "এ গুলো কি আমাকে পরতে হবে?"

পিসিমণি বললেন, "তুই যদি না পরিস, তা হলে আমাকেই পরতে হবে। নীরেনবাবু দু'বার লোক পাঠিয়েছেন। তুই না গেলে ফাংশান নাকি শুরু করতে পারছেন না।"

সিল্কের পাঞ্জাবি আর চোস্ত পরার অভ্যেস শুভ্রর নেই। বছরে দু'তিনটে দিন তবু

পরতে হয় পিসিমণির জন্য। পয়লা বৈশাখ, দশমী আর এই ফাংশানের দিন। রানা খুব শৌখিন ছেলে। গরমের দিনে সর্বদাই আদ্দির পাঞ্জাবি ওর গায়ে। ওর দেখাদেখি দিব্যও প্রায় নিয়মিত পরে। সন্তুর এ সব বিলাসিতা কম। যাদের গায়ে পাঞ্জাবি ঘামে লেপ্টে থাকে, তাদের ও পছন্দ করে না। পিসিমার হাতে সিল্কের পাঞ্জাবিটা দেখে ও দুষ্টুমি করে বলল, "তুমি পরো না পিসিমণি। দারুণ লাগবে। স্বাতীর মাকে আমি পরতে দেখেছি। শুধু একটু গোঁফ এঁকে নাও, তা হলে তোমাকেই লোকে শুভ্রনীল চ্যাটার্জি মনে করবে।"

পিসিমণি বললেন, "তা হলে তুই আমার শাড়িটা পরে নে। গোঁফটা কামিয়ে ফেল। লোকে তোকে পিসিমণি ভাববে।"

মুখ ব্যাজারের ভঙ্গি করে শুভ্র পাঞ্জাবি আর চোস্ত হাতে নিল পিসিমণির হাত থেকে। পরে কিন্তু দেখল, বেশ আরাম লাগছে। কয়েকদিন ধরে বেশ গরম পড়েছে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে, তবু গরম কমেনি।

আয়নায় নিজেকে দেখছিল শুভ্র। পিছন থেকে পিসিমণি বললেন, "বাঃ, এই তো তোকে... ওই মডেল... কী নাম যেন, হ্যাঁ করণ কাপুর... তার থেকেও ভাল লাগছে।"

শুনে ফ্যাশন প্যারেডে মডেলের মতো হেঁটে এল শুভ্র পিসিমণির কাছে। তারপর আবার ফিরে গেল আয়নার সামনে। হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, "দূর, মিউজিক না দিলে কি মডেলিং করে সুখ আছে?"

ওর হাঁটা দেখে পিসিমণি হাসছিলেন। বললেন, "দাঁড়া, মনার মাকে ডাকছি, হারমোনিয়াম বাজাবে।"

শুভ্র আঁতকে উঠল, "দোহাই পিসিমণি, বাপ্পী লাহিড়ির ভাত মারার চেষ্টা করো না।"

...পিসিমণিকে নিয়ে নীচে নামতেই শুভ্র দেখল, গাড়ি বারান্দায় হারানদা রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে প্যান্ডেল মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। হারানদা তাও হাঁটতে দেবে না। রিক্সায় চড়ব নাও, বলা যাবে না। তাই ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে, পিসিমণিকে নিয়ে শুভ্র রিক্সায় উঠে বসল। রাস্তায় অন্যদিন এত্ত লোক থাকে না এ সময়। আজ সবাই নবজাতকের ফাংশান দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। হারানদা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ কার দিকে নজর পড়তে পিসিমণি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হারান... দাঁড়া, দাঁড়া তো।"

পিছন ফিরে পিসিমণি বললেন, "আরে লাবু না? এই শুভু, ওই যে নীল জামদানি পরে আসছে... গিয়ে জিজ্ঞেস কর তো?"

শুভ্র ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। বয়স পিসিমণির মতোই। গোলগাল চেহারা, অসম্ভব ফর্সা, চোখে রিমলেস চশমা। মুখ চোখে আভিজাত্যের ছাপ। ও বলল, "কে তোমার লাবু। তুমি কি আমাকে মার খাওয়াবে?"

—আরে, যা না। পিসিমণি বেশ বিরক্ত।

যাওয়ার দরকার হল না শুভ্রর। ভদ্রমহিলা কাছে আসতেই পিসিমণি নেমে পড়লেন রিক্সা থেকে, "লাবু, তুই এখানে?"

ভদ্রমহিলার চোখে অপার বিস্ময়। বললেন, "এখানে তো আমি ফ্ল্যাট কিনেছি রে। ওই যে নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে। আসার পর থেকে কত লোককে জিজ্ঞাসা

করলাম তোর কথা... কেউ বলতেই পারে না তরুলতা মুখার্জি কে ?"

—তোরা কবে এসেছিস ? পিসিমণি আবেগে হাত ধরে ফেললেন ভদ্রমহিলার। এত খুশি হতে শুভ্র ইদানীং আর কখনও দেখেনি পিসিমণিকে।

—মাস ছয়েক। উফ্, তরু ক'দ্দিন পর তোর সঙ্গে দেখা বল তো ? বছর পনেরো... তা তো হবেই।

—তোর মেয়ে কই ? কত বড় হয়েছে রে ? কী মিষ্টিই না দেখতে ছিল ছোটবেলায়।

—প্যান্ডেলে গেছে। এ বার পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করেছে। অস্বস্তি নিয়ে রিক্সায় বসেছিল শুভ্র। আজ পর্যন্ত কাউকে তুই-তোকারি করতে দেখেনি পিসিমণিকে। বড়রা তুই-তোকারি করলে কী রকম যেন অদ্ভুত লাগে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই পিসিমণির বান্ধবী। দিল্লিতে একজন থাকতেন, তার কথা আগে শুভ্র খুব শুনত পিসিমণির মুখে। রিক্সা থেকে নেমে ও বলল, "তোমরা রিক্সায় এগোও পিসিমণি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

—আঃ দাঁড়া না। লাবু, এই আমার শুভু। ভীষণ ছটফটে।

—ও মা, কত বড় হয়ে গেছে। একদিন এসো না বাবা আমাদের বাড়িতে।

শুভ্র ঘাড় নাড়ল। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আপনিও আসবেন আমাদের বাড়িতে।"

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুভ্র দেখল প্রায় পৌনে আটটা বাজে। নীরেনদা মারাত্মক চটে থাকবেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট। রাস্তায় দাঁড়িয়েই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পিসিমণি এমন গল্পে ডুবে গেছে, প্যান্ডেলে পৌঁছতেই রাত দশটা বেজে যাবে। ও ফের অনুরোধ করল, "পিসিমণি প্লিজ, চলো। প্যান্ডেলে বসে না হয় গল্প কোরো।"

...প্যান্ডেলে এসে শুভ্র দেখল, লোক গিজগিজ করছে। ওকে দেখতে পেয়ে কোত্থেকে দৌড়ে এল রানা। ব্যস্ততার সঙ্গে ও বলল, "এত দেরি করলি কেন শুভ্র। তুই গ্রিনরুমে চলে যা। পিসিমণিদের জন্য ফ্রন্ট রোতে আমি চেয়ার রেখে দিয়েছি।"

—দিব্য আর সন্তু আসেনি ?

—দিব্য গ্রিন রুমে। সন্তুকে দেখিনি।

পিসিমণিদের নিয়ে রানা চলে গেল প্যান্ডেলের সামনের দিকে। শুভ্র এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল সন্তুকে। খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সন্তুটা। পকেটে এখন রিভলভার নিয়ে ঘুরছে! সেদিন বাড়িতে খেতে খেতে শুভ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, ওর পকেটে রিভলভার কেন ? ও বলেছিল, আত্মরক্ষার্থে। এটা একটা উত্তর হল ! এ সব জিনিস নিয়ে ঘোরে তো অ্যান্টি সোসালরা।

গ্রিনরুমের দিকে না গিয়ে শুভ্র প্যান্ডেলের পিছন দিকে গেল সন্তুকে খোঁজার জন্য। প্যান্ডেলের ভেতর বেশ গরম। এ সময়টায় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। শুভ্র বাইরে বেরিয়ে এল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, দু'চার টুকরো মেঘ রয়েছে। মনে মনে ও প্রার্থনা করল, আজ যেন বৃষ্টি না হয়।

ফাংশানের এ দুটো দিন পার্কের সামনে বসে না জহরলাল। ঝালমুড়ি বিক্রি করে প্যান্ডেলের কাছে। ছোট বেলা থেকেই শুভ্র এটা দেখে আসছে। সন্তু জহরলালের ওখানেও থাকতে পারে। এই ভেবে ও জহরলালকে খুঁজতে লাগল। প্যান্ডেলের

বাইরে ফুচকা, ভেলপুরি আর কুলফি বরফওয়ালাদের ঘিরে ছোট ছোট ভিড়। ও দিকে চোখ বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত লালার মুদির দোকানের পাশে জহরলালকে দেখতে পেল শুভ্র। সন্তুর খবর ওর কাছে পাওয়া যেতে পারে। জহরলাল হল, সন্তুর কথায় ঘুঘুডাঙা সংবাদের সম্পাদক। পাড়ার সবার লেটেস্ট খবর রাখে। ঝালমুড়ি মাখার সময় ওর হাত চলে খুব দ্রুত। কিন্তু চোখ থাকে সব দিকে। পাড়ায় কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে, কোন ছেলে লুকিয়ে ড্রাগ নেয়, বেপাড়ার কোন ছেলে কেন আসে— সব খবর জহরলালের নখদর্পণে।

কাছে গিয়ে শুভ্র দেখল, সন্তু নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওর একবার মনে হল, সন্তু বোধহয় এ বার আসবে না। গত বছর ফাংশানের সময় ওর জন্য বিশ্রী মারপিট হয়েছিল সেভেন ট্যাংকস লেনের ছেলেদের সঙ্গে। ওদের কেউ একজন টিটকিরি মেরেছিল পাড়ার কোনও এক মেয়েকে। সন্তুকে বোধহয় দেখেনি। ও এমনই রগচটা, প্রথমেই হাত চালিয়ে দেয়। দু'পাড়ার মারামারিতে শেষ পর্যন্ত ফাংশান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম। নীরেনদা খুব রেগে গিয়ে ছিলেন সন্তুর ওপর। উনি না থামালে সেদিন খুব মুসকিল হত।

জহরলাল একবার মুচকি হাসল শুভ্রকে দেখে। তারপর ইশারা করল ডানদিকে। সেদিকে তাকিয়ে শুভ্র দেখল, রতা! মাথায় ব্যান্ডেজ, ডান হাতে প্লাস্টার। একটা মেয়ের সঙ্গে মস্করা করছে। মেয়েটাকে শুভ্র চেনে। পালের বাগানের বস্তিতে একটা রিক্সাওয়ালা থাকে, তার বউ। লোকের বাড়িতে কাজ করে। শুভ্রদের বাড়িতেও একবার মাসখানেক কাজ করেছিল। কিন্তু পিসিমণি ওর হাত-টান দেখে আর রাখেনি। মেয়েটার সঙ্গে রতার সম্পর্ক সবাই জানে। পার্কের মাঠে, অন্ধকারে বসে মাঝেমাঝে খুব খারাপ কাজ করে। চোখে পড়লেও কেউ কিছু বলার সাহস পায় না রতার ভয়ে।

মেয়েটার দিকে আড়চোখে একবার তাকাল শুভ্র। পরনে ছাপা শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ, হাতে বড় একটা মাদুলি। রতার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলছে, "হনুমানের মতো লাগছে মাইরি তোমাকে। সেদিন মার খেয়ে এখন আবার পোদ্দারি মারতে এয়েছে।"

রতা গরম হয়ে বলল, "শোন, শূয়ারের বাচ্চাটাকে যেদিন পাব, একেবারে ফালাফালা করে দেব।"

মেয়েটা বলল, "তুমি সব করবে।"

—দেখিস। বলতে বলতেই শুভ্রকে দেখে ফেলল রতা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেপে গেল। তারপর মেয়েটাকে বলল, "শালা হারামিটা বরানগরে রয়েছে। সব খবরই পাচ্ছি। বি টি রোডের এ পারে তো আসতেই হবে, তখন কে ঠেকাবে?"

জহরলাল এই সময় বলল, "এখানে গালাগালি কোরো না বাপু। ভদ্দরলোকের পাড়া। তোমাকে দেখে খদ্দের আসবে না।"

—চুপ, এক লাথি মেরে তোর সব উল্টে দেব।

—কী হচ্ছে রতাবাবু। বলতে বলতে জহরলাল এবার উঠে দাঁড়াল, "মাস্তানি করতে হলে, মাস্তানের সঙ্গে করো। আমার এখানে কেন?"

মেয়েটা ততক্ষণে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর রতাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই বলে উঠল, "আবার ঝামেলা করচ। তুমি কথা দিয়েচ না, ঝুট ঝঞ্ঝাটে যাবে না। রতার হাত ধরে মেয়েটা টানতে শুরু করল, "তোমার জন্য আমাকে বিষ খেতে হবে ? চলো।" প্রায় ধাক্কা মারতে মারতেই মেয়েটা রতাকে সরিয়ে নিয়ে গেল পার্কের মাঠের দিকে। শুভ্র শুনতে পেল, রতা বলছে, "ভেবেছিলাম, ফাংশানে আজ আসবে। ঠিক আছে... কদ্দিন পালিয়ে বাঁচবে।" কথাগুলো সন্তুকে উদ্দেশ করেই বলল।

ঝালমুড়ি মাখার ফাঁকে জহরলাল হাসছে তড়পানি শুনে। শুভ্রর দিকে তাকিয়ে ও বলল, "জোর মার খেয়েছে সেদিন সন্তুবাবুর হাতে। শালা, এবার সন্তুবাবুকে দেখলেই পালাবে। তবু রোয়াবিটা দেখুন। শালার যত জুলুম আমার কাছে এসে।"

শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, "তোমার উপর জুলুম, মানে ?"

—এসে জানতে চাইছে, সন্তুবাবুকে দেখেছি কি না। একে তো ঝালমুড়ি বাদাম খেয়ে পয়সা দেবে না। তার উপর মাস্তানি...। এত তড়পানি কেন বলুন তো। জানে, আপনি সন্তুবাবুর বন্ধু। আপনাকে সামনে পেয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে দিল।"

শুভ্র হেসে বলল, "সাট্টার ঠেকটা তো আমরা তুলে দিয়েছি। পুলিস কিন্তু পেলেই ওকে তুলবে। হারানদাকে মারার পর ডায়েরি করে এসেছি।"

—কিছু দেব আপনাকে শুভ্রবাবু ?

—না গো। আমিও সন্তুকে খুঁজতে এসেছিলাম।

কথা বলার ফাঁকেই শুভ্র শুনতে পেল, মাইকে রানার গলা, 'শুভ্রনীল চ্যাটার্জিকে গ্রিনরুমে আসতে বলা হচ্ছে।'

শুভ্র জহরলালকে বলল, "সন্তুকে দেখতে পেলে বোলো, আমি খুঁজছি।" এ কথা বলেই ও ফের প্যান্ডেলের ভেতর ঢুকল। গিজগিজে ভিড়। এই দু'দিন সন্ধ্যায় পাড়ার কেউ আর বাড়িতে থাকে না। সন্তু একবার প্ল্যান করেছিল, ফাংশানের দু'দিন পাড়ায় ডাকাতি করলে কোন বাড়িতে কী পেতে পারে। দিব্যর বাড়িটা ও বাদ দিয়েছিল। কেননা, দিব্যর বাবা কোনওবার ফাংশানে আসে না। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে গ্রিনরুমে ঢুকতেই শুভ্র চমকে উঠল। স্টেজের ধারে একটা চেয়ারে বসে আছে সেই মেয়েটা !

পরনে এখন আর শালোয়ার-কামিজ নেই। তুঁতে রঙের একটা জামদানি, সাদা ঘটি হাতা ব্লাউজ। মাথায় চমৎকার খোঁপা, রুপোর ক্লিপ। গ্রিনরুমের অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা। বসে থাকার ভঙ্গিতেও একটা আভিজাত্যের ছাপ। মুখটার সঙ্গে কার যেন একটা মিল রয়েছে। শুভ্র ভেবে বের করতে পারল না। কৌতূহলী চোখে মেয়েটা স্টেজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় অন্যদের সঙ্গে খুব বেশি পরিচয় নেই। শুভ্রর বুকের ভেতরটা আবার ধক ধক করছে। কেন এমন হচ্ছে ? কেন অন্যদের নয়, এই মেয়েটাকে দেখলেই বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে ? শুভ্র বুঝে উঠতে পারল না।

কোনাকুনি দাঁড়িয়েই শুভ্র স্টেজের দিকে একবার তাকাল। মেয়েটার পাশে একটা চেয়ার খালি রয়েছে। ওখান থেকে স্টেজ আরও ভাল দেখা যাবে। তবু শুভ্র সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না সেখানে গিয়ে বসার। রিঙ্কা স্ট্যান্ডে পাত্তা দেয়নি। এখানে শুভ্র খালি চেয়ারে গিয়ে বসার পর যদি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে যায়

মেয়েটা, তা হলে অপমানের আর শেষ থাকবে না। শুভ্র চোখ সরিয়ে দেখল, পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে রানা। মঞ্চে নীরেনদা তো আছেনই। রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও একজন ভদ্রমহিলা। শুভ্র চিনতে পারল না। এত বড় বড় লোক ফাংশানে, অথচ শুভ্র জানতেও পারল না! বোধহয় রানার বাবা নিয়ে এসেছেন। খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট লোকের চেনা থাকাটা স্বাভাবিক।

উদ্বোধন সংগীত, অতিথিদের পরিচিতি এবং মাল্যদান হয়ে যাওয়ার পর, ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারল শুভ্র, সঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রমহিলাকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল ওর। একটা গান শুনে এখনও মুগ্ধ হয়ে যায়। একদিন সকালে ঠিক ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে গানটা রেডিওতে শুনেছিল শুভ্র, 'প্রেম শুধু এক মোমবাতি... আলোর নাচনে, ঝড়ের কাঁপনে যখন তখন মাতামাতি... জীবন যে যায় বদলে রাতারাতি।' আধুনিক বাংলা গানের প্রতি ওর কোনও টান নেই। কিন্তু এই গানটা, এই গানটা শুনে ওর অদ্ভুত ভাল লেগেছিল সেদিন। প্রতিটা শব্দ যেন অর্থময়... রোমান্টিক। সেদিনই দুপুরে স্টেশনে গিয়ে ক্যাসেট কিনে এনেছিল ও। গানের কলি মনে পড়তেই শুভ্র একবার তাকাল চেয়ারে বসা মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা এবার উঠে দাঁড়াল। শাড়ির কুচি এবং আঁচলটা একবার ঠিক করে নিল। নীরেনদা মাইকে বলছেন, "অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমরা এখন আমাদের অঞ্চলের দুই কৃতি ছেলে-মেয়েকে পুরস্কৃত করব। প্রথমেই ডাকছি, ফুল্লরা মুখার্জিকে। এই মেয়েটি আমাদের অঞ্চলে নতুন, সম্প্রতি এসেছে। তবে এখানে আসার পরই অনন্য এক কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কিছুদিন আগে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বিষয়টা ছিল, ড্রাগের ওপর। সমাজের পক্ষে ড্রাগ কতটা ক্ষতিকারক। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সারা বাংলার কুড়ি হাজার ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে প্রথম হয়েছে আমাদের ফুল্লরা মুখার্জি। সরকারের তরফে মাননীয় রাজ্যপাল পুরস্কার দেবেন আগামী মাসে। কিন্তু তার আগেই আমরা ওকে পুরস্কৃত করছি।"

টানা এতগুলি কথা বলে নীরেনদা থামলেন। তারপর গ্রিনরুমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের সামনে হাজির করছি ফুল্লরাকে। ওকে পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।"

বিস্ময়ের সঙ্গে শুভ্র দেখল, মেয়েটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে মঞ্চে। হাততালির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মঞ্চে উঠেই মেয়েটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল নীরেনদাকে। তারপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তারওপর সামনের দিকে তাকিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে একবার হাত নেড়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রিণরুমে দাঁড়িয়েও শুভ্র লক্ষ করল, মেয়েটার নাকে ঘাম চকচক করছে। হাতে ধরা রুমাল দিয়ে একবার তা পুছলও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরস্কারটা নিয়ে মেয়েটা ফের নীচে নেমে এল।

মাইকে নীরেনদা বললেন, "এবার ডাকছি শুভ্রনীল চ্যাটার্জিকে। আপনারা সবাই জানেন, এই ছেলেটি এবার বাংলা দলের হয়ে খেলে এসেছে জাতীয় গেমসে। শুভ্রনীলকে পুরস্কার দেবেন প্রাক্তন ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক।"

নীরেনদা এবার তাকালেন গ্রিনরুমের দিকে। অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল শুভ্রর

নিজেকে। দুটো পা যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ফুল্লরা নামের ওই মেয়েটার পাশ দিয়ে মঞ্চে উঠল বটে, কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারল না। মুখের সামনে তিনটে বড় আলো। সামনে অন্ধকার, কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না শুভ্র। কানে চি-ই-ই শব্দ। ওর শরীরটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। ছোটবেলা থেকেই মঞ্চে উঠে ও পুরস্কার নিতে অভ্যস্ত। কোনওদিন নিজেকে এমন বোকা বোকা লাগেনি। ফাংশানে আসার আগে ও পাঞ্জাবি-চোস্ত পরতে চায়নি। মনে মনে শুভ্র পোশাককেই দায়ী করল।

ক্লাবের কোচ ভাস্করদা একটা টোটকা শিখিয়েছিলেন, নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য। সেটা কি এখানেও খাটাবে? শুভ্র মনে মনে ভাবল। ভাস্করদা বলেছিলেন, "ধর, পেনাল্টি বক্সে দুই ডিফেন্ডারকে দেখে তুই নার্ভাস হয়ে গেছিস। কোনও কিছুই নির্ভুল করতে পারছিস না। মনটাকে তখন তুই পেনাল্টি বক্স থেকে সরিয়ে নিবি। চলে যাবি, ছোটবেলার কোনও ঘটনায়। ধর, তুই কাউকে প্রচণ্ড পিটিয়েছিলি, অথবা এমন কথা ভাববি, যার উপর তোর প্রচণ্ড রাগ। মনে করবি, বলটাই সেই লোক। দেখবি নার্ভাসনেস কোথায় উধাও হয়ে গেছে। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, সব কিছু যা তুই চাইছিস করতে পারছিস।" ...মঞ্চে পুরস্কার নিতে উঠে, টোটকাটা শুভ্র কাজে লাগাতে গেল। মনে মনে রতার কথা ভাবতে লাগল। মনে মনেই রতাকে ও যথেচ্ছ পেটাতে শুরু করল। রিক্সাওয়ালার বউটা রতার হাত ধরে টানছিল। শুভ্রর হাতটাও কি কেউ টেনে ধরেছে? ভয়ানক চমকে উঠল ও। পুরস্কার হাতে তুলে দিয়ে সুভাষ ভৌমিক বললেন, "বিদ্যাসাগর ট্রফিটা কিন্তু কলকাতায় আনা চাই।"

মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল শুভ্র। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ওর। গ্রিনরুমে বেশ ভিড়। অতিথিদের বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুরু হবে বাচ্চাদের নাচ-গান। সেজেগুজে সবাই দাঁড়িয়ে। সংখ্যায় বেশি মেয়েরাই। "কনগ্রাচুলেশন্স শুভ্রদা"— হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল শ্যামলী। ভিড় ছেড়ে বেরোবার চেষ্টা করছিল শুভ্র। পুরস্কারের প্যাকেটটা আগে পিসিমণির কাছে রেখে আসা দরকার। —দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে কিন্তু তোমাকে। টিপ্পনি কাটল শ্যামলী।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে মনে করল শুভ্র। কিন্তু দেখল, শ্যামলীর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুল্লরা। শুভ্র একটু ঝুঁকে ওর কানে কানে বলল, "তোকে কিন্তু মোটেই মিস প্যান্ডেল মনে হচ্ছে না।"

খিলখিল করে হেসে উঠল শ্যামলী। ফুল্লরার মুখে কোনও অভিব্যক্তিই নেই। ও অন্য দিকে তাকিয়ে। শ্যামলী বলল, "তাই নাকি? তবে কাকে মিস প্যান্ডেল মনে হচ্ছে তোমার?"

—সামনের বছর ফাংশানের সময় বলব।

—বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পিসিমণি তোমার কপালে টিপ দেয়নি আজ?

—দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বললাম, ওটা শ্যামলীর জন্য নিয়ে যাও। প্রতিবার ফাংশানের দিন ও তেরো ঘণ্টা করে সাজে। কারও নজর লেগে যেতে পারে।

শ্যামলী অপ্রতিভ হয়ে বলল, "মোটেই আমি তেরো ঘণ্টা ধরে সাজি না। আমার দরকার হয় না।"

—তা হলে উদাহরণ দিই। গত চৌদ্দই ডিসেম্বর তোর দিদির বিয়ের দিন কখন বিউটি পার্লারে গিয়েছিলি ?

—সকাল সাতটায়।

—বিয়েটা কখন ছিল ?

—রাত আটটায়।

—কতক্ষণ হল।

—উফ্ তোমার অসাধারণ মেমারি শুভ্রদা।

কথার মাঝে ঢুকে পড়ল রানা। ব্যস্তভাবে বলল, "তুই এখানে শুভ্র ? আর তোকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল, পিসিমণি তোকে ডাকছে। এই ফুল্লরা, তুইও চল। তোর মা তো দিব্যি জমিয়ে গল্প করছে দেখলাম পিসিমণির সঙ্গে।"

প্যাকেটটা প্রায় হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল শুভ্রর। পিসিমণির বান্ধবী ওই ভদ্রমহিলা এই মেয়েটার মা !

...খুশিতে উড়তে উড়তে শুভ্র পিসিমণির কাছে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ি যাবে কখন ?"

পিসিমণি হেসে বললেন, "বাড়ি আর যাবই না। তুই আমাকে এত জ্বালাস। এবার থেকে বন্ধুর বাড়িতেই থাকব।"

—ঠিক আছে, ওখানেই থাকো। শ্যামলীর একটা চাকরি দরকার। ভাবছি, ওকেই রাঁধুনি রাখব।

—ওরে শয়তান, আমি তোর রাঁধুনি ?

—না, তুমি খাদ্যমন্ত্রী।

শুভ্রর কথায় সবাই হেসে উঠল। মঞ্চে তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। হাসির শব্দে আশপাশ থেকে গুঞ্জন শুনতে পেল শুভ্র। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সবাই রেগে যাচ্ছে। একা বাড়ি যাবে না কিন্তু। ক'টায় যাবে ?"

পিসিমণি বললেন, "সাড়ে নটার পর। দশটা থেকে একটা ভাল সিরিয়াল আছে টি ভি-তে। তুই ফাংশান দেখবি না ?"

—না। আমি পার্কের মাঠে আড্ডা মারব রানার সঙ্গে।

হাতঘড়ি দেখে শুভ্র হিসাব করে নিল, ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে। বাচ্চাদের নাচ-গান দেখার ইচ্ছা মোটেই ওর নেই। প্রত্যেকবার একই নাচ, একই গান। কলাভবনের টিচাররা কি একটুও বৈচিত্র্য আনতে পারেন না ? সেই 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' বা 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। মাঝে 'খর বায়ু বয় বেগে' আর শেষে, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

প্যান্ডেলের বাইরে এসে রানাকে ও বলল, "সন্তুটা এল না, খুব খারাপ লাগছে।"

রানা বলল, "সন্তু সম্পর্কে তোকে কিছু বলার আছে।"

দুজনে ধান মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল। ওদিকে লোকজন কম। ধানমাঠ ঘুরে পার্কে যাওয়া যায়।

রানা বলল, "সার্জেন্ট মুখার্জিকে তোর মনে আছে। সেই যে রে, আমাদের যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

শুভ্র বলল, "বাঃ মনে থাকবে না ! কেন রে ?"

রানা বলল, "বাবার কাছে মাঝে একদিন উনি এসেছিলেন। আমাকে বললেন, "তোমার এক বন্ধু— সনৎ সাট্টা ওয়ার্ল্ডে ঢুকতে চাইছে। আরও অনেক বদ ঝামেলায় জড়াচ্ছে। ওকে বোঝাও।"

শুভ্র এ সব জানে। ও বলল, "পুলিশও সব খবর রাখে দেখছি। তোকে বলা হয়নি, মাঝে একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল সন্তু। পকেটে এখন ও রিভলভার নিয়ে ঘোরে।"

—তাই নাকি! বিস্ময় ছিটকে বেরোল রানার মুখ থেকে। তা হলে চিতার সঙ্গে ভিড়েই ওর এই অধঃপতনটা হয়েছে।

—চিতার ডেরায় একদিন যাবি?

—গিয়ে কোনও লাভ হবে? সকালে সন্তু আগে পড়াত শচীন কানুনগোর মেয়েকে। ওখানে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, টিউশনিটা ছেড়ে দিয়েছে। শম্পাকে এখন পড়াচ্ছে আমাদের ফুল্লরা। কানুনগোদের আত্মীয় হয়।

ফুল্লরার নামটা শুনে বুকের রক্ত একবার ছলাৎ করে উঠল শুভ্রর। রানা বলল, আমাদের ফুল্লরা। তার মানে, ওর সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। কই, কখনও মেয়েটার কথা বলেনি তো রানা। শুভ্র একবার ভাবল, মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। ওরা এখন আলোচনা করছে সন্তু সম্পর্কে। প্রসঙ্গটা পাল্টানো উচিত নয়। চিন্তিত মুখে ও বলল, "সন্তুকে নিয়ে এবার একটু ভাবতে হবে রে রানা। আচ্ছা, সেদিন কথায় কথায় আমাকে ও একটা মেয়ের নাম বলেছিল— রাধি। তুই চিনিস?"

—রানা বলল, "রাধি? স্ট্রেঞ্জ! কোথাকার মেয়ে?"

—তা জানি না। কিছুতেই ও বলল না। ভেবেছিলাম, তুই চিনতে পারিস। পাড়ার মেয়ে মহলে তোর এত যাতায়াত ...।

—দাঁড়া, অনুরাধা বলে একটা মেয়ে আছে তারা সাইকেল বাড়িতে। তবে ওই বাড়ির যা কালচার ... না, খাপ খাচ্ছে না।

—আরও একটু ভাব তো। তেমন হলে শ্যামলীকে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। সন্তুর কথায় মনে হচ্ছিল, মেয়েটার সম্পর্কে ওর সফটনেস গ্রো করেছে ...।

বলতে বলতেই শুভ্র দেখল, শ্যামলী আর ফুল্লরা ধানমাঠের দিকেই আসছে। খুব সাহস বেড়েছে তো শ্যামলীর। এদিকে, ফাঁকা রাস্তায় ওর কী দরকার? শুভ্র একটু রেগে উঠল। ঠিক করল, কাছে এলে ওকে কড়া ধমক দেবে।

ওরা কাছে আসতেই শুভ্র কড়া গলায় বলল, "ফাংশানের দু'দিন তোদের ল্যাজ গজায়, না রে?

শ্যামলীর হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। একবার রানার দিকে তাকিয়ে ও মুখটা নিচু করতেই শুভ্র অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'তোদের' কথাটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। ফুল্লরা বলে মেয়েটা কিছু মনে করতে পারে। কথা ঘোরাবার জন্য শুভ্র বলল, "জানিস না, এ রাস্তাটা ভাল না। কেউ যদি তোদের টিটকিরি দেয়, ভাল লাগবে? গতবারের কথা তোদের মনে নেই?"

শ্যামলী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমার কী দোষ, রানাই তো আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, সত্যি কি না।"

রানা বলল, "হ্যাঁ রে, আমিই ওকে আসতে বলেছিলাম।"

সমর্থন পেয়ে শ্যামলী কটাক্ষ করল, "পাড়ার মেয়েদের সম্মান নিয়ে এত ভয় কেন শুভ্রদা, সন্তুদা নেই বলে?"

শুভ্র প্রচণ্ড চটে গেল কথাটা শুনে। রেগে গেলে ও গুম হয়ে যায়। সহজে ও রাগে না। কিন্তু রাগলে ওর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয় না।

শুভ্রকে চুপ থাকতে দেখে রানা বলল, "তোর মাঝে মাঝে কী হয় বল তো? দরকার বলেই শ্যামলীকে আজ ডেকেছি। আমাদের দরকার তোর সঙ্গে। চল, পার্কের মাঠে গিয়ে বসি।"

শুভ্রর হাত ধরে টানল রানা। একটু অবাক হলেও শুভ্র হাঁটতে লাগল ওদের সঙ্গে। কিছুদূর এসেই ফুল্লরা বলল, "আমার যাওয়ার দরকার আছে শ্যামলীদি?"

শুনে ধমক লাগাল শ্যামলী, "আমি তো ডাকছি, অত দোমনা করার কী আছে?"

—তা না, মা যদি খোঁজে?

—তোর মা এখন পিসিমণিকে ছেড়ে উঠবে? এতদিন পর দু'জনের দেখা। চল, তুই না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

... পার্কের মাঠে এসে বসল ওরা চারজন। দূর থেকে গানের কলি শোনা যাচ্ছে। শুভ্রর উল্টো দিকে, খুব কাছেই শ্যামলীর প্রায় গা ঘেঁষে বসে রয়েছে ফুল্লরা। গা আঁচল দিয়ে ঢাকা। বসার পর পায়ের পাতাটাও ঢেকে দিয়েছে শাড়িতে। ঘাসে পা ছড়িয়ে বসেই শুভ্র লুকিয়ে একবার তাকাল ওর দিকে। জীবনে কোনওদিন এ রকম কোনও জায়গায় মেয়েদের সঙ্গে এভাবে ও আড্ডা মারতে বসেনি। ওর সারা পৃথিবী জুড়ে একজনই মহিলা—পিসিমণি। স্বাতীও কোনওদিন মনের ওই জায়গাটা দখল করতে পারেনি।

কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে শুভ্র বলল, "এখানে কি ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের ক্লাস চলছে নাকি রে রানা?"

রানা বলল, "এর জন্যই তো তুই-ই দায়ী। কেন বকলি শ্যামলীকে। আননেসেসারি তুই ওর ওপর গার্জেনগিরি করিস।"

শ্যামলী অভিমানের গলায় বলল, "দাঁড়াও, কাল সকালেই গিয়ে আমি পিসিমণিকে বলে আসব। যখন পড়তে যেতাম, তখন অনেক বকেছ, কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ। কোনওদিন কিছু বলেছি? ফুলের সামনে কেন তুমি আমায় বকবে?"

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, "ধানমাঠে তুই আবার ফুল কোথায় পেলি রে বুদ্ধু।"

খিলখিল করে হেসে উঠল শ্যামলী। হাসতে হাসতেই বলল, "বুদ্ধু আমি, না তুমি? ফুল মানে, আমাদের এই ফুল্লরা। দেখো, ঠিক একটা ফুলের মতো, নয়?"

সবাই মিলে ওরা হাসতে লাগল। রানার দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা বলল, "আমার নামটা খুব বিচ্ছিরি, তাই না?"

রানা হাসি থামিয়ে বলল, "মোটেই না। আমার তো খুব ভাল লাগে। মনে হয়, ব্যাধিনী-ব্যাধিনী গোছের। কালকেতুর সঙ্গে তীর-ধনুক হাতে, বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে তুমি শিকারে যাচ্ছ। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের মলাটে আমি ছবি দেখেছি ফুল্লরার।"

শ্যামলী চোখ পাকিয়ে রানাকে বলল, "তোমার নামটাই বা এমন কী? শুনলেই মনে হয়, বুকে রাংতার বর্ম আঁটা, ইয়া গোঁফ, হাতে বাঁশ, গাধার পিঠে একটা লোক

সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

ফুল্লরা হাসছিল। রানাকে বলল, "ধ্যাৎ, রানা-মহারানারা কখনও গাধার পিঠে চাপেনি। ঘোড়ায় চড়ত।"

শ্যামলী ছদ্ম কোপে বলল, "তুই কিচ্ছু জানিস না। এটা তোর সাবজেক্ট নয় ... ড্রাগ নয়।"

ফুল্লরার দিকে মাঝেমধ্যে চোখ চলে যাচ্ছি শুভ্রর। ওর হাসির মধ্যে আলাদা একটা মাধুর্য আছে। দাঁতগুলোও মুক্তোর মতো। মনে মনে ও উচ্চারণ করল, "ফুল ... ফুল ... তুমি বিউটিফুল।" খুব নরমভাবে, আস্তে আস্তে ও এটা বলল।

শুভ্রর পিছনে লাগবার জন্যই রানা হঠাৎ বলল, "শুভ্রর নামটা শুনলে তোমাদের কী মনে হয়?"

ফুল্লরা মাথা নিচু করে রইল। শ্যামলী বলল, "না বাবা, আমি কিছুই বলব না। তবে হারানদাকে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই বলবে, গান্ধীজির পর এটাই সেরা ভারতীয় নাম।"

রানা টিপ্পনি কাটল, "আমার কিন্তু চোখের সামনে ভেসে ওঠে ... সাদা, খুব সাদা রঙের একটা ক্যানভাস। তাতে কিছু নেই, কিছুই দেখার নেই। রাগ নেই, ঘৃণা নেই, দ্বিধা নেই, প্রেম নেই, প্রেম করার ইচ্ছাও নেই ...।"

শুভ্র খুব মজা পাচ্ছিল রানার কথা শুনে। ওকে থামিয়ে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, "তোর বুঝি খুব ইচ্ছে আছে?" প্রেম কথাটা ওর মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোল না, ফুল্লরার সামনে।

রানা বলল, "ইচ্ছা নেই মানে? ইতিমধ্যে আমার সেই ইচ্ছাটা পূরণও হয়ে গেছে।"

রানা সিরিয়াসলি বলছে কি না, শুভ্র বুঝতে পারছিল না। অবিশ্বাসী চোখে একবার ও তাকাল। তারপর বলল, "মানে? কে তোর সেই ইচ্ছা পূরণ করল?"

রানা উজ্জ্বল মুখে ইঙ্গিত করল, "শ্যামলীকে জিজ্ঞাসা কর।"

শুভ্র অবাক হয়েই একবার শ্যামলী, আরেকবার রানার দিকে তাকাল। দু'জনের চোখ-মুখ দেখেই বুঝে নিল, কে কার ইচ্ছাটা পূরণ করেছে। দু'জনকে দেখে ওর খুব ভাল লাগল। শ্যামলী খুব ভাল মেয়ে। ছোটবেলা থেকে ওকে দেখছে। ওর মতো প্রাণোচ্ছল মেয়ে পাড়ায় খুব কমই আছে। আর রানার তো তুলনাই হয় না। ওদের ফ্যামিলিটাও চমৎকার। রানার সঙ্গে বিয়ে হলে শ্যামলী খুব সুখীই হবে। একটাই প্রবলেম ওদের, দু'জনের কেউ পেটে কথা রাখতে পারে না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রানা বলল, "কী রে, তুই যে আর কিছু জানতে চাইলি না।"

শ্যামলী মাথা নিচু করে ঘাস ছিঁড়ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব মায়া হল শুভ্রর। তবু মজা করার লোভ সামলাতে পারল না। গম্ভীর হয়ে বলল, "জেনে আর কী হবে। শুধু জানতে ইচ্ছা করছে, তোদের মধ্যে কে আগে, কখন, কোথায় কীভাবে প্রপোজ করেছে।"

রানা বলল, "আমি বলছি। সেদিন ফ্রাংশানের রিহার্সাল চলছিল। হঠাৎ দেখি ও প্রেম প্রেম চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। দারুণ একটা শার্ট পরে গেছিলাম সেদিন।

তাকাতে বাধ্য। তারপরই কথাটা ও বলে ফেলল। আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন আগে, সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড গতে। আর হ্যাঁ, ও তখন ঠিক আমার কানের কাছে বসেছিল।"

শ্যামলী মুখ তুলে বলল, "মিথ্যে কথা।"

ফুল্লরা সমর্থন জানাল, "এগুলো কিন্তু সব আপনি বানিয়ে বানিয়ে বললেন রানাদা।"

ওকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, "তা হলে ও সত্যি কথাটাই বলুক। পৃথিবীর কোনও মেয়ে আজ পর্যন্ত যা করেনি, সেদিন ও তাই করল। কী বলল জানিস, শুভ্রদা যদি মত দেয়, তা হলেই আমি এগোব। বাঃ চমৎকার, শুভ্রদা তোমার হয়টা কে, যে তার পার্মিশন নিয়ে তবে প্রেম করতে হবে!"

রানার কথা শুনে শুভ্র উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। গাম্ভীর্য বজায় রেখেই ও বলল, "এখনও কি ওই অবস্থায় ঝুলে আছে?"

রানা বলল, "ঠিক তাই।"

—কিন্তু পার্মিশন তো আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় ভাই।

কথাটা শুনে খুব ব্যথিত মুখে তাকাল শ্যামলী। ফুল্লরা রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। রানা নিজের নাকে আঙুল ঘষছে। গুরুতর সমস্যায় পড়লে এটা ও করে। সবার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে শুভ্র বলল, "দ্যাখ মলি, আমার তিন বন্ধু কে কবে প্রেমে পড়বে, তার একটা অর্ডার করে রেখেছিলাম। প্রথমেই নাম ছিল দিব্যর, তারপর রানা, তারও পর সন্তু। এখন তো দেখছি, অর্ডারটা ঠিক উল্টে গেল। দিব্যর একটা গতি না হলে কী করে তোদের পার্মিশন দিই বল তো?"

মুহূর্তেই গুমোট ভাবটা কেটে গেল। শ্যামলী মুখ নিচু করেই বলল, "পরে বাবা যদি কোনও রকম আপত্তি করেন, তখন তুমি আমাদের পাশে থাকবে তো শুভ্রদা?"

থাকব, দুটো শর্তে। এক, আর কোনওদিন যদি পিসিমণির কাছে গিয়ে আমার নামে চুকলি না কাটিস। দুই, সন্তু আমার থেকেও বেশি সাহসী, এটা যদি আর না ভাবিস। হাসতে হাসতে বলল শুভ্র। তারপর পার্কের ঘাস ছিঁড়ে শ্যামলীর মাথায় দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ফের বলল, "বৎসে সুখী হও। রানার মাথাটা চিবিয়ে খাও। যত তাড়াতাড়ি মাথাটা পাও। এই আশীর্বাদ আমার নাও।"

শ্যামলী কিন্তু সত্যি সত্যিই পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে ফেলল শুভ্রকে। গত বছর বিজয়া দশমীর দিন এই কাজটা জোর করেও করাতে পারেনি শুভ্র ওকে দিয়ে। শেষ পর্যন্ত পিসিমণি শ্যামলীকে খুব বকাবকি করেছিল। শুভ্র একবার বলল, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" খুশিতে ওর মনটা তখন ভরে যাচ্ছিল।

শ্যামলীর সঙ্গে নিচু গলায় কী যে কথা বলছে ফুল্লরা। শ্যামলী বলে উঠল, "বাব্বাঃ এর মধ্যেই পাড়ার সব ছেলেকে চিনে গেছিস তুই! সন্তুদার সঙ্গে তোর পরিচয়টা হল কোথায়?"

ফুল্লরা বলল, "শম্পাদের বাড়িতে।"

—তাই বল। হি-ম্যান টাইপের, না রে?

ফুল্লরা রানার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "শুনছেন তো কী বলছে মলিদি।"

শ্যামলী বলল, "শুনে হবেটা কী। আমি তো অনেকবার ভেবেছি, প্রেমে পড়লে

সন্তুদার মতো ছেলেদের সঙ্গেই প্রেমে পড়া উচিত। কিন্তু চাটি খাওয়ার ভয়ে এগোইনি।"

রানা রাগ করার ভঙ্গিতে বল, "শুনলি শুভ্র, আজ থেকে আমি দিব্যর দলে। ওর সঙ্গে একমত, সন্তুকে পাড়ায় ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে আমাদের।"

শুভ্র বলল, "এই চল তো, রতাকে ধরে একবার পিটিয়ে আসি। সন্তু দেখছি এ কাজটা করে হিরো হয়ে গেল রে।"

—আজ না, আজ না। রানা বলে উঠল, "কাল আমার নাটক আছে। আজ মারপিট করলে সব ডায়লগ ভুলে যাব।"

ফুল্লরা বলল, "মারপিট করলে না, বলুন মার খেলে।"

—অত সোজা নয় ফুলমণি। শুভ্রর হাতে চড় খেয়ে একবার এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের চারটে দাঁত পড়ে গিয়েছিল। ওয়ান-এইটথ পার্সেন্ট অব টোটাল পার্টি। বেচারা হয়তো এখন ফোকলাই রয়ে গেছে।

শুভ্র বলল, "একটা কাজ কর রানা। তুই বেপাড়ার ছেলে হয়ে যা। তারপর জাপটে ধর মলিকে। সাহস দেখানোর জন্য, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করব এরপর মলিকে।"

রানা লাফিয়ে উঠল, "গুড আইডিয়া।"

শ্যামলী বলল, "এই ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমি না, আমি না। ফুলকে ধরো। ও এখনও পুরো পাড়ার মেয়ে হয়নি।"

শুভ্র হতাশ হয়ে বলল, "পুরনো আইডিয়াটাই জলে গেল।"

সবাই মিলে ওরা হাসতে লাগল। দুম করে রানা জিজ্ঞাসা করে বসল, "শুভ্র, তোর সেই স্বাতী মেয়েটার খবর কী রে?"

শুভ্রর মুখটা কালো হয়ে গেল। ফুল্লরার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে ও বলল, "ভাল আছে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে এখন ও পড়াশুনা করছে।"

শ্যামলী ঠাট্টা করে বলল, 'কী ব্যাপার শুভ্রদা, তুমিও ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ নাকি?

শুভ্র বলল, "না রে। জল খেয়ে এইমাত্র ডুবে গেলাম।"

রানা বলল, "যা দিনকাল পড়েছে, কোনও ছেলে-মেয়ের খালি থাকার উপায় নেই। আমার মাসতুতো বোন পিঙ্কি—বয়স মাত্র ষোল। সেও শুনি, প্রেম করছে। এই ফুলমণি, তুই খালি না ফুল?"

ফুল্লরা রহস্যময় হাসি হেসে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কী মনে হয়।"

—মনে তো হয়, ফুল। তোর মতো বোম্বাস্টিং সুন্দরী এতদিন খালি থাকবে, আমার তো বিশ্বাস হয় না।

শ্যামলী বলল, "আমি জানি। ওর ঠিক করাই আছে।"

ফুল্লরা মৃদু গলায় বলল, "মলিদি, এসব কথা বললে আমি কিন্তু উঠে যাব এখান থেকে।"

শুভ্রর মন ভেঙে যাচ্ছিল এসব কথা শুনে। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য ও বলে উঠল, "মলি, তুই রাধি নামে কাউকে চিনিস?"

শ্যামলী অবাক হয়ে বলল, "কেন বলো তো? ও তো আমাদের নিরালা বাড়িতেই থাকে। খুকুমণিদার কাছে।"

—খুকুমণিদার আত্মীয় ?

—না, না। ওঁর বাড়িতে কাজ করে। ছোটবেলা থেকেই এঁর বাড়িতে মেয়ের মতোই আছে।

শুভ্র ভয়ানক চমকে একবার তাকাল রানার দিকে। সন্তুটার সবকিছুই যেন অদ্ভুত। রাধির প্রসঙ্গে আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে শুভ্র হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আমি চলি রে। কাল মেদিনীপুর যেতে হবে। বিদ্যাসাগর ট্রফির ফাইনাল আছে।"

পার্কের মাঠ থেকে বেরোবার সময় ওর কানে একটা কথাই তখন বাজছে, "ওর সব ঠিক করা আছে।"

... রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শুভ্রর হঠাৎ খেয়াল হল, নবজাতকের ফাংশানে পাওয়া প্রাইজের প্যাকেটটা খোলা হয়নি। ফাংশানের পর পিসিমণির সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল ফুল্লরার মা আর ফুল্লরা। নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে তখন সোফায় চুপ করে বসেছিল শুভ্র। ওরা চলে যাওয়ার পর, খাওয়া-দাওয়া সেরে এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও সারাদিনের কথা ভাবছে। ফুল্লরার কথা যদি কাউকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করত, তা হলে লজ্জার আর শেষ থাকত না। ভালই হয়েছে। ফুল্লরার কথা মোটেই ও আর ভাববে না। দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড। শ্যামলী তো জানিয়েই দিল, ফুল্লরা এনগেজড।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে, শুভ্র ড্রয়িংরুমে এল প্রাইজের প্যাকেটটা নেওয়ার জন্য। চোখ বুলিয়ে দেখল, টেবলের ওপরই পড়ে আছে। প্যাকেটটা হাতে নিতেই হঠাৎ চোখে পড়ল লেখা আছে, ফুল্লরা মুখার্জি। আরে, ওর প্যাকেট আমাদের বাড়িতে ? পরক্ষণেই ও বুঝতে পারল, লাল রঙের কাগজে মোড়া দু'টো প্যাকেট একই রকম দেখতে বলে ওরা ভুল করেছে। হয়তো পাশাপাশি রাখা ছিল। ফুল্লরা মুখার্জি নামটার ওপর আঙুল ছুঁইয়ে শুভ্র ধপ করে বসে পড়ল সোফাতে।

সিঙ্গল

উত্তেজনায় কপালের পাশটায় দপদপ করছে রাধির। সাড়ে সাতটা— ঠিক আর আধ ঘণ্টা পর ওদের সবার জড়ো হওয়ার কথা পাঁচ নম্বরে। ওই ফ্ল্যাটের রেবাদি সব ঠিকঠাক করে রাখবে। ওরা তিনজন পৌঁছলেই শুরু করে দেবে। পাঁচ নম্বরে ওরা ছাড়া তখন আর কেউ থাকবে না। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নিশ্চিন্তি। রেবাদির মুখে এতদিন অনেক গল্প শুনে এসেছে রাধি। গা শিরশির করে ওঠে সেসব কথা শুনলে। কল্পনায় কত কী দেখে। গায়ে একেক দিন জ্বর ভাব এসে যায়। আজ সব কিছু দেখে ফেলবে। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। রাধির আর তর সইছে না।

ড্রয়িংরুমে একবার উঁকি মারল রাধি। বৌদি এখনও তৈরিই হল না। সোফায় বসে ঢঙ করে চা খাচ্ছে। রাত দশটার আগে দাদাবাবু কখনও বাড়ি ঢোকে না। দাদাবাবুকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু বৌদি যদি এখন বলে 'মাথা ধরেছে' অথবা শরীরটা ভাল ঠেকছে না," তাই আর 'ফাংশানে যাব না'— তা হলে হয়ে গেল।

রাধির আর পাঁচ নম্বরে যাওয়াই হবে না। বৌদির এসব রোগ আছে। হয়তো দাদাবাবুর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার কথা, দাদাবাবু তৈরি হয়ে নিয়েছে, হঠাৎ বলে বসবে, যাব না। একেক দিন রাগ করে দাদাবাবু একাই চলে যায়। মাথা ধরা না, ছাই। দাদাবাবু চলে যাওয়ার পর বৌদি কোথায় যেন ফোন করে কথা বলে অনেক সময় ধরে। সেই সময় বৌদির মুখে হাসি, চোখের ভাবভঙ্গি আর গলার স্বরে কখনই রাধির মনে হয় না, শরীর ভাল না ঠেকার কোনও লক্ষণ আছে।

মরুগ গে থাক, বৌদির ঢলানি আরও অনেক ও দেখেছে। বিশেষ করে যে দিন দুপুরে বিপ্লবদাদাবাবু আসে। বৌদির চোখের ভাষাই পাল্টে যায়। ওসব ভেবে ওর কোনও লাভ নেই। কাজের মেয়ে, কাজের মেয়ের মতো থাকাই ভাল। মনটা খুব আনচান করছে এখন। ইস্, সুযোগটা বোধহয় আজ ফসকে গেল। রেবাদি বলেই রেখেছে, "আজ যদি না আসতে পারিস, আর তা হলে তোদের দেখাতে পারব না। বৌদির কী যেন একটা অপারেশন হবে। মাস খানেক অফিস যাবে না। নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই থাকবে। আজকেই সুযোগ। বাড়িশুদ্ধ লোক নবজাতকের ফাংশানে চলে যাবে। সবাই আমরা একসঙ্গে ফাঁকা।"

রেবাদির এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই রাধি একবার বারান্দায় এল। দেখল তিন নম্বরের বৌদি বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেল। মানে, ফাংশান দেখতেই গেল। ওই ফ্ল্যাটের বিভার বেশ সুযোগ হয়ে গেল। পাঁচ নম্বরে যাওয়ার কথা ওরও। মনে মনে গাল পাড়ল রাধি বৌদির উদ্দেশে। এখনও সোফা থেকে গতরই তোলেনি। ফাংশানে তা হলে যাবে না নাকি? বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার মুখে রাধি দেখল, বৌদি আড়মোড়া ভাঙছে। পরখ করার জন্য, সামনে এসে ও আলগোছে বলল, "তিন নম্বরের বৌদি ফাংশানে চলে গেল। তুমি যাবে না?"

"যাব।" বৌদি বলল, "ওপরের শ্যামলী আর ফুল্লরাও আমার সঙ্গে যাবে। একটু দেখে আসবি, ওরা রেডি হল কি না।"

রাধি বলল, "তুমি গা ধোবে না?"

—না রে। আজ খুব গরম। কালকের মতোই। কাল তো প্যান্ডেলে বসে কুলকুল করে ঘামছিলাম। ফিরে এসে আবার গা ধুতে হল। তুই এক কাজ কর। একটা তাঁতের শাড়ি বের করে দে।

বলেই বৌদি বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে রাধি বেরিয়ে এল বাইরে। একতলার ফ্ল্যাট। তাই দরজা কোনও সময় খোলা রাখে না। হুটহাট লোক ঢুকে গেলেই হল। ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রায়ই চুরি-চামারি হয়। বিশেষ করে, দুপুর বেলায়, যখন বেটাছেলেরা থাকে না। মাঝে মধ্যে হকার বা বাসনওয়ালি আসে। তবুও রাধি দরজা খোলে না। আই হোল দিয়ে দেখে, ভেতর থেকেই ভাগিয়ে দেয়। ভর সন্ধেবেলায়, বেরোবার পর রাধি আজ তবুও দরজাটা টেনে দিল না। বৌদি বাথরুমে। ওপর থেকে নীচে আসতে সময় নেবে দু'তিন মিনিট। এটুকু সময়ে নিশ্চয়ই কেউ ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়বে না।

সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়েই রাধি উঠতে লাগল। শরীরটা এখন আগের মতো হালকা নেই। তার ওপর বৌদি আবার বছর দুয়েক হল, জোর করে শাড়ি ধরিয়েছে। আগে যখন ফ্রক পরত, চার তলায় উঠতেও হাঁফ ধরত না। এখন ধরে, কোনও দিন

যদি এ বাড়ির ছাদে যায়, ভারী বুকটা তখন হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করে। চারতলায় সাত নম্বরের বুড়োটা তখন লোভিস্টির মতো তাকিয়ে থাকে। বেটাছেলেদের চোখের ভাষা আগে রাধি বুঝতে পারত না। এখন পারে। রেবাদির সঙ্গে না মিশলে গোপন অনেক কিছু ও জানতে পারত না।

ছয় নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে ফুলদিদিমণিরা। তিনতলায় উঠে বাঁ দিকে। হাঁফ ছাড়তে ছাড়তেই রাধি কলিং বেলে হাত দিল। ফুলদিদিমণিটা খুব সুন্দর দেখতে। পড়াশুনোয় নাকি খুব ভাল। বৌদির মুখে শুনেছে রাধি, ফুলদিদিমণির বাবা গরমেন্টের খুব বড় অফিসার। এই ফ্ল্যাটের লোকেরা সব থেকে ভাল। ফুল দিদিমণিদের কোনও কাজের লোক নেই। নিজেরাই সব কিছু করে। এমনকী, খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার নিজের বাসন ধোয়। কাঁচের বাসন তাই অসুবিধা হয় না। তিনজনের তো মাত্র সংসার! দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাধি একবার ডানদিকের ফ্ল্যাটের দিকে আড়চোখে তাকাল। দরজা বন্ধ। এই ফ্ল্যাটেই রেবাদিরা অপেক্ষা করছে। আর একটু পর ওকেও আসতে হবে। ছয় নম্বরের ভেতর থেকে খুট করে একটা শব্দ হল।

দরজা খুলে দিল ফুলদিদিমণি, "কী রে রাধি।"

দম টেনে রাধি বলল, "বৌদি তোমাদের তাড়াতাড়ি আসতে বলল।" তাড়াতাড়ি কথাটা ও ইচ্ছে করেই যোগ করল। সাড়ে সাতটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

গলাটা খুব মিষ্টি ফুলদিদিমণির। বলল, "আর মিনিট পাঁচেক। বৌদিকে বল, মলি দিদিমণি এখানে আছে। মাও আমাদের সঙ্গে যাবে। আমরা নামছি।"

মলি দিদিমণিরা থাকে দোতলায়। ওখানে যাওয়ার তা হলে আর দরকার নেই। রাধি নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ফুলদিদিমণিকে খুব সুন্দর লাগছে হলদে রঙের কটকি শাড়িতে। কী কপাল এই দিদিমণির। যা পরে, তাই মানিয়ে যায়, ভগবান যাকে দেন, সব কিছু যেন ঢেলে দেন। রাধি ভাবল, ওর বয়সও ঠিক ফুলদিদিমণির মতোই। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও, ওর চোখ-মুখ খারাপ না। এ বাড়িতে বিপ্লবদাদাবাবু যখন ওকে প্রথম দেখে, তখন বৌদিকে বলেছিল, "বাঃ এই মেয়েটা তো বেশ সেক্সি। কোত্থেকে জোটালে?" বৌদি খুব রেগে গিয়েছিল শুনে। বলেছিল, "ছিঃ, তোমার লজ্জা করে না।" সেক্সি কথাটার মানে রাধি জানে না। রেবাদিও বলতে পারেনি। আর কাউকে তো এসব জিজ্ঞাসা করা যায় না। কথাটা শুনে বৌদি যে রকম চটে গিয়েছিল, তাতে রাধি বুঝেছে—কথাটা ভাল নয়।

এক নম্বরে ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে রাধি দেখল, বৌদির শাড়ি পরা হয়ে গিয়েছে। এরপর ড্রেসিংরুমে ঢুকে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে কত কী মাখবে। সেদিকে তাকিয়ে রাধি মনে মনে বলল, শুরু হল। বয়স এত হয়ে গেল, তবু ছুড়ি সাজার শখ গেল না। মুখে অবশ্য রাধি বলল, "দিদিমণিদের হয়ে গেছে। এখুনি নেমে আসছে নীচে।"

বৌদি বলল, "এই রে। তুই চটিটা বের করে দে। আজ আর সাজব না।"

উফ, চটিটাও বের করে দিতে হবে বৌদিকে! সব কাজ করানো চাই। রাধি ভাবল, এমন শরীর ... একটুও খাটতে পারে না। আজ অবশ্য ও সব কিছু করে দিতে রাজি। বৌদি যত তাড়াতাড়ি বেরোয়, ততই মঙ্গল। নিচু হয়ে শু সেলফ থেকে ও

তাড়াতাড়ি চটিটা বের করে দিল। একটু পরে ফুলদিদিমণিরা এসে গেলে, ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল বৌদি এখন অন্তত মাথা ধরেছে বলে, থেকে যাবে না। দ্রুত হাতে বৌদি পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিচ্ছে মুখে। রাধি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সাতটা পঁচিশ। ও একবার বলেই ফেলল, "তাড়াতাড়ি যাও না বৌদি। নাটক বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে।"

ওর ব্যস্ততা দেখে বৌদি পাফ বোলানো থামিয়ে অবাক হয়েই বলল, "তোর এত তাড়া কিসের রে?"

—না, এমনি বলছি। শেষে হয়তো চেয়ার পাবে না।

... বৌদিরা বেরোল আরও মিনিট দশেক বাদে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধি ওদের দেখতে থাকল। উত্তেজনায় ওর বুক এখন ধুকপুক করছে। বৌদিকে বিশ্বাস নেই, এখনও ফিরে আসতে পারে। বৌদিরা পার্কের মাঠ অবধি পৌঁছবার পর রাধি দ্রুত হাতে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। এ সময়টায় মশা ঢোকে। সব কিছু দেখে নিয়ে, চাবি হাতে ও বেরিয়ে এল বাইরে। দরজাটা টেনে লক করে দিল। তারপর দ্রুত পায়ে উঠতে লাগল তিনতলার দিকে।

তিনতলার রেবাদির মাথাতেই প্রথম এই প্ল্যানটা আসে। বিকাল বেলায় রোজ ওরা বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে যায় পার্কের মাঠে। বেশ আড্ডা জমে ওঠে। রেবাদি, বিভা, ইরা, অন্য বাড়ির বাসন্তী, মেনকা—সবাই সেই আড্ডায় মন খুলে কথা বলে। ওরা যখন গল্প করে, বাচ্চারা তখন আপন মনে খেলে যায় পার্কে। রাধির সঙ্গে অবশ্য কোনও বাচ্চা থাকে না। কেন না, দাদা-বৌদির কোনও বাচ্চা হয়নি। "রেবাদির সঙ্গে পার্কে যাচ্ছি" বলে ও বৌদির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসে। গল্প আর কিছু নয়। বাড়ির দাদা-বৌদিদের নিয়ে চর্চা, সিনেমা অথবা আদি রসাত্মক কথা। পার্কের মাঠে ওই সময় মাঝেমধ্যে আড্ডা দিতে আসে দুটো লোক। ওদের নাম নাকি সুনীতিদা আর জ্যোতিদা। ওদের নিয়েও আলোচনা হয়। রেবাদি আর ইরা নাকি ওদের ঘাড় ভেঙে সিনেমায় যায়। অন্ধকার হলে বসে ব্লাউজের ভেতর হাত দিতে দেয়। এসব শুনে রাধির একদম ভাল লাগে না।

ওদের মধ্যে রেবাদির বয়সই একটু বেশি। বলে পঁচিশ-ছাব্বিশ। আসলে আরও দু'তিন বছর যোগ দেওয়া যায়। বিয়ে হয়েছিল রেবাদির। ঘাটালে স্বামীর ঘরও করেছিল বছর খানেক। তারপর স্বামী তাড়িয়ে দেয়। ঘাটাল থেকে ওকে এখানে নিয়ে আসে ওর এক কাকা। নিরালায় কাজে লাগিয়ে দেয়। বিভা একবার রাধিকে বলেছিল, "কাকা না হাতি। ওই লোকটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত বলেই তো স্বামী খেদিয়ে দিয়েছিল।" লোকটাকে রাধি দেখেছে। রেবাদির কাছ থেকে প্রতি মাসে টাকা নিয়ে যায়। বিভা, ইরা, বাসন্তী আর সনকার এখনও বিয়ে হয়নি। রাধিরও না। পুরুষ সংসর্গে অভিজ্ঞতা ওদের নেই। রেবার মুখে ওরা যা শোনে, হা করে গেলে। সব কথা বিশ্বাস করে।

আড্ডার মধ্যমণি তাই রেবাদিই। কেবল টিভি এ পাড়ায় আসার পর একদিন রেবাদি এসে বলেছিল, "এই জানিস, শনিবার রাতে টিভি-তে ওইসব ফিলিম দেখায়।"

সবাই কৌতূহলে ঝুঁকে পড়েছিল, "কী ফিলিম গো।"

—ওই রে, সোয়ামীর সঙ্গে মেয়েরা যা করে। ফিকফিক করে হেসেছিল রেবাদি।" তোরা একেবারে কচি। টিভিতে সব খোলাখুলি দেখায়। একদিন দেখবি।"

—তুমি কী করে দেখলে গো রেবাদি। দাদা-বৌদি বাড়ি ছিল না?

—না। ওরা দুর্গাপুরে গেছিল। ফ্ল্যাটে আমি একা। বৌদির খাটে শুয়ে আমি একা একা দেখলাম।

মেনকা অন্য বাড়ির মেয়ে। ও বলল, "তোমার তো খুব সাহস রেবাদি। বৌদির খাটে শুচ্ছ। দেখো, আবার দাদার সঙ্গে কোনওদিন শুয়ে পড়োনি।"

রেবাদি ঠোনকা মেরে বলল, "কথায় ছিরি দ্যাখ মুখপুড়ির। আমার এই দাদাটা সে রকম মরদ না।"

ওদের মধ্যে ইরাই একমাত্র কলকাতার মেয়ে। সবজি বাগানের বস্তিতে ওর বাবা-মা থাকে। ওর মা ছেলে দেখছে ইরার জন্য। পেলেই নাকি বিয়ে দিয়ে দেবে। ইরার খুব কৌতূহল গোপন সব কথা জানার। ফিলিমের প্রসঙ্গ টেনে এনে ও জিজ্ঞাসা করে, "প্রথম প্রথম মেয়েদের খুব লাগে, না গো রেবাদি।"

—সে দু'-একদিন। তারপর দেখবি, ভাল লাগছে। যাক গে, তোরা কি ফিলিম দেখবি? তা হলে যেদিন বলব, আসবি কিন্তু।

এই সব কথা আলোচনার পর বহু শনিবার কেটে গিয়েছে। সুযোগ আর ওদের হয়নি। রাধি নিজেও শনিবারগুলোতে লক্ষ্য রেখেছে, ওর দাদা-বৌদি ওই সব ফিলিম দেখে কি না। ওদের ফ্ল্যাটে শোয়ার ঘরে টিভি। না, দাদাবাবুরা ওসব দেখে না। অন্য দিনের মতো শনিবারও দাদাবাবু খাওয়া-দাওয়ার পর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

রেবাদিই একদিন পার্কের মাঠে এসে বলল, "আর শনিবারের জন্য তোদের অপেক্ষা করতে হবেনি। কাল রাতে দেখি কি না, দাদা ওই সবের ক্যাসেট এনেছে। রাতে বৌদির সঙ্গে বসে বসে দেখছে। বাপ রে, কী সব সিন, দেখলেই গা গরম হয়ে যায়।"

মেনকা একেক সময় বোকার মতো সব প্রশ্ন করে। ও বলল, "হ্যাঁ গো রেবাদি, দরজা খুলে রেখেই ও সব দেখে?"

—না রে না। রেতে উঠেছিলুম, বৌদির ঘরের পাশ দিয়ে বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখি টিভি চলছে। পর্দা আলতো সরিয়েই শুনি গোঙানির শব্দ। তারপর ওই সব সিন।

—গোঙানির শব্দ কেন গো?

—দূর মাগি, বিয়ে হোক। সোয়ামীর ঘর করতে যা। তা'লে নিজেই গোঙাবি।

এসব আলোচনা রাধি শোনে। শুনতে খারাপ লাগে না। কিন্তু ও কোনও প্রশ্ন করে না। রেবাদি নিষিদ্ধ এক জগতের কথা বলে, কুমারী মেয়েরা যা চেনে না। রাধির বিয়ে হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। কে দেবে?

রেবাদি ফের বলল, "তোরা সবাই শোন। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। এই শনিরবিবার নবজাতকের ফাংশান আছে। সব ফ্ল্যাটের দাদা-বৌদিরাই ফাংশানে যাবে। ওই সময়টায় আমরা সবাই ওই সবের ক্যাসেট দেখব।"

মেনকা বলল, "তুমি ক্যাসেট চালাতে জানো রেবাদি?"

—ছুড়ির কাণ্ড দ্যাখ। আমাদের পিঙ্কিটা এমনিতেও ভাত খেতে চায় না। ভি সি পি-তে বাঘের ক্যাসেট চালালে তখন গপগপ করে খায়। বৌদি তাই আমাকে ভি সি পি চালানো শিখিয়ে দিয়েছে।

সেই দিন থেকে ওদের সবার প্রতীক্ষার শুরু। মাঝের দুটো দিন কারোর তর সইছিল না। অসীম আগ্রহে কাটিয়েছে। সেই সঙ্গে খানিকটা উৎকণ্ঠার মধ্যেও। যদি সব কেচে যায় ?

... তিন তলায় উঠে খানিকটা দম নিয়ে রাধি কলিং বেলে হাত দিতে গেল। পরক্ষণেই ও হাত সরিয়ে নিল। মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিল। রেবাদি পইপই করে বারণ করেছিল, "খবদরি কলিং বেল টিপবি না। দরজায় দু'বার টোকা দিবি। তা হলেই আমরা খুলে দেব।" সেই সাবধান বাণী মনে করে রাধি এবার দু'বার টোকা মারল দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ নম্বরের দরজা খুলে গেল। ফিসফিসিয়ে বিভা বলল, "অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। তুই এত দেরি করলি কেন ?" বলেই ও দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে ঢুকেই রাধির মনে হল, নিষিদ্ধ কোনও জায়গায় ঢুকে পড়েছে। হালকা নীল আলো জ্বলছে। টিভির পর্দায় সিন বদলাচ্ছে বলে আলোর রকমফের হচ্ছে। বৌদির খাটে আধ শোয়া অবস্থায় রেবাদি। কোল বালিশটা রেখে দু'ঠ্যাঙের মাঝে। ইরা, বাসন্তী আর বিভা সোফা-কাম-বেডের ওপর বসে। মেনকা মেঝেতে কার্পেটের ওপর। হাঁ করে সবাই টিভির দিকে তাকিয়ে। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে সেট থেকে।

সোফায় ইরাই জায়গা করে দিল বসার। বুকটা ধকধক করে লাফাচ্ছে রাধির। ঘরে ঢোকার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। কেউ যদি কলিং বেল টেপে ? তা হলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। ভয় কাটাবার জন্যই ও টিভির দিকে মন দিল। একটা মেয়ের গায়ে কিচ্ছু নেই। একটা ছেলে ওকে পিছন থেকে খালি ঠেলছে। মেয়েটার সোনালি চুল মুখের উপর এসে পড়ছে। ভাল করে তাকাতেই রাধি দেখতে পেল, মেয়েটা উবু মতন হয়ে আছে। কী ফর্সা, আর সুন্দর দেখতে মেয়েটা। দাঁতগুলোও ঝকঝকে মুক্তোর মতন। এবার ওর বুকটা দেখাচ্ছে। ছেলেটা পিছন থেকে ঠেলছে বলে, নড়ছে। পিছন থেকে ছেলেটার হাত বুকে উঠে এল। হাত দুটো খেলা করছে বুকের উপর। রাধি সারা শরীরে এক ধরনের শিরশিরানি অনুভব করল। ও বুঝতে পারল না, পিছন থেকে ছেলেটা ঠেলছে কেন ? ঘুরেফিরে একই সিন দেখাচ্ছে টিভিতে। ছেলেটা এবার আরও জোরে, আরও ঘনঘন ঠেলতে শুরু করেছে। মেয়েটার মুখ-চোখের ভাব বদলে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ বেরোচ্ছে। মেয়েটা কী খুব কষ্ট পাচ্ছে ? না, তা তো মনে হচ্ছে না। বরং তীব্র সুখের চিহ্ন ওর সারা মুখে। রাধি বিস্ফোরিত চোখে দেখল, ছেলেটা দাঁত-মুখ চেপে ঠেলার গতি কমিয়ে আনছে। এক সময় থেমেও গেল। তারপর...।

চোখ বুজে ফেলল রাধি। উলঙ্গ ছেলেটাকে দেখার পর থেকেই ওর সারা গা গুলোতে শুরু করেছে। ঠোঁটটা ভীষণ শুকিয়ে গেছে। তলপেটের মধ্যে একটা বিচিত্র অনুভূতি টের পাচ্ছে। চোখ বুজেও ওই সিনটা যেন দেখতে পেল রাধি। কী ভয়ঙ্কর। আচ্ছা, মানুষ কি এ সময় জন্তুর মতো হয়ে যায় ? আরও মিনিট দশেক বসে

ও ওইসব দেখল। সোফায় বসেই রাধি বুঝতে পারল ওর নিম্নাঙ্গে জোর নেই। উঠে দাঁড়াতে গেলে ও পড়ে যাবে। যতবার ওই সিনটার কথা মনে পড়ছে, ওর গা পাক দিয়ে উঠছে। মুখে হাত দিয়ে ও টের পেল একটা গরম ভাপ বেরোচ্ছে। কানের লতি দুটোও বেশ গরম। মিনিট কয়েক ও চোখ বুজে বসে রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে রাধি উঠে দাঁড়াল। এ সব ও আর দেখতে চায় না।

রেবাদি বলল, "কী হল রাধি উঠে পড়লি যে! আর দেখবি না? এর পরের ছবিটা আরও ভাল। দুটো মেয়ে, একটা ছেলে।" রাধি কোনও রকমে বলতে পারল, "একবার নিচ থেকে ঘুরে আসি। দাদাবাবু এসে যেতে পারে।"

—আবার আসবি?

রাধি ঘাড় নাড়ল। টলতে টলতেই দরজা খুলে ও বেরিয়ে এল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ধীরে ধীরে ও নামতে শুরু করল। সারাদিনের উত্তেজনা, কৌতূহল— মিনিট পনেরোর মধ্যেই যেন উবে গেছে। রেবাদির কথা শুনে এতদিন মনে হত, এ সব কী না কী। রাধি ঠিক করল, আর কোনওদিন ও ক্যাসেট দেখবে না। চেষ্টা করবে, পার্কের মাঠেও না যেতে। এক নম্বরে ফিরে এসে রাধি ফ্রিজ খুলে প্রথমেই ঢক ঢক করে ঠাণ্ডা জল খেল বোতল থেকে। জল গড়িয়ে গেল গলায়, দুই স্তনের মাঝে। ও আঁচল দিয়ে মুছল না। হাত বাড়িয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে, ঠিক নীচে এসে দাঁড়াল। মিনিট কয়েক ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেই ও পায়ের জোরটা আবার যেন ফিরে পেল। গা গুলোনোর ভাবটা আর নেই। দ্রুত পায়ে ও ঢুকে পড়ল বাথরুমে। শাড়িটা খুলে ফেলল। তারপর বেসিনের কলটা খুলে নিয়ে জলের ঝাপটা দিতে লাগল মুখে, ঘাড়ে, গলায়। একবার মনে হল, কলের তলায় মাথাটাও পেতে দেয়। কিন্তু কী ভেবে দিল না। চুল ভেজালে এখন আর শুকোবে না। কল বন্ধ করে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ও আবার ফ্যানের নীচে এসে দাঁড়াল। তারপর, একটু সুস্থ বোধ করতেই গা এলিয়ে দিল সোফায়।

সারা ফ্ল্যাটে রাধি এখন একা। যেভাবে ইচ্ছে ও বসতে পারে, যেভাবে ইচ্ছে হোক না কেন, ও শুয়ে থাকতে পারে। সেন্টার টেবলের ওপর পা দুটো তুলে দিল ও। বাথরুমের কাছে শাড়িটা পড়ে আছে। থাক ওটা। এখন আর কিছু জড়াতে ইচ্ছে করছে না। দাদাবাবুর আসতে এখনও দেরি আছে। দাদাবাবুটা বেশ ভাল, একেবারেই বৌদির মতো নয়। দাদাবাবুকে প্যাড়ায় সবাই খুকুমণিদা বলে ডাকে। ছোটবেলায় দেখতে কি খুকুমণিদের মতো ছিল? দাদাবাবুকে এখনও বেশ সুন্দর দেখতে। বাড়ি তৈরির ব্যবসা করে। এই নিরালা বাড়িটাও দাদাবাবুরই তৈরি। আগে থাকত পার্কের সামনে অন্য একটা বাড়িতে। সেটা অবশ্য ছিল শরিকি বাড়ি। মাত্র একটা ঘর ছিল ভাগে। বৌদিকে রান্না করতে যেতে হত উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে। রাধি তখন শুত রান্নাঘরের মেঝেতে। এই বাড়ির এই ফ্ল্যাটটা দাদাবাবু আর বিক্রি করেনি। ও বাড়িতে অসুবিধার জন্য এখানে উঠে এসেছে।

বৌদির কাছে রাধি রয়েছে প্রায় বছর ছয়েক। মেসোর হাত ধরে ও যখন বৌদির কাছে এসেছিল, তখন ফ্রক পরত। তখন বৌদির ব্যবহার ছিল অন্য রকম। এখন কী রকম যেন খিটখিটে হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই ওঁর সন্দেহ। আট নম্বরে কাজ করে একটা ছেলে— যতীন। ওই সেদিনও ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই বৌদির মুখ

অন্ধকার হয়ে যেত। বলত, "পুরুষ মানুষদের সঙ্গে অত ঢলাঢলি কীসের রে তোর ?" বারান্দায় একটু বসলেই ধমক দিত। টিভিতে আগে বড়দের বই দেখতে বসলে বৌদি বলত, "এই, তোর অন্য কাজ নেই ?" এখন অবশ্য কিছু বলে না। ও বাড়িতে নিজের পুরনো শাড়ি দিয়ে বৌদি আগে স্টিলের বাসন রাখত। এখন রাখে না। রাধিকে শাড়ি দিয়ে দেয়। প্রতি মাসে একবার করে জানতে চায়, "কী রে রাধি, এখনও যে তোর হল না ?" কোনও কোনও মাসে দু-একদিন দেরি হলে বৌদির চিন্তা যেন খুব বেড়ে যায়।

মাস ছয়েক হল, বৌদি এখন একটু একটু করে রাধিকে ছাড়ছে। দাদাবাবু একদিন এসে জিজ্ঞাসা করল, "কী রে রাধি, সারাজীবন পরের বাড়িতে কাজ করেই কাটাবি ? নাকি হাতের কাজ কিছু শিখবি ?" রাধি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রুটি বেলছিল। দাদাবাবুর কথা শুনে ও ফিরে তাকিয়েছিল।

দাদাবাবু বৌদিকে লক্ষ্য করেই বলল, "সিঁথির মোড়ে মেয়েদের একটা সেলাইয়ের স্কুল হয়েছে। ভাবছি, রাধিকে ওখানেই ভর্তি করে দেব।"

আশ্চর্য, বৌদি কিন্তু না করল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, "স্কুলটা কখন ?"

—দুপুরবেলায়। টেলারিংয়ের কাজটা শিখুক। এমনিই তো ওই সময়টায় ঘুমোয়।

—তোমার যখন ইচ্ছে, শিখুক। ভালই হবে, ব্লাউজ বানাবার জন্য আর আমাকে স্টেশনের কাছে যেতে হবে না। বৌদি আরও ঠাট্টা করল, "কী রে রাধি, আমার কাছে মজুরি নিবি ?"

সেই দিন থেকে রাধির জীবনে বড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেলাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ওর মধ্যে সেই ভয়-ভয় ভাবটা আর নেই। দাদাবাবু কাজে বেরিয়ে যায় দশটা-সাড়ে দশটায়। তার আগেই রাধি রান্নার পাট সব চুকিয়ে ফেলে। বৌদি স্নান করতে ঢুকলে ও সেলাই স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে দিদিমণিটা খুব বকে। রাধির মতো আরও দশ-বারোটা মেয়ে আছে। সবাইকে একসঙ্গে কাটিং শেখায়। কেউ একটু দেরিতে এলে দিদিমণি তাই বিরক্ত হয়।

প্রথম প্রথম বৌদি বলত, "রিক্সায় যাবি, রিক্সায় আসবি। যদি কোনওদিন শুনি হেঁটে এসেছিস, কেটে ফেলব।" একটু দেরি হলেই খুব জেরা করত। এখন সেটা করে না। ইচ্ছে হলে কোনও কোনও দিন আবার এও বলে, "ফেরার সময় জয়শ্রী থেকে ইভনিং শোয়ের দুটো টিকিট কেটে আনিস তো।" রাধিকে সেদিন আবার বরানগরে যেতে হয় সিনেমার টিকিট কাটতে। পার্কের মাঠে ওরা প্রথম দিকে সবাই খুব অবাক হয়েছিল। সেলাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে শুনে বিভা, ইরাদের একটু হিংসেও হয়েছিল। একদিন রেবাদিই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল, "এই রাধি, তুই যখন দুকুরে বেরিয়ে যাস, তার কিছুক্ষণ পরেই মাঝেমধ্যে একটা লম্বা পানা লোক এসে ঢোকে। কে রে ?"

—ওহ্, রাধি বলেছিল, ও তো বিপ্লব দাদাবাবু। বৌদির বাপের বাড়ির লোক।

রেবাদি মুখ ভেংচে বলেছিল, "বৌদির নাগর। বাড়িতে থাকিস অথচ কিৎসু জানিস না। এই জন্যই তোকে স্কুলে পাঠাচ্ছে। তাই বলি, কাজের লোকের জন্য এত

কেন দরদ।"

রেবাদির কথা তখন রাধির বিশ্বাস হয়নি। পরে দেখেছে, খানিকটা সত্যি। দাদাবাবু বাড়িতে থাকলে বিপ্লব দাদাবাবু সাধারণত আসে না। ফোনও করে না। দুপুরে কোনওদিন ফোন এলেই বৌদি ছুটে গিয়ে ধরে। রাধিকে ধরতে দেয় না।

...সোফায় আধশোয়া হয়ে রাধি নিজের কথাই ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বারবার বৌদির কথা এসে পড়ে। বৌদির মুখেই একদিন ও শুনেছে, দাদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আঠারো বছর আগে। এখনও কোনও বাচ্চা হয়নি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে। ঠাকুরের থানে মানত করেছে বৌদি, তবুও বাচ্চা হয়নি। কোমরে মাদুলি ভর্তি। বৌদি যখন শাড়ি ছাড়ে, তখন ওই মাদুলিগুলো রাধি দেখতে পায়। এত বৌয়ের বাচ্চা হয়, বৌদির কেন হয় না— রাধি আগে বুঝতে পারত না। পার্কের আড্ডায় এ কথা বলতেই রেবাদি একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল। কেমন সব বাজে কথা বলে রেবাদি। বলে, "বৌদির দোষেই বাচ্চা হয় না।"

কাজে লাগার পর, প্রথম প্রথম রাধি লক্ষ করত, বাচ্চা দেখলেই বৌদি খুব হামলে পড়ত। খুব আদর করত। ও বাড়িতে সব সময় চকলেট, লজেন্স আনিয়ে রাখত। বছর তিনেক আগে কী যে হল, বৌদিটা একদম পাল্টে গেল। বাচ্চা-কাচ্চা আর ঘরে ঢুকতেই দেয় না। আগের তুলনায় এখন অনেক খিটখিটে হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই দাদাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে। একদিন তো রাধির সামনেই বলে ফেলেছে, "বাবা হওয়ার ক্ষমতা নেই, তুমি কেমন পুরুষ।" কথাটা শুনে দাদাবাবুর মুখটা সেদিন কালো হয়ে গেছিল।

দাদাবাবুর জন্য খুব কষ্ট হয় রাধির। আর মন খারাপ করে সন্তুদার জন্য। সন্তুদার কথা কাউকে বলেনি ও। বলবেও না। ওর জন্য মাঝেমধ্যে তীব্র টান অনুভব করে রাধি। লোকটার সব কিছু থেকেও যেন কিছু নেই। সন্তুদাকে অনেকদিন ধরেই ও চেনে। পার্কের মাঠে ওরা বল খেলত। পাঁচিল টপকে সেই বল মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ত রাধিদের রান্নাঘরে। একবার তো ডালের কড়াইতেও পড়েছিল। বৌদি রাগের মাথায় সেই বল বটি দিয়ে দু'ফালা করে দেয়। বল পড়লেই পাঁচিলে তখন সন্তুদার ঘামে ভেজা মুখটা উঁকি দিত। ইশারায় জানতে চাইত, বৌদি কোথায়? বৌদিকে ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করত। রাধি চুপি চুপি বল খুঁজে এনে তুলে দিত সন্তুদার হাতে। এটা একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দু'জনের মধ্যে। সন্তুদা বকুনি খাক, এটা মোটেই ও চাইত না। কোনওদিন হয়তো বৌদি বাড়িতে নেই। বল পড়েছে, রাধি ভয় দেখাত, ডাকব বৌদিকে?

মাঝেমধ্যে দাদাবাবু কিন্তু খুব প্রশংসা করত সন্তুদা আর শুভ্রদার। বৌদিকে বলত, "দুর্দান্ত ফুটবল খেলে এই দুটো ছেলে। জানো লালি, পেয়ারাবাগান মাঠে আজ ওদের খেলা দেখলাম। এই দুটো ছেলে খুব নাম করবে।" আবার কোনওদিন কথা উঠলে বলত, "সন্তু ছেলেটা জিনিয়াস। ঠিক মতো গাইড পেলে কেউকেটা হবে।"

জিনিয়াস কথাটার মানে রাধি বুঝত না। কিন্তু দাদাবাবুর চোখমুখ দেখে বুঝত, নিশ্চয়ই ভাল কিছু হবে।

বৌদি বলত, "ওই ছেলেটা তো কথায় কথায় হাত চালায়। কী দেখে তুমি ওর এত প্রশংসা করো, বুঝি না।"

দাদাবাবু থামিয়ে দিত, "না না, ও একটু রগচটা, তবে অসম্ভব দরদী ছেলে। শিবপুকুরের পাশে একটা পাগলি বুড়ি থাকে, দেখেছ? সন্তুকে নাকি ও ছেলে ডাকত। কাল সিঁথির মোড়ে বেচারি রিক্সার ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে ছিল। দেখলাম, সন্তু ছেলেটা একা ট্যাক্সি ডেকে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

বৌদি তবুও বলত, "ছেলেটা কেমন যেন চোয়াড়ে ধরনের। দেখলে ভয় হয়।"

দাদাবাবু হেসে বলত, "যাক, তবু কাউকে দেখে তোমার ভয় হয়।"

সন্তুদা এখন অবশ্য কখনও সখনও এ বাড়িতে আসে। বরানগরের দিকে নতুন কিছু বাড়ি করবে, ঠিক করেছে দাদাবাবু। বোধহয় পুকুর বুজিয়ে। পাড়ার ছেলেরা আপত্তি করেছে। সন্তুদার নাকি এখন খুব চেনাশুনো ও পাড়ায়। দাদাবাবুর হয়ে মধ্যস্থতা করছে। বাড়ি না করতে পারলে দাদাবাবুর নাকি লাখ দশেক টাকা নষ্ট হবে। সন্তুদাকে তাই খুব খাতির করে। সন্তুদা এলেই ও বুঝতে পারে, একজোড়া চোখ খুব নরম দৃষ্টিতে ওর পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিঁথির মোড়ে সেলাই স্কুলের আশপাশে সন্তুদাকে আজকাল প্রায়ই ও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হয় মিনি বাসের স্ট্যান্ডে, না হয় চায়ের দোকানে। চোখাচোখি হলেই মৃদু হাসে। কথা বলার উপায় নেই। কেননা রাধি তখন থাকে রিক্সায়। সন্তুদা কেন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়, এটা ভাবলেই মাঝে মাঝে ও কষ্ট পায়।

...সোফায় শুয়ে একটু তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল রাধির। হঠাৎ কলিংবেলের শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। ফাংশান কি শেষ হয়ে গেল? কটা বাজে এখন? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, সোয়া আটটা। এত তাড়াতাড়ি বৌদির ফিরে আসার তো কথা নয়। তাড়াতাড়ি শাড়িটা পরে নিয়ে, দরজার কাছে এসে ও আইহোলে চোখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বৌদি নয়, সন্তুদা! এতক্ষণ যার কথা ও ভাবছিল।

রাধি দরজা খুলে একটু অবাক হয়েই তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল; তিনতলায় সদ্য দেখে আসা কয়েকটা সিন। ঘটনাটা প্রায় একই রকম। কলিং বেলের শব্দ হল। সোনালি রঙের একটা মেয়ে উঠে দরজা খুলে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে। দু'জনের মধ্যে কী যেন কথা হল। ছেলেটা ভেতরে ঢুকল। ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। ছেলেটা আবার কী সব বলল। মেয়েটা রান্না ঘরে চলে গেল। কফির কাপ নিয়ে এসে বসল ছেলেটার পাশে। কথা হতে হতে ছেলেটা কাছে টেনে নিল মেয়েটাকে। তারপর... দু'জনে জামা-কাপড় খুলতে লাগল। সিনগুলোর কথা মনে পড়তেই রাধির বুকের ভেতরটা লাফাতে শুরু করল।

—খুকুমণিদা নেই? সন্তুদা জিজ্ঞাসা করছে। ওর মুখের দিকে রাধি তাকাতে পারল না।

কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে বলল, "নেই।"

—বৌদি?

—ফাংশানে গেছে।

—ও হো, আজও তো প্রেমজাতকের ফাংশান। তুমি যাওনি?

—না।

—বাড়িতে বসে কী করছ?

—শুয়ে ছিলাম।

—কেন, শরীর খারাপ ?

—না। এমনিই। কোনও কাজ ছিল না। এতক্ষণ পর রাধি মুখ তুলে তাকাল সন্তুদার দিকে। প্রায় দিন দশেক পর দেখছে। মুখে একগাদা দাড়ি। কেমন যেন ক্লান্তির ছাপ। শেষবার অনন্যা সিনেমা হলের সামনে যখন দেখেছিল, তখন খুব ঝকঝকে লাগছিল সন্তুদাকে।

—আমাকে একটু ঠণ্ডা জল খাওয়াবে ?

রাধির বুকটা আবার ধক করে উঠল। ক্যাসেটের সেই সিনের মতোই ঘটতে যাচ্ছে। কোনও কথা না বলে ও ভেতরে চলে গেল। ভয়ে কুলকুল করে ঘামছে। ফ্রিজ থেকে ও একটা বিসলেরির বোতল এনে দিল। বাইরে দাঁড়িয়েই ঢকঢক করে জল খাচ্ছে সন্তুদা। বোতলটা প্রায় শেষ করেই দিল।

—সেলাইয়ের স্কুলে দু'তিনদিন যাওনি কেন ? বোতলটা ফেরত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল সন্তুদা।

—বন্ধ ছিল।

—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

—বলুন।

—না, এখানে নয়। অন্য কোথাও।

রাধি অবাক হয়ে বলল, কোথায় ?

—কাল সেলাই স্কুলে যাওয়ার আগে একবার মিনি বাস স্ট্যাণ্ডে ঘুরে যেও। আমি থাকব। তারপর কোথায় যাব, সেটা পরে ঠিক করা যাবে।

—বৌদি জেনে গেলে বকবে।

—জানতে পারবে না। সন্তুদার গলায় মিনতি, প্লিজ এসো। অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

গেট দিয়ে কে যেন ঢুকছে। সেটা দেখে রাধি একটু জোরেই বলল, "ঠিক আছে, দাদাবাবুকে বলে দেব, আপনি এসেছিলেন।"

সন্তুদাকে আর কিছু বলার সুযোগই দিল না রাধি। দরজা বন্ধ করে দিল। বোতলটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে ফের এসে বসল সোফাতে। বুকের ধকধকানিটা কমেছে। উফ্, আরেকটু হলেই ক্যাসেটের মতো হতে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই ভাবল, দূর ও সব সিনেমায় হয়। টিভিতে হয়। ক্যাসেটের ওই ছেলেটার মতো সন্তুদা অত লোভিস্টি না। কই, ইচ্ছা করলে তো কোনও ছুতো করে ঘুরে ঢুকতে পারত। ঢুকল ? ফিরে এসে দাদা-বৌদি ওকে বসে থাকতে দেখলেও কিছু মনে করত না। বাড়িতে আর কেউ নেই শুনেই সন্তুদা চলে গেল।

বৌদি ন'টা-সোয়া ন'টার আগে ফিরবে বলে মনে হচ্ছে না। কুলকুল করে ঘামছিল বলে রাধি ঠিক করল, গা ধুয়ে নেবে। এ ফ্ল্যাটে দু'টো করে বাথরুম। একটা দাদাবাবুর শোয়ার ঘরের লাগোয়া। অন্যটা গেস্টদের জন্য। বৌদি নিজের বাথরুমটা রাধিকে ব্যবহার করতে দেয় না। তিন তলা থেকে এসেই, ভুল করে ও আগেরবার ঢুকে পড়েছিল বৌদির বাথরুমে। এ বার গেস্টদেরটায় ঢুকল। শাড়ি, ব্লাউজ ছেড়ে, শায়ার দড়িটা খুলে, শায়াটা বুকের ওপর বেঁধে রাখল। তারপর চুল গোছা করে

একবার বেঁধে নিল। এই বাথরুমটায়ও আয়না আছে। তবে বৌদির বাথরুমের মতো পুরো সাইজের নয়। রাধি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখল। কোমরের ওপরে একটা খাঁজ হয়েছে। আলোটা নিভিয়েই রাধি শায়ার দড়িটা আলগা করে দিল।

আজ সকাল থেকে ও এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিল। এখন আবার অন্য ধরনের উত্তেজনা। সন্তুদা কাল দেখা করতে বলল কেন? কী কথা বলতে পারে সন্তুদা। দাদাবাবু সম্পর্কে কোনও কথা? মনে হয় না। তবে কী....সন্তুদা ওকে চায়? ওর জন্যই রোজ ভরা রোদ্দুরে সিঁথির মোড়ে কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। সন্তুদা লেখাপড়া জানা ছেলে। ওর মতো লোক কেন রাধির মতো সামান্য মেয়েকে চাইবে? সিনেমায় হয়, টিভিতেও হয়। বাস্তবে হয় না। একটু আগে সন্তুদার মিনতি ভরা কথাগুলো ওর মনে পড়ল, "প্লিজ এসো, অনেক কথা বলার আছে তোমার সঙ্গে।"

এই কথা মনে হতেই রাধি, শাওয়ার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সুখ পুকুরে ভাসতে লাগল। দেশে ওদের বাড়ির কাছে একটা বড় দীঘি আছে। লোকে বলে সুখ পুকুর। দীঘির জল কাঁচের মতো স্বচ্ছ, আর খুব ঠাণ্ডা। চান করে খুব আরাম। গলা জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে রাধির খুব ভাল লাগত। চান করার সময় ঠাম্মাও সঙ্গে যেত। ভিজে কাপড়ে উঠে দাঁড়ালে, বুড়ি খুব অসভ্য অসভ্য কথা বলত।

মা তখন বাবার কাছেই থাকে। বাবাটা যাত্রার দলে অভিনয় করত। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াত। বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ আসত, ফের উধাও হয়ে যেত। বাড়িতে এলেই খটমটি লেগে যেত মায়ের সঙ্গে। মা একদিন রাগ করেই মামার বাড়ি চলে যায়। রাধিকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে সুখ বেশিদিন সইল না। বাবা একবার মামার বাড়িতে এসে খুব হম্বিতম্বি করেছিল। মামা রেগেই মাকে বলল, "তোকে আর রাখব না। যেদিক পানা ইচ্ছে তোর চলে যা।" মা গিয়ে উঠল মেসোর বাড়ি। মাসিটা বোবা। মেসোর সংসার সামলাত তাই মা। ওখানেই একটা তাঁত কলে মেসো ঢুকিয়ে দিয়েছিল রাধিকে। তারপর কীভাবে যেন যোগাযোগ হয়ে যায় এই দাদাবাবুর সঙ্গে। মেসো এ সংসারে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় রাধিকে।

প্রথম প্রথম বছরে একবার মেসোর বাড়িতে ছুটি কাটাতে যেত রাধি। কার্তিক মাসে ওখানে ফি বছর কালীপুজো হয়। লোকে পাঁঠা মানত করে। একশো আটটা পাঁঠা বলি হয়। সেই পুজো দেখতেই ও যেত। বছর তিনেক যায় না। বাবা নিরুদ্দেশ। মেসোর বাড়িতে মায়ের পেটে বাচ্চা হয়েছে। এই খবরটা শোনার পরই রাধি সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে মায়ের সঙ্গে। আগে মাকে টাকা পাঠাত। এখন পাঠায় না। মেসো একবার নিতে এসেছিল। ঘেন্নায় রাধি দেখাও করেনি। চান করতে করতেই ও একবার ভাবল, সন্তুদা যদি এ সব কথা শোনে, আর কখনও ওকে চাইবার কথা ভাববে? মোটেই না।

গা ধুয়ে শাড়ি পরতেই কলিং বেলের আওয়াজ শুনল রাধি। আই হোলে চোখ লাগিয়ে দেখল, বৌদি। পিছনে ফুল দিদিমণি আর ওর মা। দরজা খুলতেই বৌদি হাসিমুখে বলল, 'কী করছিলি? দাদাবাবু এখনও আসেনি?"

—রাধি বলল, "না।"

বৌদি বলল, "চাবিটা আমায় দে। ফুলদের ঘরে যাচ্ছি। দাদাবাবু এলে বলে দিস, ফাংশান থেকে চলে এসেছি।"

চাবি এনে দিয়ে রাধি জিজ্ঞাসা করল, "ভাত করব, না রুটি ?"

"রুটি।" বলে বৌদি ওপরে উঠে গেল। বৌদিকে খুশি খুশি দেখে রাধি নিশ্চিন্ত। অন্য সময়, একবারের বেশি দু'বার কলিং বেল টিপতে হলেই বৌদি সন্দেহের চোখে তাকাত। ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করত, "কী করছিলি, কেউ এসেছিল ?" ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করে পেটের কথা সব বের করে নিত। এখন কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। বৌদিটা যেন কেমন হয়ে গেছে।

রাধি হালকা পায়ে রান্না ঘরে ঢুকল। তিনজনকে নিয়ে সংসার। দশ-বারোটা রুটি বানালেই চলে যায়। বৌদি কখনও দু'টোর বেশি খায় না। ময়দা মাখতে মাখতে হঠাৎ রাধির ক্যাসেটের কথা মনে পড়ল। ছেলেটা এই ভাবেই চটকাচ্ছিল। কী বিচ্ছিরি ওই সব সিন। রেবাদিটা খুব বাজে। ওই জন্যই সোয়ামী নেয় না। পার্কের মাঠে একবার রেবাদি সব্বাইকে সাবধান করেছিল, "চারতলার বুড়োর কাছে তোরা যাস না। বুড়োটা শয়তান।"

মেনকা বলেছিল, "কেন গো রেবাদি ?"

রেবাদি ফিসফিসিয়ে বলেছিল, "বুড়োর বউ মারা গেছে, অনেকদিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বাইরে কোথায়। চারতলার ফ্ল্যাটে একা থাকে। যত কাজের মেয়েদিগের দিকে নজর। দু'নম্বরে একটা মেয়ে কাজ করত আগে। একদিন ছাদে লেপ শুকোতে দিতে গেছে। ঘরে ডেকে নিয়ে বুড়ো.....।

রেবাদিকে থেমে যেতে দেখে সাবাই কৌতূহলে ফেটে পড়েছিল, "কী করেছিল গো ?"

—সে আর জিজ্ঞেস করিস না। তবে দশটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছিল।

—তুমি কী করে জানলে গো ?

—রোজ দুপুরে আমাদের ঘরের পাশ দিয়েই মেয়েটা ওপরে যেত। একদিন ধরতেই সব বলে ফেলল। খবর্দার, ওই বুড়োর খপ্পরে পড়িস না।

সত্যি সত্যিই রাধি ভয় পেয়ে গিয়েছিল রেবাদির কথা শুনে। বৌদির কথায় কখনও কখনও ছাদে উঠলে, দেখে শুনে উঠত। বুড়ো আবার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাখে সব সময়। ছাদে যেতে হলে চোখে পড়তেই হবে। একবার রাধিকেও ডেকেছিল। ভয়ে নীল হয়ে গেছিল ও। কোনও রকমে পালিয়ে আসে। এসব কথা বৌদিদের তো আর বলা যায় না। উল্টে রাধিকেই দোষী ঠাওরাবে।

ওই চারতলাতেই উঠে একদিন রাধি অবাক হয়ে গেছিল বুড়োর ঘরে রেবাদিকে দেখে। টিভির অ্যান্টেনা ঘুরে গেছে কি না, তা দেখার জন্য বৌদি ছাদে পাঠিয়েছিল। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে পা টিপে টিপে উঠতেই বুড়োর ঘর থেকে ও গলা পেয়েছিল রেবাদির।

—না, আজ কুড়ি টাকা দাও।

বুড়ো বলল, "এই তো তোকে কাল দিলাম। এর মধ্যেই খরচ করে ফেললি ?"

—পার্কের মাঠে সবাইকে আইসক্রিম খাইয়েছি।

রাধির পা যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছিল। বুড়োর ঘরের দরজা আধ

ভেজা। ওদিকে উঁকি মেরেই রাধি টলে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। রেবাদির ব্লাউজের ভেতর বুড়োর হাত, কানে কানে কী যেন বলছে। বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে রেবাদি বলল, "মরণ।"

রাধি ছুটে নীচে নেমে এসেছিল। সেদিনই ও বুঝে গেছিল রেবাদি এত পয়সা কোথায় পায়। বাজে মেয়েছেলে। মুখে বলে চারতলায় যাস না, অথচ নিজে যায়। রুটি বেলতে বেলতে রাধি ঠিকই করে নিল, রেবাদির সঙ্গে আর মিশবে না। গা থেকে কুচিন্তা সরিয়ে দিল রাধি। না হলে আবার ব্রণ বেরোবে। বৌদি তাড়িয়ে দিলে, ওর যাওয়ার আর জায়গাও নেই।

রুটি সেঁকে রাধি সব কাসারোলে ভরে রাখল। তা হলে গরম থাকবে। দাদাবাবু যখনই বাড়ি ফিরুক, খেতে অসুবিধা হবে না। সকালে মাছের মাথা দিয়ে তরকারি করেছিল। ফ্রিজ থেকে বের করে, তা গরম করে রাখল। রাধি ভাবল, দাদাবাবু যদি বেশি রাত করে ফেরে, তা হলে না হয় আরেকবার গরম করে দেবে।

হাতে এখন কোনও কাজ নেই। একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্যই রাধি ঢুকল গেস্টরুমে। তাক থেকে বালিশটা নিয়ে ও উপুড় হয়েই কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল। সারা দিনে এই সময়টুকুতেই ওর অবসর। অন্যদিন বৌদি এই সময় একা একা টিভি দেখে। গেস্টরুমে শুয়েও রাধি কান পেতে রাখে ওঘরের দিকে। ডাক শুনলেই দৌড়ে যায়। আজ কেউ নেই, ও একা। উপুড় হয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ও শরীরটাকে শিথিল করে দিল। আর সেই সময় ওর মনে পড়ল সন্তুদাকে। কাল একটু সকাল সকাল সেলাই স্কুলে বেরোতে হবে। পুজোয় বৌদি যে শাড়িটা দিয়েছিল সেটা পরবে। কোথায় নিয়ে যাবে সন্তুদা? কে জানে। চোখ বুজে রাধি নরম বালিশে ঠোঁট চেপে ধরল।

.....হঠাৎ ওর ঘুম ভাঙল টুং টাং আওয়াজে। ডাইনিং স্পেস থেকে আওয়াজটা আসছে। ও একটু উঁচু হয়ে দেখল দাদাবাবু টেবলে বসে। বৌদি খেতে দিচ্ছে। বৌদির মুখটা থমথমে। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য নিজের ওপর খুব রাগ হল রাধির, ছিঃ ছিঃ। বৌদি নিশ্চয়ই কোনও কারণে খুব রেগে আছে। না হলে ওকে ডাকত।

হঠাৎ ওর কানে এল, বৌদি বলছে, "ওপরে পাঁচ নম্বরে আজ কি হয়েছে জানো?"

দাদাবাবু খেতে খেতে বলল, "কী হয়েছে?"

—কাজের মেয়েদের লাই দিলে যা হয়। ওপরের নীতিন ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট এনেছিল। তুলে রাখতে ভুলে গেছিল সুষমা। আজ ফাংশানের মাঝ পথে বাড়িতে ফিরে দেখে, ওদের কাজের মেয়েটা খাটে বসে ব্লু ফিল্ম দেখছে। ঘরে বিভা আর ইরাও ছিল। কী স্পর্ধা দেখো। জানি না, আমাদেরটাও গিয়েছিল কি না।

বৌদির কথা শুনে রাধি ফের শুয়ে পড়ল।

boiRboi.net

সিঙ্গল টু পাত্তি

সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর ওপর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনেই ট্যাক্সিটা থামাতে বলল কেলে পাঁচু। সামনের সিটে বসেছিল, উঁকি মেরে মিটারটা একবার দেখেই মনে মনে ও হিসাব করে ফেলল। তারপর পকেট থেকে পার্স বের করে ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। পিছনের সিটে বসে সন্তু আর চিতা। কেলে পাঁচুকে ভাড়া দিতে দেখে ওরা বলল, "এটা কী হল পাঁচুদা?"

দরজা খুলে কেলে পাঁচু তখন নেমে পড়েছে রাস্তায়। লজ্জিত মুখে বলল, "ওস্তাদ, আজকের দিনটা অন্তত দিতে দাও। আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি।"

পরিচয় হওয়ার পর থেকেই পেনসিলার পাঁচু, ওস্তাদ বলে স্বীকার করে নিয়েছে সন্তুকে। বেশিদিন আলাপ হয়নি। তবু লোকটাকে খারাপ মনে হচ্ছে না সন্তুর। সেদিন সাট্টা খেলতে গিয়ে পাঁচুকে ও ভালভাবে নজরই করেনি। দিনতিনেক পর হঠাৎ ও দেখা করতে আসে সিঁথির মোড়ে চায়ের দোকানে। ওর সঙ্গে বিল্লা বলে ছেলেটাও ছিল।

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ওস্তাদ।

সন্তু একটু অবাক হয়ে বলেছিল, "তোমাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

বিল্লাই মনে করিয়ে দিয়েছিল, "স্যার, এই পাঁচুদার ওখানে আপনি দিন কয়েক আগে সাট্টা খেলতে গিয়েছিলেন।"

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা তোমাদের কী দরকার।

কেলে পাঁচু বলেছিল, "একটু আলাদা হলে ভাল হত।"

—চলো। সন্তু ওদের নিয়ে গিয়েছিল চায়ের দোকানের পিছনে রামলাল আগরওয়াল লেনে চিতার নতুন ঠেকে। চিতা তখন বসে মাল খাচ্ছিল। রাত আটটার পর ও আর কোনও কাজ করে না। কেলে পাঁচুকে ওখানেই বসিয়েছিল সন্তু।

—এবার বলো।

—ওস্তাদ, সাট্টায় আসতে চাও?

—লাইনটা আগে ভাল করে বুঝতে হবে।

—ওস্তাদ, সাট্টায় এখন প্রচুর পয়সা। লাইনটা নিতে পারলে দিনে পনেরো-কুড়ি হাজার কামানো তোমার কাছে কিছুই না।

শুনে সন্তু একবার চিতার দিকে তাকিয়েছিল। পুরো বরানগরটা এখন চিতার কব্জায়। ডানলপ থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত— যত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে, প্রত্যেকটার কাছে ও তোলা তোলে। ওদের প্রোটেকশন দেয়। চিতার আসল রোজগার এটাই। এছাড়াও এ অঞ্চলে তিনটে সিনেমা হলে ও টিকিট ব্ল্যাক করায় নিজের লোক দিয়ে। পার্টির সঙ্গে কানেকশনও ভাল চিতার। পার্টির অনেক কাজ করে দেয়।

পাঁচুর প্রস্তাবটা শুনে চিতা ইশারায় কথাবার্তা চালিয়ে যেতে বলেছিল সন্তুকে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ঝগড়া মেটাবার সময় ওরা দু'জন চোখে চোখে কথা বলে নেয়

অনেক সময়। পাঁচুকে ও বলল, "বলো কী। দিনে কুড়ি-পঁচিশ হাজার?"

পাঁচু বলল, "এ তো কিছুই না। এলাকা বাড়াতে পারলে কামাই আরও বেশি ওস্তাদ।"

—কী রকম?

—মানে যার এরিয়া যত বড়, তার ইনকাম তত বেশি। বউবাজারের রশিদ খানের ইনকাম ছিল দিনে কয়েক লাখ।

—বরানগর এরিয়াটা কার?

—কারও নেই ওস্তাদ। কাশীপুর থেকে বাবুলাল এ-সব অঞ্চলে ঠেক চালাত। ও এখন পুলিশের কব্জায়। এই এরিয়া এখন খালি আছে। এখন নিতে পারলে, কেউ আটকাতে আসবে না।

মালে চুমুক দিয়ে চিতা এবার বলেছিল, "সাট্টা খুব বাজে লাইন। ওপারের গোখনা একবার আমাকে সাট্টার কথা বলেছিল। আমি রাজি হইনি।"

কেলে পাঁচু জিজ্ঞাসা করেছিল, "গোখনাকে আপনি চেনেন স্যার? ওটা একটা হারামির গাছ।"

চিতা বলেছিল, "এক লাইনের লোক, ওকে চিনব না? আগে আমাদের পার্টি করত। এখন অন্য পার্টিতে।"

—গোখনার দিন শেষ, স্যার। আমার কাছে খবর আছে, পুলিশ ওকে ফাঁসাবে। ওর এরিয়াটাও ফাঁকা হয়ে যাবে।

সন্তু বলেছিল, "তুমি কার সাট্টা চালাও?"

—গোখনার, ওস্তাদ। তবে ঠিক করেছি আর ওর কাজ করব না।

—কেন?

—টাকা পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করছে। বড়বাজার আর বোম্বের লোকেরা ওর ওপর খচে আছে। বেআইনি সাট্টা চালাচ্ছে দিনে তিন চারবার। নাম দিয়েছে দমদম সাট্টা। ও খুব শিগ্গীর গাড্ডায় পড়বে।

—গোখনার আণ্ডারে ক'জন পেনসিলার আছে?

—তা, চোদ্দ পনেরোজন তো বটেই।

—হুঁ, তা, এই লাইনে হুজ্জত কী আছে?

—হুজ্জত করে তোমার সঙ্গে কে পারবে ওস্তাদ। শুধু পুলিশকে ম্যানেজ করতে হবে, ব্যস।

—আর পার্টির লোকজন?

—ওরা মাথা ঘামায় না ওস্তাদ। ফান্ডে কিছু দিলেই হয়। আর নেতাদের বাড়িতে কিছু ভেট।

চিতা ওদের কথাবার্তা শুনছিল। বলল, "না রে, সব জায়গায় এক না। এখানকার পার্টির লোকজন নাও পছন্দ করতে পারে।"

—কী বলছেন স্যার। কেলে পাঁচু বলেছিল, "গোখনা তো টাট্টির মধ্যে টাকা গুঁজে রাখলেও, পার্টির লোক সেই টাকা তুলে নিয়ে যায়।"

এই কথাটা শুনে চিতা খুব হেসে উঠেছিল। ও সন্তুকে বলেছিল, "সাট্টার ব্যাপারটা টোটালি ফ্রড।"

—ফ্রড তো বটেই। একদিন খেলেই সেটা বুঝেছি। আর কোথাও শুনেছিস... বাজির নয় ভাগ টাকা বুকির, একভাগ মাত্র যে খেলছে তার। এটা প্রোপোরশন হল ?

পাঁচু বলেছিল, "ও তো পাল্টারের কথা বলছ ওস্তাদ, বুকির কথা ভাবো।"

সন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "পুরো সেট আপটা কী, তোমার আইডিয়া আছে ? ওটা না জেনে আমি নামব না।"

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে গণ্ডগোল মেটানো, জমি বা দোকান ঘর দখলে সাহায্য করে গত কয়েকদিনে ও হাজার দশেক টাকা রোজগার করেছে। এই লাইনটাও খারাপ না।

ওই সময় পাঁচু বলেছিল, "আমার জানাশুনা একজন থাকে কলাবাগানে। সূরজ চাচা। খুব পুরনো লোক সাট্টা লাইনে। ওর কাছে গেলে হেল্প পাওয়া যেতে পারে।"

... সেই চাচার কাছেই ওরা তিনজন এসেছে আজ সকালে। পাঁচু বলেছিল, খুব সকালের দিকে না এলে নাকি ওর সূরজ চাচাকে ধরা যাবে না। ট্যাক্সি থেকে নেমেই ওরা তাই পুবদিকের গলি ধরে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। পাঁচু আরও বলেছিল, সাট্টা চালাতে গেলে এমন একজনকে দরকার, যার সঙ্গে বোম্বের লোকেদের সরাসরি যোগাযোগ আছে। সূরজ চাচা সেই লোক। তবে বউবাজারের রশিদ ধরা পড়ার পর থেকে চাচা এসব নিয়ে কথা বলতে চায় না।

সন্তু কোনওদিন কলাবাগানে আসেনি। আসার দরকারও পড়েনি। চারপাশে খোলার বস্তি। মার্কাস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সন্তু দেখল, একদল ছেলে ফুটবল খেলছে। একটা ছেলে ভাল ইনসাইড ডজ করে পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকল। শট নিলেই কিন্তু গোল হত। ওই জায়গাটা থেকে আগে প্রচুর গোল করেছে সন্তু। সকালের দিকে এই সময়টা তখন কী সুন্দর ছিল। ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবে প্র্যাকটিস করে একসঙ্গে ফিরত ও আর শুভ্র। শুভ্রের কথা মনে হতেই সন্তু ঠিক করল, রাতের দিকে একবার ফোন করবে ওকে। বিদ্যাসাগর ট্রফির ফাইনালে কী হল, তা জানার জন্য।

মার্কাস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকে, একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল কেলে পাঁচু। রাস্তার ধারে ছোট জানলা। সেখানে গিয়ে ও ডাকল, "সূরজ চাচা।"

কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর লুঙি আর পাঞ্জাবি পরা একজন লোক এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। বয়স ষাটের কাছাকাছি। চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছে লোকটার। মনে হয় হাত-মুখ ধুচ্ছিল। হাতে একটা ঘটি। লোকটার চৌকো মুখের গড়ন দেখে সন্তুর মনে হল, এক সময়ে দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল।

কেলে পাঁচুকে চিনতে পারলেও, লোকটা তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা করল না। বাকি দু'জন অচেনা বলে হয়তো। সেটা বুঝেই পাঁচু আশ্বস্ত করল ওকে, "আরে, এরা আমার দোস্ত। এর নাম চিতা আর এর নাম সন্তু। একটা দরকারে এসেছি।"

একটু পরে লোকটা বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর পাশের বস্তির ভিতর দিয়ে নিয়ে এসে বসাল ওই ঘরটায়। একটা টেবল আর কয়েকটা চেয়ার পাতা ঘরটায়। আর কোনও আসবাব নেই। দেওয়ালে বজরঙ্গবলীর বিরাট ছবি। তার ভিতর ঘড়ি।

সন্তু দেখল পৌনে আটটা বাজে। মানে, সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি টাইম আছে। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় রাধির আসার কথা সিঁথির মোড়ে।

—চা ইয়া কোফি। সূরজ চাচা জিজ্ঞাসা করল পাঁচুকে, "তোর তো কোনও খবরই নেই বেটা। এখনও লাইনে আছিস?"

—হাঁ চাচা, কাঁধে একটা কিটব্যাগ নিয়ে এসেছিল পাঁচু। সেটার চেন খুলে ও অ্যারিস্টোক্র্যাটের দু'টো বোতল বের করল। সে দু'টো টেবলের ওপর রেখে ও বলল, "চাচা, আমাদের ওখানে এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক কাল এগুলো পাঠিয়েছিল। তোমার জন্য নিয়ে এলাম।"

খুব খুশি হল সূরজ চাচা। বোতল দুটো টেবলের ড্রয়ারে রেখে বলল, "বল বেটা, তোদের জন্য কী করতে পারি।"

পাঁচু বলল, চাচা, "আমাদের ওখানে সাট্টার ভাল বাজার আছে। সিঁথি মোড় থেকে বেলঘরিয়া পর্যন্ত। মেহেরবানি করে যদি তুমি আমাদের সাহায্য করো, আমরা ওই বাজারটা নিতে পারি।"

সূরজ চাচার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দাড়িতে হাত বুলিয়ে ও বলল, "বেটা, আমি তো ও লাইনটা ছেড়ে দিয়েছি।"

সন্তুদের সামনে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল পাঁচু। অসহিষ্ণু গলায় ও বলল, "আরে, সাট্টার লাইনে তোমাকে টানতে আসিনি। লাইনটা এরা তোমার কাছে জানতে চায়।"

সূরজ চাচা বলল, "বহুত বুড়া লাইন। বেটা তোদের তো দেখে ভদ্দরলোকের ছেলে মনে হচ্ছে। কেন এ লাইনে আসবি।"

সন্তু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "মাল কামাতে।"

ওর বলার ধরনে সূরজ চাচা একটু অবাক হলেও, মুখে বলে, "বহুত হুজ্জত। তোরা এখন সামলাতে পারবি না। রশিদ খান সব চৌপাট করে দিয়েছে।"

পকেট থেকে কয়েকটা শ' টাকার নোট বের করে সন্তু বলল, "ভ্যানতাড়া না করে লাইনটা জলদি বাতলাও। আমার সময় কম। বোম্বের লোকেদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও।"

টেবলের ওপর নোটগুলো দেখে চকচক করে উঠল সূরজ চাচার চোখ। সেগুলো তুলে পাঞ্জাবির পকেটে চালান করে দিয়ে বলল, "দিন কাল খুব খারাপ বুঝলি বেটা। শালা পুলিশের লোক পিছনে লেগে আছে। শালা মুখার্জি বলে একজন অফিসার এসেছে, আমাদের খুব জ্বালাচ্ছে। তোরা যখন জানতে চাইছিস, তখন বলি। চালিশ-পচাশ বছর আগে আমরা কলাবাগানে হাড়িয়া চালু করেছিলাম। সেটা কী জানিস? হাঁড়ির ভিতর তাস রেখে দিতাম। যারা বাজি ধরতে আসত, তাদের পাঁচটা নাম্বার বলতে হত। ধর, তিন পাঁচ আট নয় আর শূন। খেলাটা হত সবার সামনে। হাঁড়ির ভিতর থেকে আমরা তিনঠো তাস তুলতাম। ওই পাচঠো নাম্বারের মধ্যে যদি এই তিনঠো নাম্বার মিলত, তা'লে পাণ্টাররা পয়সা পেত। যত পয়সা খেলত, পেত তার পাঁচগুণ। বোম্বাই মটকা এসে যাওয়ার পর, শালা ইতনা বদ কিসমত, হাঁড়িয়া বন্ধই হোয়ে গেল।"

সন্তু বলল, "মটকা নাকি বললে, ওটা কী?"

সূরজ চাচা দাড়ি মুচড়ে বলল, "বেটা, সাট্টা আর মটকা একই জিনিস। এসব আমার চোখের সামনে হল। এই যে বউবাজারের রশিদ, টালিগঞ্জে লালবাবা, ভওয়ানিপুরে কামতাপ্রসাদ, বড়বাজারের বিহারী— সবাই আমার চোখের সামনে পয়দা হল। সাট্টার হিস্ট্রি আমার চে আর বেশি কেউ জানে না। ওই গিধধরগুলো কেউ তোদের বলতে পারবে না। তখুন বোম্বাইয়ের কটন মার্কিট, কটন বুঝিস তো... তুলো... খুব তেজি ছিল। সকাল দশটায় যখুন মার্কিট ওপেন হত, তখুন কটনের ভাঁও ধর, থাকত দু'শো পঁচিশ রুপিয়া। সারাদিন ভাও চড়তেই থাকত। মার্কিট ক্লোজ হওয়ার সময় হয়তো সেটা গিয়ে দাঁড়াত দু'শো চালিশ রুপিয়ায়। পরদিন মার্কিট ওপেন হওয়ার সময় কটনের ভাও কত হোবে, সেটা নিয়ে জল্পনা হত। পরদিন হয়তো ওপেন হত দু'শো সাতাশ রুপিয়ায়, ক্লোজ দু'শো বিয়াল্লিশে। কোনও কিছু ঠিক থাকত না। কটন মার্কিটে ভাও নিয়ে সে সময় মটকা চালু হল। ওপেন আর ক্লোজ— সকাল আর সন্ধ্যা দু'বার খেলা। কটনের ঠিক ভাও বলতে হবে। যারা বলতে পারবে, তারা বাজি জিতবে।"

সন্তুর ভাল লাগছিল সাট্টার ইতিহাস শুনতে। রশিদ খানের সেই কেসটার সময় অনেক কথা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। সেসময় সাট্টা নিয়ে এত সত্যি-মিথ্যা খবর বেরোত যে, পরের দিকে পড়তে আর উৎসাহ বোধই করত না।

সূরজ চাচা পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের একটা প্যাকেট বের করে, সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, "বোম্বেতে যারা পয়সা লাগাত, তারা একদিন ধরে ফেলল, মার্কিটের ব্যওসায়ীরা খচরামি করছে। আগের দিন রাতে, নিজেরা একসঙ্গে বসে আগে থেকে ওপেনিং ভাও ঠিক করে রাখছে। পরদিন সকালে বাজি খেলে রুপিয়া কামাচ্ছে। মটকাওয়ালারা এটা ধরে ফেলল। তখুন ঠিক করল, মার্কিটের সঙ্গে আর কানেকশন রাখবে না। নিজেরাই মটকার নতুন নিয়ম বের করল। তাস তুলে নাম্বার বের করার। খেলা সেই রইল ওপেন আর ক্লোজ। তবে টাইম বদলে দিল। সকালে ওপেন খেলাটা ঠিক হচ্ছিল না। লোকে অফিস-কাছারি করে, ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে— খেলার টাইম পাচ্ছে না। তার চে, দু'টো খেলাই রাতে হোক। ওপেন রাত ন'টায়, আর ক্লোজ রাত বারোটায়। না হলে সাট্টা বাড়ানো যাবে না। লোকগুলোর দিমাক দেখ, বেটা।"

সন্তুর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। ও বলল, "এই যে তাস তুলে তিনটে নাম্বার বের করে, সেটা করে কারা?"

সূরজ চাচা বলল, "সেটা জানি না বেটা। কেউ জানে না। খেলাটা যেই বোম্বাইয়ে হল অমনি খবর চলে এল বড়বাজারে। সব হট লাইনে বাতচিত হয়। কলকাতায় আমরা নাম্বার জানতে পারি, বড়বাজার থেকে। বড়বাজারের নাম্বার বুকির কাছে থাকে। ফোন করলেই ওপাশ থেকে বলে দেয়। নাম্বার বলেই ফোন রেখে দেবে। আর কোনও কথা বলবে না। শুধু বলবে ফিগার আট, পাত্তি এক-তিন-চার। ব্যস, আর কিচ্ছু না।"

ফিগার, পাত্তি— এই কথাগুলো সন্তু আগেই শুনেছিল বিল্লার কাছ থেকে।

ও বলল, "খেলাটা একটু বোঝাও তো চাচা।"

সূরজ হেসে বলল, "আমার এই ভাতিজা তোকে বলেনি? তোরা তো তা'লে কিছুই

জানিস না। চালাবি কী করে?"

এই সময় বারো-তেরো বছর বয়সী একটা মেয়ে ট্রেতে চা নিয়ে এল। সন্তু নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস তুলে নিল। প্রত্যেকেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চিতা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। হঠাৎ সন্তুকে দেখিয়ে বলল, "আমার এই দোস্ত লেখাপড়ায় খুব ভাল। ও চট করে সব বুঝে নেবে।"

একথা শুনে সন্তু মৃদু হাসল। তা দেখে সুরজ চাচা বলল, "আরে বেটা এ সব চালাবার জন্য পণ্ডিতজি হওয়ার দরকার নেই। ফিগার হল একটা নাম্বার। এক-দো-তিন। আর পাত্তি তিনটে নাম্বার। কম থেকে বেশি। যেমন একশো তেইশ, একশো চবিশ। প্রথমে এক, তারপর দুই, তারপর তিন বা চার। চারশো একুশ কিন্তু পাত্তি হবে না। ওটা হয়ে গেল বড় থেকে ছোট নাম্বার। কী বেটা দিমাকে কিছু যাচ্ছে?"

সন্তু ঘাড় নাড়ল, "বলে যাও।"

—ধর, সাট্টা খেলা হওয়ার সময় বুকি তিনটে তাস তুলল, চার তিন আর সাত। লেকিন পাত্তি ৪৩৭ হবে না। বুকি পাত্তি সাজাবে এইভাবে ৩৪৭। এবার পাত্তির তিনটে নাম্বার যোগ দিয়ে ফিগার বের করবে। তিন চার সাত যোগ দিলে হয় চৌদা, এক চার। ফিগার হবে সবসময় ডানদিকের নাম্বার। এখানে চার। বুঝলি বেটা।

চিতার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ও তাকাল সন্তুর দিকে। সন্তু ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি।"

"ঝুট।" সুরজ চাচা বলল, "বল তো... একটা ফিগারে ক'টা পাত্তি বেরোতে পারে। যদি বলতে পারিস, বেটা একটা বোতল তোর।" বলে ড্রয়ার থেকে একটা বোতল বের করে টেবলে রাখল।

সন্তু মনে মনে দ্রুত হিসাব করছিল। বলল, "বাইশটা পাত্তি।"

সুরজ চাচা লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে, "সাব্বাস বেটা, বহুত খুব। পাঁচু, তুই সাচ্চা সোনা নিয়ে এসেছিস আমার কাছে। দেখি বেটা, তোর দিমাক কেমন পরিষ্কার। ধর, পাত্তি পাঁচ নাম্বারের। তা'লে একটা ফিগারে ক'টা পাত্তি বেরোবে?"

সন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বলে দিল, "পাঁচ সংখ্যার দশটা, ছয় সংখ্যার কুড়িটা, সাত সংখ্যার পঁয়ত্রিশটা, আট সংখ্যার ছাপ্পান্নটা...।"

—ব্যস, ব্যস বেটা। তোর হবে। সুরজ চাচা বোতলটা ঠেলে দিল সন্তুর দিকে। "এটা তোর।"

সন্তু বোতলটা ফের ঠেলে দিয়ে বলল, "আমি খাই না। তুমি রেখে দাও।"

—খুব ভাল, বহুত আচ্ছা। মাল খাবি না। কাঁচা পয়সা হাতে এলে বহুত দোষ এসে যায়। মাগিবাজিও করবি না। চাচার উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে হঠাৎ। আবার বলল, "খাতা-পেন সঙ্গে আছে?"

শুনেই কেলে পাঁচু কিটব্যাগ থেকে সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেন বের করল। সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ওস্তাদ, তুমি লেখো।"

সুরজ চাচা সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছে। বলল, "একদিকে লেখ ওপেন। খেলা দু'টো, ফিগার আর পাত্তি। অন্য দিকে লেখ ক্লোজ। খেলা চারটে। জুড়ি, পাত্তি টু ফিগার, ফিগার টু পাত্তি, আর পাত্তি টু পাত্তি। কী বেটা লিখছিস?"

সন্তু নোট নিচ্ছিল। ওর একবার হাসি পেল। কলেজে নোট নিত প্রফেসরদের। আর এখানে নিচ্ছে সূরজ চাচার। ও দ্রুত একবার হিসাব করতে চাইল, জীবনের কত বছর ফালতু নোট নিয়েছিল।

সূরজ চাচা সোৎসাহে খেলাগুলো বোঝাতে যাচ্ছিল। থামিয়ে দিল পাঁচু, "আর, এসব তো বাচ্চা ছেলেও আজকাল জানে।"

সন্তু বলল, "তবুও শুনি। তুমি বলে যাও চাচা।"

—যেমন মর্জি। সূরজ চাচা অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে বলল, "পাণ্টাররা ইচ্ছে করলে ওপেন আর ক্লোজ দুটোই খেলতে পারে। ধর, তুই আজ ওপেনে পাত্তি লাগালি ২৩৫, ফিগারে শূন। বোম্বে থেকে খেলার রেজাল্ট এল। তোর পাত্তি আর ফিগার—দুটোই মিলে গেল। টাকা পেয়ে গেলি পেনসিলারের কাছ থেকে। এবার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ক্লোজও খেলতে পারিস। ধর, ফিগারে খেলেছিস শূন। এবার ক্লোজে ফিগার দিলি পাঁচ। যদি সত্যিই পাঁচ ওঠে তা'লে তুই বেটা জুড়ি মিলিয়ে ফেললি। আগেরটাতে মিলিয়েছিলি, পরেরটাও মেলালি। চার আনা খেললে জুড়িতে পাবি কুড়ি টাকা চার আনা।"

সন্তু মন দিয়ে শুনছিল,। জিজ্ঞাসা করল, "জুড়ি তো বুঝলাম, পাত্তি টু ফিগারটা কী চাচা?"

—এটাও এক ধরনের বাজি বেটা। ধর, আগের হিসাবেই, ওপেনে পাত্তি খেলেছিলি ২৩৫। ক্লোজে ফিগার খেললি পাঁচ। দু'টোই মিলে গেল। দু'ঠো মিলিয়ে হল পাত্তি টু ফিগার। চার আনা খেললে তুই পাবি ২৭৫ রুপিয়া। এর ঠিক উল্টো হল ফিগার টু পাত্তি। তাতে পাবি ওই ২৭৫ রুপিয়া।"

—আর পাত্তি টু পাত্তি?

—সব থেকে বেশি রুপিয়া। এক রুপিয়া খেললে পাবি আট হাজার রুপিয়া। এই খেলাটায় তোকে ওপেনে পাত্তি মেলাতে হবে, ক্লোজেও। তবে এই বাজি লোকে জেতে খুব কম।

সন্তু এবার আসল কথাটা পাড়ল, "তাস তোলার সময় কোনও কারচুপি হয়?"

—হিন্দিমে বোল বেটা। কারচুপি কী আছে?

কেলে পাঁচু বলল, "মক্করি।"

সূরজ চাচা ইতস্তত করে বলল, "এ বাত জানতে চাস না বেটা। মটকার লোক বহুত খতরনাক লোক। এখানে ওরা কে বি সাট্টা চালায়। সব ঝুট মুট নাম্বার বেরোয়। তোদের এ বাত বোলে দিলে হারামিরা আমাকে খুন করে দিবে।"

চিতার দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "তাস তোলার সময়, আমার মনে হচ্ছে হাতের খেল হয়।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে, গলা নামিয়ে সূরজ চাচা বলল, "তুই বহুত সমঝদার লেড়কা। খেলাটা আসলে হয়ে যায়, সিজারিংয়ের সময়।"

চিতা বলল, "সিজারিংটা কী চাচা?"

—আরে, তোরা যাকে শাফল্ করা বলিস। খেলার আগে চালিশ তাস ওরা সিজারিং করে নেয়। ইয়াদ রাখবি, চালিশ তাস, বাহান তাস নয়। ছবিওয়ালা তাস, মতলব... বিবি গোলাম আউর সাহেব বাদ দিয়ে রাখে। এ বার চালিশ তাস বোর্ডে

সাজিয়ে রাখল। উসকা বাদ, পাবলিককে বলল দু'টো তাস তুলতে। পাবলিক হাত দিয়ে উঠাতে পারবে না। একটা ডাণ্ডা দিয়ে দেখিয়ে দেবে। বুকি ওই দু'ঠো তাস উল্টে সবাইকে দেখাবে। এবার তিসরা তাস তুলবে বুকির আপনা আদমি। সেই তাস ওল্টানো হবে খেলার শেষে।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল সন্তু। চাচা যেভাবে তাস তোলার কথা বলছে, তাতে অনেক জোচ্চুরি আছে। ও বলল, "চাচা এ বার বুঝেছি। আসলে পাবলিক-টাবলিক কেউ থাকে না। বুকির লোকেরাই পাবলিক সেজে দাঁড়ায়। ওরা আগে দেখে নেয়, কোন পাত্তি সব থেকে কম লোকে খেলেছে অথবা খেলেইনি। সেই তিনটে নাম্বারের তাসই ওরা তোলে।

সুরজ চাচা হেসে বলল, "সবই তো বুঝছিস।"

সন্তু হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল; "ঠিক আছে চাচা, আজ আমরা উঠি। তোমার কাছে কাল-পরশু আরেকবার আসব। বোম্বের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও আমাদের। ফোকটে করতে হবে না। মাল পাবে।

চাচাকে সুক্রিয়া জানিয়ে ওরা তিনজন বেরিয়ে এল। কেলে পাঁচু আর সন্তু পাশাপাশি হাঁটছে। ও বলল, "ওস্তাদ, শুরু করে দাও। আমি সামলাব। পেনসিলার জোগাড় করার দায়িত্ব আমার। বাজার থেকে গোখনাকে হাটাও।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। প্রায় ন'টা বাজে। হাতে খুব বেশি সময় নেই। সন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠল সিঁথির মোড়ে ফেরার জন্য। ও চায় না, রাধি এসে দাঁড়িয়ে থাকুক। চিতার নতুন ঠেকে চান-টান করার ব্যবস্থা আছে। সাড়ে এগারোটার মধ্যে যে করেই হোক, মিনি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই হবে।

মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রসিংয়ে পৌঁছেই চিতা বলল, ধর্মতলার দিকে আমার একটু দরকার আছে। আমি ওদিকে চললাম।

কেলে পাঁচু যাবে বাগনানের দিকে। ও ট্রাম ধরে স্টেশনে যাওয়ার জন্য উল্টো দিকে চলে গেল। সন্তু এসে দাঁড়াল সিনেমা হলটার সামনে। এই সিনেমা হলটায় আজ পর্যন্ত ও ঢোকেনি। অবাঙালিদের ভিড়ই বেশি। কাউন্টার খুলেছে। ব্ল্যাকারদের ঠেলাঠেলি দেখতে লাগল সন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর মাথায় একটা আইডিয়া এল। রাধিকে নিয়ে এখানে এলে কেমন হয়? এই ধরনের সিনেমা হল খুব নিরাপদ। সিঁথি অঞ্চলের কেউ এ সব হলে সিনেমা দেখতে ঢুকবে না। ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সন্তু একবার ভাবল, নুন শো-র দু'টো টিকিট কিনে নিয়ে যাবে কি না। পরক্ষণেই ভাবল, রাধির সঙ্গে কথা বলা দরকার। এটা সে জায়গা নয়।

অফিস টাইমের ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করেও সন্তু পারছিল না। এ দিকের ভিড় অবশ্য শ্যামবাজার পর্যন্ত। তারপর ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। বাসেও শ্যামবাজার চলে যাওয়া যায়। কিন্তু দেরি হবে। সন্তুর হাতে টাইম নেই। চড় চড় করে রোদ্দুর উঠছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তু একটু ছায়া খুঁজল। কিন্তু পাতাল রেলের কাজ চলছে, রাস্তা থেকে ফুটপাত উধাও। উপায় না দেখে সন্তু উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল।

মহাজাতি সদনের উল্টো দিক দিয়ে হাঁটার সময় ওর সামনে ঘ্যাচ্ করে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। চমকে উঠে তাকাতেই ট্যাক্সির ভিতর একটা সহাস্য মুখ দেখতে পেল।

মুখটা চেনা, কিন্তু চট করে ও মনে করতে পারল না।

—এই শালা জন্তু, যাবি কোথায় ?

ডাক শুনেই সন্তু বুঝতে পারল। লোকটা কে। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোকই ওকে ওই নামে ডাকে। কানাই সাহা। স্কুলে এক সঙ্গে পড়ত। বহুদিন পর ওই নামটা শুনে ও হেসে ফেলল। একটু নিচু হয়ে বলল, "সিঁথি মোড়ে।"

—তা হলে চলে আয়। দরজা খুলে দিল কানাই। আমি ডানলপের দিকে যাচ্ছি।

ট্যাক্সির ভিতর উঠে সন্তু নিশ্চিন্ত বোধ করল। যাক, ঠিক সময়ে পৌঁছনো যাবে। ভদ্রতা করে একবার বলল, "তুই এত সকালে এদিকে ? চিড়িয়ামোড়ে থাকতিস না ?"

—অনেক দিন আগে চিড়িয়ামোড় ছেড়েছি। এখন ভবানীপুরে থাকি। ফ্ল্যাট কিনেছি।

—বহু বছর বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। কী করছিস ?

—সে রকম কিছু না। কন্ট্রাক্টরি। স্কুল ছাড়ার পর বাপ শালা বসিয়ে দিল নিজের পাউরুটি কারখানার ক্যাশ কাউন্টারে। ও সব কী আমার পোষায় রে ? তোরা কলেজে ঢুকলি। আর আমি হাঁ করে তোদের দেখতে লাগলাম। বাপের কারখানা ছেড়ে কনস্ট্রাকশন লাইনে ঢুকলাম। যা হোক, এখন বেশ চলে যাচ্ছে। তুই কী করছিস রে জন্তু ?

ওর মুখে আবার জন্তু নামটা শুনে সন্তু হেসে ফেলল। তারপর বলল, "তুই আর বদলালি না। ... এখন কিছুই করছি না রে। সবে মাস্তানি লাইনে ঢোকার চেষ্টা করছি।"

কানাই বলল, "চেষ্টা করে যা। ওটা তোরই লাইন। খুব উন্নতি করবি। লেখপড়া জানা ছেলে তো এই লাইনে বেশি যায় না। তা, কোন এরিয়ায় চেষ্টা করছিস ?"

সন্তু বলল, "বরানগরের দিকে।"

—ফার্স্ট ক্লাস, ওই এরিয়ায় মাস্তান এখন কম। ছোটবেলায় কম মাস্তানের নাম শুনতাম ? কেলেবাবু, কাটা অমল, ল্যাংড়া মানিক... কত সব নাম। সে সব মাস্তান এখন কোথায় ? এ লাইনেও স্ট্যান্ডার্ড পড়ে গেছে। এখন শালা, লিকলিকে খ্যাংরা কাঠি... সেও পার্টির দাদাদের কল্যাণে মাস্তানি করে খাচ্ছে।

হাসতে হাসতেই সন্তু একবার তাকাল কানাইয়ের দিকে। এই বয়সেই বেশ মুটিয়ে গেছে। পরনে সাদা সাফারি, কোলের ওপর রাখা দামি একটা ব্রিফকেস। আঙুলে পাঁচ ছয় ধরনের স্টোন দেখতে পেল সন্তু। ক্লাসেব সব থেকে ওছা ছেলে ছিল এই কানাই। তবে খুব দিলদরিয়া টাইপের ছিল। প্রায় দিন টিফিনের সময় নানা রকম জিনিস এনে খাওয়াত। শুভ্র দু'চোখে দেখতে পারত না এই ছেলেটাকে। একবার, বোধহয় ক্লাস টেনে, সন্তু প্রচণ্ড মারধোর করেছিল লাইনের ওপারের একটা ছেলেকে। কারণটা অতটা এখন আর মনে নেই। সকালে মেয়েদের স্কুল হত। মেয়েরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঢুকত ছেলেরা। ওই সময় স্কুলের একটা মেয়েকে বোধহয় টিটকিরি মেরেছিল লাইনের ওপারের ছেলেটা। লাইনের ওপারে সব রিফিউজি কলোনি। কেউ ওখানকার ছেলেদের ঘাটাত না। তাই রাতারাতি হিরো বনে গিয়েছিল সন্তু স্কুলে। মারপিটের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল এই কানাই। ক্লাসে ও গল্প করেছিল, "সন্তুর গায়ে মাইরি জন্তুর জোর।" সেই থেকে ও জন্তু বলেই ডাকতে শুরু

করে।

—তোর কথা প্রায়দিনই আলোচনা হয় আমার বাড়িতে।

কানাইয়ের কথা শুনে সন্তু একটু অবাকই হল। তারপর বলল, "আমার কথা ? তোর বাড়িতে ?"

—হ্যাঁ, তোর হয়তো মনে নেই, স্কুলে থাকতে যে মেয়েটাকে বাঁচাতে একদিন তুই মারপিট করেছিলি, সে এখন আমার ওয়াইফ।

—তাই নাকি ?

—ইয়েস। তখন থেকেই তো ওর পিছনে লাইন মারছি। ওরা থাকত পথিক সঙ্ঘের কাছে। স্কুল ছাড়ার পর বাবার কারখানায় যখন ঢুকলাম, ও বলল বিয়ের জন্য বাড়িতে চাপ দিচ্ছে। বাবার অমতেই রেজিস্ট্রি করে ফেললাম, বুঝলি। যাক গে, এখন কিন্তু মাঝেমধ্যেই ও তোর কথা বলে। সন্তু তুই না প্যাঁদালে হয়তো ওই ছেলেটা একদিন জোর করেই লাইনের পারে তুলে নিয়ে যেত ওকে। একদিন আয় না আমার বাড়িতে। সবিতা মাইরি আর সে রকম দেখতে নেই। এখন অনেক সেক্সি হয়েছে।

এই হচ্ছে আসল কানাই। সন্তুর খুব হাসি পেল শেষ কথাটা শুনে। সবিতা নামের মেয়েটাকে কখনও দেখেছে বলে ও মনে করতে পারল না। ক্লাস নাইন-টেনেই কানাইটা এক নম্বর মাগীবাজ ছিল। পয়সাওয়ালা ব্যাপের ছেলে, ওর চালচলনই ছিল অন্য রকম। সন্তুর মনে পড়ল, কানাইয়ের সঙ্গে একবার ও ছানাপট্টির মাগীপাড়ায় ঘুরতে গিয়েছিল। কী কারণে যেন সেদিন হাফ ছুটি হয়ে গেছিল। কানাই আর ও দমদম রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকেছিল ছানাপট্টির নিষিদ্ধ পাড়ায়। ওখানে মেয়েদের অদ্ভুত সাজ দেখে সন্তু খুব অবাক হয়ে গেছিল। কেউ শুধু শায়া-ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটু অবধি শাড়ি তুলে বসে। একজন আবার ভর দুপুরে বারান্দায় উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছিল। কানাই অবলীলায় বলেছিল, "বাপ শালা, এদের কারও কাছে আসে জানিস। মার সঙ্গে একদিন ঝগড়া হচ্ছিল, আমি শুনেছি। মাগীটাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।" বলেই কানাই এক চোট হেসেছিল।

ছানাপট্টির সেই বস্তির অলিগলি দিয়ে আসার সময় একটা অল্পবয়সী মেয়ে হাত ধরে টেনেছিল কানাইয়ের।

—এসো না গো, বেশি দিতে হবে না। দু' টাকা।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিল কানাই, "এই ও ডাকছে, যাব ?"

সন্তু কড়া ধমক দিয়ে ওকে টেনে এনেছিল, "তুই একদম গাধা। এদের সঙ্গে করলে রোগ হয়।"

—কেন, বাবার তো হয়নি।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে, ওইসব দিনের কথা ভেবে সন্তু একবার মুচকি হাসল। ট্যাক্সিটা রাজবল্লভ পাড়া পেরিয়ে গ্যালিফ স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই সিঁথি মোড় পৌঁছে যাওয়ার কথা। অবশ্য যদি টালা ব্রিজে জ্যাম না থাকে। কানাইকে ও জিজ্ঞাসা করল, "ভবানীপুরে তুই থাকিস কোথায় ?"

—সংঘশ্রী পুজো যেখানে হয়, তার ঠিক পিছনে। ওখানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেখিয়ে দেবে। তোকে আমার একটু দরকারও আছে।

—কী ব্যাপার রে ?

—মাল কামাবি ?

—কীভাবে ?

কানাই বলল, "তোদের বরানগরের দিকে কয়েকটা রাস্তা চওড়া করার ডিসিশন নিয়েছে পি ডবলু ডি। দু'পাশে বেশ কিছু পুরনো বাড়ি ভাঙা পড়বে। গরমেন্ট অবশ্য বাড়ির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেবে। বাড়িগুলো ভাঙার কন্ট্রাক্ট নিচ্ছি আমি। এখনও পাইনি, তবে মনে হচ্ছে পেয়ে যাব।

বাড়ি ভাঙার পর যে সব স্ক্রাপ বেরোবে, সেগুলো পরে নিলাম হবে। অকশন মানেই, গা জোয়ারি। যার মাসল্ পাওয়ার আছে, সে-ই স্ক্রাপ নিয়ে যাবে। অন্য কেউ বিড করার সাহসই পাবে না। তুই যদি মনে করিস, অকশনে ঢুকতে পারিস। অন্য কেউ এখনও এই খবরটা জানে না। আগে থেকে তৈরি থাক।

সন্তু বলল, "স্ক্রাপ নিয়ে কী করব আমি ? বিক্রি হবে ?"

কানাই বলল, "আলবাত হবে। তেমন হলে বেনামিতে আমি কিনে নেব। ওই অঞ্চলে বহু পুরনো বাড়ি আছে। পুরনো আমলের দরজা, জানলা, জানলার কাঁচ, কড়িকাঠ— এ সবের প্রচুর খদ্দের। আজকাল নতুন বাড়িতেও লোকে এসব লাগায়। এই কাজ আমি বেহালার দিকে করেছি। পুরনো দিনের বিল্ডিং মেটিরিয়ালের কী দাম, তুই জানিস না।"

সন্তু এবার একটু আগ্রহ বোধ করল। বলল, "কত বাড়ি ভাঙা হবে বলে তোর মনে হয় ?"

—সেটাই ইন্সপেকশনে যাচ্ছি। পি ডবলু ডি-তে আমার নিজের লোকজন আছে। পয়সা খাওয়াই বলে আগে থেকে আমায় খবর দিয়ে দেয়। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখ। বাই দ্য বাই, তোকে পাব কোথায় ?

—সিঁথির মোড়ে চায়ের দোকানে আমার নাম করিস।

—বাঃ তা হলে তো ভাল নামই করেছিস।

—ওই একটু-আধটু। বলেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সন্তু। কানাইয়ের প্রোপোজালটা খারাপ না। চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অকশনে নামার জন্যও তো কিছু টাকার দরকার প্রথম দিকে। সেই টাকা কে দেবে ? ও জিজ্ঞাসা করল, "ইনিশিয়ালি কত ইনভেস্ট করতে হবে রে ?"

কানাই আশ্বস্ত করল, "সে নিয়ে তুই ভাবিস না। যে ম্যাজিস্ট্রেট অকশন করতে আসবে, আগে থেকে তাকে ম্যানেজ করে রাখব। একেকটা বাড়ির স্ক্রাপ তিন চার হাজার টাকায় পেয়ে যাবি। মার্জিন থাকবে পনেরো-কুড়ি হাজার করে। অকশন এরিয়ার বাইরেই কালোয়াররা বসে থাকবে। এক হাতে তুই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কাগজ নিবি, আর অন্য হাতে বেরিয়ে এসেই টাকার বাণ্ডিল। কুড়িটা বাড়ি ভাঙা হলে তো নিট ইনকাম তোর লাখ দু'য়েক।"

সন্তু বলল, "লা-খ-দু-য়ে-ক ! বলিস কী ?"

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? করেই দেখ না। তোর এলাকায় অন্য লোককে টাকাটা নিয়ে যেতে দিবি কেন ? একজনকে সব স্ক্রাপ ওরা দেবে না। তুই কিছু পেটোয়া লোক ঠিক করে রাখবি। তাদের নামে কিনবি। তোকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, অন্য

কোনও শালা যেন বিড করতে না ঢোকে।

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, আমি রাজি। তোর কোনও নেম কার্ড আছে? আমাকে দে। যোগাযোগ করব।"

সিঁথির মোড়ে ট্যাক্সি পৌঁছতেই সন্তু নেমে পড়ল। ঘড়িতে দেখল, সোয়া দশটা। এখনও অনেক সময় আছে। রাধি সাড়ে এগারোটার আগে আসবে না। দু'পা এগিয়ে ও সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়াল। এ বার একটু উত্তেজনা অনুভব করছে। এখনও ঠিক করতে পারেনি, রাধি এলে ওকে নিয়ে কোথায় বসবে। পার্স থেকে টাকা বার করে সন্তু এক প্যাকেট টোবাকো কিনল।

... ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় মিনি বাস স্ট্যান্ডে এসে সন্তু দেখল, রাধি তখনও আসেনি। আশপাশ ভাল করে দেখে, ও ধীরে সুস্থে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। ফাঁকা বাসে ওঠার জন্য এখনও কিছু লোক লাইন দিয়ে আছে। স্ট্যান্ডে অবশ্য বাস নেই। সন্তু ভাল করে নজর করল, পরিচিত কেউ আছে কি না। দুপুর একটা-দেড়টার আগে ভিড় কমবে না। দোকানে বসে সন্তু রাধির কথাই ভাবতে লাগল। ওর ভাল নামটা কী, সন্তু এখনও তা জানে না। খুকুমণিদা বা বৌদিকে তো আর এসব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। ইচ্ছে করলে অবশ্য এখনই জানা যায় সেলাই স্কুলের দিদিমণির কাছে গিয়ে। সন্তু তাগিদ অনুভব করছে না। রাধির পরিচয় কী, বাবা-মা কে, ওর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু এসব জানার কোনও ইচ্ছাই নেই। এই একটাই মেয়ে, যার প্রতি ও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে।

ওকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছাটা জাগে হঠাৎই একদিন। খুকুমণিদার ডাকে সেদিন ওঁর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল। খুকুমণিদা স্নান করতে ঢুকেছেন শুনে ও অপেক্ষা করছিল ড্রয়িংরুমে। হঠাৎ ঝনঝনানি শব্দ। তারপরই বৌদির গলা, "ফুলদানিটা ভাঙলি হতচ্ছাড়ি।"

এরপর চড়-চাপড়ের শব্দ। রাধির ক্ষীণ প্রতিবাদ, "আমি ভাঙিনি বৌদি। তুমি ফ্রিজের ওপর রেখেছিলে। হাওয়ায় পড়ে গেছে।"

ফের চড় মারার শব্দ। অস্ফুট কান্না। বৌদির গলা, "জানলাটা কেন বন্ধ করে রাখিসনি।"

এরপরই খুট করে দরজা খোলার শব্দ। খুকুমণিদার গলা, "তোমার হয়েছেটা কী লালি। সামান্য ফুলদানিটার জন্য ওর গায়ে হাত তুলছ। একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে...।"

—চুপ করো। তোমার লাই পেয়েই ও এত বেড়েছে।

ড্রয়িংরুমে বসেই পুরো দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছিল সন্তু। বৌদির গলা শুনতে পেল, "হাঁ করে দেখছিস কী, জায়গাটা পরিষ্কার কর ফেল। টুকরোগুলো ফেলে আয় ওয়েস্ট পেপার বক্সে।"

একটু পরে ফোঁপাতে ফোঁপাতেই রাধি ড্রয়িংরুমের পাশ দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ওর বেদনার্ত মুখটা এক লহমার জন্য দেখতে পেয়েছিল সন্তু। সেটা ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল। কানে বারবার বাজছিল খুকুমণিদার কথাটা, "একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে।"

কয়েকদিন পর, রাধিকে সেলাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার পরামর্শটা আসলে সন্তুই

দিয়েছিল খুকুমণিদাকে। পাড়ার পুজোর জন্য ডেকোরেটরের সঙ্গে কথা বলার জন্য সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল খুকুমণিদা। ফেরার পথে ও-ই পেড়েছিল কথাটা, "এখানে নতুন একটা সেলাই স্কুল হয়েছে খুকুমণিদা, মেয়েদের জন্য। পয়সাকড়ির ব্যাপার নেই। গরিব ফ্যামিলির মেয়ে আর বউদের শেখাবে। আপনার যদি কোনও ক্যান্ডিডেট থাকে, পাঠাতে পারেন।"

খুকুমণিদা জানতে চেয়েছিলেন, 'কারা করছে রে?"

—উত্তর প্রান্তিক বলে মেয়েদের একটা অর্গানাইজেশন। কাদের কাছ থেকে যেন গোটা বিশেক সেলাই মেশিন পেয়েছে। অল্প শিক্ষিত মেয়েরা যাতে রোজগার করতে পারে, তার জন্যই স্কুলটা।

—আমাদের রাধিকেই ভর্তি করে দিই না। পরের বাড়িতে আর কদ্দিন কাজ করবে।

—দিতে পারেন। দাঁড়ান, আমি ফর্ম এনে দিই। আপনি শুধু জমা দিয়ে যাবেন। বাকিটা দেখার দায়িত্ব আমার।

খুকুমণিদা অতসব বোঝেনি। রাধিকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ভয় ছিল, বৌদিকে নিয়ে। ছাড়বে কি না। বোধহয় কোনও আপত্তি করেনি। চায়ের দোকানে বসে রোজ সন্তু লক্ষ্য রাখে রাধির দিকে। মাঝেমধ্যে সামনাসামনি দেখাও হয়ে যায় কোনওদিন। হয়তো বলে, দাদাবাবু একবার যেতে বলেছে। পার্কের মাঠে ফুটবল পেটানোর সময় যে রাধি দুষ্টুমি করে বলত, বৌদিকে ডাকব, আবার বল ফেলেছ আমাদের বাড়িতে? সেই রাধি যেন পাল্টে গেছে। এখন কথা বলার সময়, ওর ভরাট মুখটা একদিকে একটু হেলে থাকে। চোখের পুরো পাতা মেলে তাকায়। চাউনিতে নিষ্পাপ সারল্য ফুটে বেরোয়। ওর মুখের মসৃণ ত্বকে আলাদা ঔজ্জ্বল্য, খুব পবিত্র মনে হয়। একেক দিন দু'বেনীর একটা, কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রাখে। ওদিকে চোখ চলে যায়।

দোকানে বসে সন্তু এসব কথা ভাবছে। রাধির আসার নাম নেই। একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ও। বেলা বারোটা বাজে। সেলাই স্কুলে আসার টাইম পেরিয়ে গেছে। বৌদি কি তাহলে ওকে আটকে দিল? দোকান থেকে বেরিয়ে, আস্তে আস্তে ও সাউথ সিঁথি রোডের দিকে এগোল। ওই রাস্তা দিয়েই রাধি আসবে, যদি দেখা হয়ে যায়। ঠা ঠা রোদ্দুরে প্রায় আধ কিলোমিটার হেঁটে সন্তু আবার ফিরে এল মিনিবাস স্ট্যান্ডে। রাধির কোনও পাত্তা নেই। কাপড়ের দোকানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ও চঞ্চল হয়ে উঠল। দোকানের মালিক বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে। এ সময়ে খদ্দের থাকে না। একবার জিজ্ঞাসাও করল, "কী সন্তুবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে।"

—এমনি। একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন কড়া গলায় বলল যে, দোকানের মালিক থতমত খেয়ে বলল—"বাইরে কেন? আপনি ভেতরে এসে বসুন না।"

অসহিষ্ণু হয়ে একসময় রাস্তা পেরোল সন্তু। স্ট্যান্ডে এখন পাঁচ-ছ'টা মিনিবাস দাঁড়িয়ে। এই সময়টায় ড্রাইভার-কনডাক্টর আর হেল্পাররা আশপাশের হোটেলে ভাত খেতে যায়। কয়েক পা হেঁটে সিঁথির মোড়ে আসতেই সন্তু দেখল পিছন থেকে কে একজন ডাকছে, "সন্তু ভায়া। ও সন্তু ভায়া।"

পিছনে তাকাতেই ও দেখল যতীনদাকে। ঘুঘুডাঙা রিক্সা স্ট্যান্ডের গায়ে লাল রঙওয়ালা একটা একতলা বাড়ির সামনের দিকে দীপ্তি ধৌতাবাস নামে একটা লন্ড্রি আছে যতীনদার। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। গান্ধীজির খুব ভক্ত যতীনদা। সবসময় সাদা খদ্দরের হাফ হাতা শার্ট আর ধুতি পরে থাকেন। ওঁর ছেলে অবশ্য সি পি এম।

সন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কেমন আছেন যতীনদা।"

—আমাদের আর থাকা না থাকা। তোমাকে ইদানীং পাড়ায় যে দেখি না।

—কম যাই।

—কী করছ এখন ?

—তেমন কিছুই না।

—পার্কের ওখান থেকে তোমরা তো সাট্টার ঠেক তুলে দিলে ভায়া। এখন ওরা উঠে এসেছে আমার দোকানের পাশে। ওই, পচার চায়ের দোকানে। ওখানেই সাট্টার ঠেক করেছে।

সন্তু একটু আশ্চর্যই হল, "তাই নাকি ?"

—ওটা যে তোমাকেই তুলে দিতে হবে ভায়া। এই বুড়ো বয়সে আমি তো আর হাতাহাতি করতে পারি না। নকশালদের সময়ও, বয়স কম ছিল, কখনও সখনও নেমে গেছি। এখন সব আউট অফ কন্ট্রোল। রতা দিন কয়েক বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

—রতা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে যতীনদা ?

—তাই তো দেখছি। কই মাছের জান। দোকানের পাশে সব সময় অ্যান্টি সোশ্যালদের ভিড় ভায়া। আমার কাস্টমাররা এখন আসতেই ভয় পাচ্ছে। বিশেষ করে মেয়েরা।

—ঠিক আছে, একদিন ওদিকে যাব যতীনদা। বলে সন্তু হাঁটা শুরু করে দিল রামলাল আগরওয়াল লেনের দিকে।

.... সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় নিরালার এক নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপতেই সন্তু দেখল, দরজা খুলে রাধি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগের দিনের মতো দরজা আগলে নয়। ছিটকিনি খুলে ও একটু ভেতরে সরে দাঁড়িয়েছে। রাধির চোখ-মুখ একটু ফোলা। চোখে সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। রাধি কি কান্নাকাটি করেছে ? সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। ও বলল, "খুকুমণিদা আছে ?"

রাধি ঘাড় নাড়ল, নেই।

—বৌদি ?

রাধি আবার ঘাড় নাড়ল, নেই। ঘাড় নেড়েই ও মুখ নিচু করে ফেলল।

চৌকাঠ পেরোল সন্তু। হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে দিল পিছনের দিকে। খুট করে একটা শব্দ হল। দরজাটা লক হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়েই সন্তু জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কোথায় গেছে ?"

—বারাসাত।

—কখন আসবে।

—রাত দশটা নাগাদ। রাধি মুখ নামিয়ে রেখেই উত্তর দিচ্ছিল। ও দু' পা এগোল

ড্রয়িংরুমের দিকে।

দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, "আজ গেলে না যে, তোমার জন্য বেলা দু'টো পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

রাধি একবার সন্তুর দিকে তাকিয়েই মুখ নামাল। আঙুলে আঁচল পেঁচাচ্ছে। ওর মুখটা অদ্ভুত মায়া মাখানো। সন্তু ঠিক ওর পিছনে এসে বলল, "ঠা ঠা রোদ্দুরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবে কাউকে কষ্ট দিতে আছে?"

রাধি তবুও কোনও উত্তর দিল না। সন্তু নরমভাবে জিজ্ঞাসা করল, "বৌদি আটকে দিয়েছিল?"

রাধি ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

—কেন?

—কাল রাতে ওপরের ফ্ল্যাটে ভি সি আর দেখতে গেছিলাম বলে।

—গায়ে হাত দিয়েছে?

মুখ তুলে রাধি ইশারায় দেখাল ঘাড়ের দিকে। লালচে একটা দাগ দেখতে পেল সন্তু। রাধির কাঁধে দু' হাত দিয়ে, ওকে ফেরাল নিজের দিকে। দু'চোখে টলটল করছে জল। বাঁ হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে, সন্তু ডান হাতের আঙুল দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুছে দিল সেই জল। তারপর ঘাড়ের কাছে লালচে দাগে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল। স্পর্শে শিউরে উঠল রাধি। সন্তু টের পেল, ওর নরম শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে। সুডৌল দু'টি স্তন একেবারে বুকের কাছে। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু মুখটা নামিয়ে আনল। তারপর বুকের ওপর মুখটা চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "রাধি, আমাকে তুমি বাঁচাও।"

কয়েক মুহূর্ত ওইভাবে থেকে সন্তু মুখ তুলল। তারপর আঁচলটা তুলে রাধির কাঁধের ওপর ফেলে দিল। ওর দু'হাত রাধির পিঠে। এক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল রাধির মুখে।

ফিসফিস করে জানতে চাইল রাধি, "আমাকে কী বলার জন্য ডেকেছিলেন?"

—তুমি এখনও বুঝতে পারছ না?

লজ্জায় রাধি মুখ নামাল। সন্তু ডান হাতে থুতনিটা তুলে রাধির ঠোঁটে চুমু খেল। ও অনুভব করল, ওর পিঠেও রাধির দু'টো হাত উঠে এসেছে। হাত দু'টো ওকে আঁকড়ে ধরেছে। ঝড়ের বেগে ও চুমু খেতে লাগল। রাধির শরীরটা যেন তুলোর মতো। দু' হাতে ওই শরীরটা তুলে গেস্ট রুমের দিকে এগোতে এগোতে সন্তু দেখল, গভীর সুখানুভূতিতে রাধি চোখ বুজে আছে। ওর মুখ থেকে ক্ষীণ গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাত্তি

—শুভু, এই শুভু।

পিসিমণির ডাকে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল শুভ্র। কাল রাতে মেদিনীপুর থেকে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। টেবল ক্লকের দিকে তাকিয়ে ও দেখল

প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে।

পিসিমণির গলায় খুশির ছোঁয়া, "এই শুভু দ্যাখ, খবরের কাগজে তোর ছবি বেরিয়েছে।"

—ওঃ। বলে শুভ হাই তুলল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল, "তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে পিসিমণি যে, আমি ভাবলাম, বাড়িতে তোমার লাবু এসেছে।"

কপট রাগে খবরের কাগজটা লাঠির মতো তুলে পিসিমণি বললেন, "আবার আমার পিছনে লাগছিস।"

শুভ্র গায়ে পাতলা চাদরটা টেনে নিয়ে বলল, তুমি একটু বসো না পিসিমণি। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।

পিসিমণি বিছানায় এসে বসতেই শুভ্র কোলে মাথা গুঁজে দিল। ছেলেবেলায় এইভাবে কতদিন শুয়েছে। পিসিমণি তখন নানারকম গল্প বলতেন। বাবা বলতেন, আদর দিয়ে দিয়েই তরু তুই ছেলেটার মাথা খাবি। পিসিমণি পাল্টা বকতেন, সারা দিনে একটু সঙ্গ দিতে পারো না ছেলেটাকে। ও যাবেটা কার কাছে, বলো তো?

পিসিমণি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এই স্নেহমাখা স্পর্শটুকুর দাম ওর কাছে অনেক। এই সময় যে-ই ঘরে ঢুকুক, ও ভীষণ রেগে যাবে।

আজ এখনও রোদ্দুর ওঠেনি। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। শুভ্র ভাবল, বৃষ্টি হলে আজ বাড়ি থেকে বেরোবেই না। কাল বিদ্যাসাগর ট্রফির ফাইনাল নিয়ে খুব টেনশন গেছে। শুভ্রর দল কলকাতা ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বর্ধমানের বিরুদ্ধে দুটো গোলই শুভ্রর।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে পিসিমণি বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর খেলা আমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাবি?

—এখন না। যে দিন ইন্ডিয়ার হয়ে খেলব, সেদিন দেখাব।

—কবে খেলবি রে?

প্রশ্নটা শুনে শুভ্র হেসে ফেলল। চোখ বুজে ও হাসতেই থাকল। ইন্ডিয়া টিমে খেলা কী অত সোজা? ওর পজিশনে ইন্ডিয়া টিমে এখন খেলছে ভূপিন্দর সিংহ ঠাকুর আর বিজয়ন। ওদের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয় মাঝি, জো পল আনচেরি, ফ্রান্সিস সিলভেরা, গৌতম ঘোষ, সাব্বির পাশা...আরও অনেকে। এঁদের হটিয়ে টিমে ঢুকতে গেলে সন্তোষ ট্রফিতে কিছু একটা করতেই হবে। এ সব পিসিমণিকে বলে কোনও লাভ নেই।

নিচ থেকে মনার মার গলা পাওয়া গেল, "ও মা, ঠাকুর ঘরের সব রেডি।"

শুভ্র বলল, "বাব্বা। মনার মাও ইংরাজি বলছে। দুপুরের দিকে আজকাল ক্লাস নিচ্ছ নাকি পিসিমণি?"

পিসিমণি বললেন, "কী ভেবেছিস তুই, এম এ দিয়েছিস বলে আমরা সব মুখ্যু। লাবু আর আমি যখন যোগমায়া কলেজে..."

থামিয়ে দিয়ে শুভ্র বলল, "আবার লাবু-কাব্য শুরু করলে?"

—কেন, তুই যদি সন্তু আর রানা করে করে সময় কাটাতে পারিস আমি কেন লাবু লাবু করব না। পিসিমণি হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "উফ্ লাবুর ছোট মেয়েটা যে এত সুন্দর হবে, ভাবতেই পারিনি। সেই ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম।

তখনই ডল পুতুলের মতো দেখতে ছিল।

—পিসিমণি, ডল মানেই কিন্তু পুতুল।

—জানি। হ্যাঁরে, নিরালার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবি ?

—বোধহয় পার্কের মাঠের দিকে। হারানদাকে বলো, নিয়ে যাবে।

—পিসিমণি বললেন, "এ বার ছাড় আমাকে। অনেক দেরি হয়ে গেল আজ তোর জন্য।"

শুভ্র ছাড়ল না। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল পিসিমণিকে। এই কোলে মাথা রেখে ও আর যাই হোক, কোনও ডল পুতুলের কথা ভাববে না। কয়েকদিন ধরে ফুল্লরা মুখার্জির প্রাইজের প্যাকেট ওর টেবলে পড়ে আছে। ওর প্রাইজটা সম্ভবত নিরালা বাড়ির ওই ফ্ল্যাটে। নীরেনদারই ভুল। তাড়াহুড়ো করে হয়তো ওর প্রাইজ শুভ্রকে দিয়ে ফেলেছেন। ফুল্লরাই বা কেমন ? শুভ্রর প্যাকেটটা ফেরত পাঠাতে পারল না ! হয়তো শুভ্রদের বাড়ি একা আসতে চায় না। কিন্তু শ্যামলীকে দিয়েও পাঠাতে পারত না ?

পিসিমণি এবার বললেন, "ছাড় বাবা, অনেক কাজ পড়ে আছে। তুই আজ বেরোবি ?"

শুভ্র পিসিমণিকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "বিকালের দিকে একবার রানা আর আমি বরানগরে যেতে পারি।"

—তা হলে আমাকে একবার নিরালায় নামিয়ে দিয়ে যাস। বলে পিসিমণি বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

শুভ্র হ্যাঁ বা না—কিছুই বলল না। না বললে পিসিমণি খুবই কষ্ট পাবেন। ও জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ঘর ছাড়ার আগে পিসিমণি বললেন, "মনার বাবাকে দিয়ে গোটা কুড়ি ডাব পাড়িয়েছি। ডাবের জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ চা খাস না।"

শুভ্রদের বাগানে গোটা কুড়ি নারকেল গাছ এখনও টিকে রয়েছে। এত বড় বাগান এখনও আর এ অঞ্চলে কারও নেই। জমি বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। দুমদাম বাড়ি উঠে যাচ্ছে চতুর্দিকে। স্টেশনের কাছেই পাতাল রেলের টার্মিনাস হবে বলে এ অঞ্চলে ভিড় বাড়ছে। পিসিমণির কথা শুনে শুভ্র মনে মনে হাসল। ডাবের জলে যে কোনও গুণ নেই, এ কথা বলতে গেলেই পিসিমণি তেড়ে আসবে।

রেডিওতে খবর শোনার জন্য শুভ্র নব ঘোরাল। ড্রয়িং রুমে বড় একটা টু-ইন-ওয়ান আছে। তবু ছোট একটা ট্রানজিস্টার নিজের ঘরে শুভ্র রেখে দিয়েছে। দরকার হলে খেলার কমেন্ট্রি শোনার জন্য। রেডিও খুলেই শুভ্র যেন জমাট বেঁধে গেল। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গানটা হচ্ছে... প্রেম শুধু এক মোমবাতি, আলোর নাচনে, ঝড়ের কাঁপনে, যখন তখন মাতামাতি...জীবনটা যায় যে বদলে রাতারাতি। মন দিয়ে গানটা শুনতে শুনতে ফুল্লরার মুখটা ওর একবার মনে পড়ল। ওই ঘন চুল, টানা ভুরু, বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ, পাতলা ঠোঁট আর দৃঢ় চিবুক। চুম্বকের মতো টানতে শুরু করল শুভ্রকে। বালিশে মুখ গুঁজে ও ভাবল শ্যামলীর কথা, "আমি জানি ফুলের ঠিক করা আছে।" সেদিন, পার্কের মাঠে তার আগে রানা জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই ফুলমণি তুই খালি, না ফুল ?" শ্যামলী নিশ্চয়ই জানে, ফুল্লরার কাকে ঠিক করা

আছে। ছেলেটা কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ? না আই এ এস ? নাঃ, আর ফুল্লরার কথা ও ভাববে না। কী লাভ ভেবে ? যাকে পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যেই অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। গভীর ব্যথায় ডুবে গিয়ে শুভ্র বিড়বিড় করে ফুল্লরার উদ্দেশে বলল, ফুল...ফুল, পার্কের মাঠে সেদিন একটা কথাও কেন তুমি বললে না আমার সঙ্গে ? আমি কি খুব খারাপ ছেলে ? আমি কি তোমার যোগ্য নই ?

পিঠে প্রচণ্ড জোরে থাবড়া খেয়ে শুভ্র চমকে উঠে বসল। দেখল, রানা বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, "বিছানায় শুয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে ?"

ফুল নামটা রানা শোনেনি তো ? শুভ্র একবার ভাবল। তারপর বলল, "ও তুই বুঝবি না। গায়ত্রী জপ করছিলাম। এ সব করার জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হয়।"

হো হো করে হেসে উঠল রানা, "এখনকার ব্রাহ্মণরা বুঝি বাসিমুখে গায়ত্রী জপ করে ?"

হেরে গিয়ে শুভ্র কথা পাল্টাল, "তুই এই সাত সকালে ?"

—পিতাশ্রী জার্মানি যাচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার কভার করতে। সকালে দিল্লির ফ্লাইটে তুলে দিয়ে এলাম। মাতাশ্রী গেলেন ভাইয়ের বাড়ি পার্কসার্কাসে। আসার সময় নামিয়ে দিলাম। আমার ভ্রাতাশ্রীও সঙ্গে গেছে। বাড়ি এখন ফাঁকা। তাই ব্রেকফাস্ট করার জন্য ঢুকলাম পিসিমণির এই কাফেটেরিয়ায়।

শুভ্র বলল, "কাফেটেরিয়া না। বল থ্রি স্টার হোটেল। সামনে বাগান, পিছনে পুকুর মানে সুইমিং পুল। শুধু ডিস্কো নেই, আর বার।"

—রুম সার্ভিসটা এখন কেমন রে ?

—খারাপ না। মনার মা এখুনি ঝাঁটা হাতে ঢুকবে। তার চেয়ে চল যাই ড্রয়িংরুমে।

দুজনে মিলে ওরা ড্রইংরুমে এল। সোফার ওপর আরাম করে বসে শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, "তোর প্রেমপর্বের প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টা কেমন কাটল রে রানা।"

—অ্যাজ ইউজুয়াল, ড্রাই। তুই তো জানিস, ন্যাকামি আমি পছন্দ করি না। তোর কি মনে হয়, আমি ভুল করেছি ?

রানা হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেল দেখে শুভ্র তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তুই এ কি বলছিস রে রানা ? মলির মতো মেয়ে হয় ? তুই তো জানিস, প্রতিবার ও এসে আমাকে ফোঁটা দেয়। আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে ওদের কী রকম সম্পর্ক। তুই ঠিক পছন্দ করেছিস।"

—কী জানি, ও সুখি হবে কি না।

—আলবাত হবে। তোর মতো ছেলে পাওয়াও দুষ্কর। আর এ সব ভাবিস না। তুই বোস, আমি চট করে ফ্রেশ হয়ে আসি। বলে শুভ্র ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

মিনিট দশেক পর ফিরে এসে দেখল, রানা কার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে ফোনে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। হারানদা রিক্সা নিয়ে বেরোচ্ছে। মনার মা পুকুর ঘাট থেকে ফিরছিল। শুভ্র চেঁচিয়ে বলল, "দু কাপ চা পাঠিয়ে দাও আমাদের জন্য।"

ঘরে ঢুকে দেখল, তখনও রানা কথা চালিয়ে যাচ্ছে। শুভ্রকে দেখতে পেয়েই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বলল, "মলি। তোকেই ফোন করেছে। কথা বলতে

চাইছে।"

রানার হাত থেকে ফোন নিয়ে শুভ্র বলল, "এই শোন, অল রেডি চারটে কলের বিল উঠে গেছে। ভ্যানতাড়ামো না করে তাড়াতাড়ি বল। না হলে রেখে দেব।"

ও পাশ থেকে শ্যামলী বলল, "প্লিজ, রেখে দিও না। পেয়ারা বাগানের বুথ থেকে করছি। পয়সা তো তোমাকে দিতে হবে না।"

শুভ্র বলল, "পেয়ারা বাগানে এখন কী করতে গেছিস?"

—দরকারটা আমার নয়। ফুলের। পাশপোর্ট সাইজের ছবি তোলাতে হবে ওর। ও আর আমি স্টুডিওতে এসেছি। এই সাত সকালে তোমার বন্ধুটা ওখানে কী করছে?

—বিয়ের কার্ডে কী লেখা হবে কনসাল্ট করতে এসেছে।

—বিয়ে? কার?

—কেন, তোদের।

—সে তো অনেক দেরি। খিল খিল করে হাসছে শ্যামলী, "কেন, ওর নিজের ক্ষমতায় কুলোলো না?"

—না, তুই কী বলবি, চট করে বল। ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে আমার একটা ফোন আসার কথা আছে।

—কেন, কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে বুঝি?

—থাকতে পারে। তোর পেটে কোনও কথা থাকে না। তোকে বলব কেন?

—কত জায়গায় তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, কে জানে? ফুলের প্রাইজটা তোমার কাছে গেল কী করে?

—সে প্রশ্নটা তো আমারও। আমারটা গেল কোথায়? আর শোন, আমি ডুবে ডুবে জল খাই না। এখন ডাবের জল খাচ্ছি। পিসিমণি গোটা কুড়ি ডাব পাড়িয়েছে। যদি খেতে চাস তো, এখুনি চলে আয়।

—একা যাব? সঙ্গে কেউ গেলে তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। তবে এমন কাউকে আনিস না যে, লোক বেছে বেছে কথা বলে।

খিল খিল করে হাসতে লাগল শ্যামলী। বলল, "আজ কাগজে তোমার ছবি দেখলাম। নাকটা বাঁকা উঠেছে কেন?

—বাঁকা লোকদের সঙ্গে মিলে মিশে, আজকাল সব কিছুই তুই বাঁকা দেখছিস।

—পাশেই আছে কিন্তু। বলে দেব?

—প্লিজ, একটা কথা অন্তত পেটে রাখ।

শুভ্র আড়চোখে দেখল, পিসিমণি ঘরে ঢুকছে। হাতে ডাবের জলের গ্লাস। মজা করার জন্যই শ্যামলীকে ও বলল, "বুথের টেলিফোনগুলোতে নল লাগানো আছে কি না দেখ তো? পিসিমণি ডাবের জল নিয়ে এসেছে। তা হলে টেলিফোনেই ঢেলে দিতাম।"

ও পাশ থেকে শ্যামলী বলল, "শুধু ডাবের জল খাওয়াবে শুভুদা। ফাইনালে গোল করে টিমকে জিতিয়েছ, গ্লাস খবরের কাগজে ছবি—একটা ফুল কোর্স লাঞ্চ দেওয়া উচিত তোমার। মজার কথা শোনো, আমাদের কলেজের একটা ছেলে সেদিন

বলে কি না, তোদের পাড়ায় তো শুভ্রনীল থাকে, আর কদ্দিন ইউনিভার্সিটি খেলবে ?"

শুভ্র বলল, "তুই জয় পুরিয়ায় পড়িস না ? ওটা তো হারপুরিয়া হয়ে গেছে রে। যত বার খেলেছি, হারিয়েছি। ডাবের জলও তোদের খাওয়ানো উচিত না। তোদের দরকার ঘোল।"

—ভাল হবে না বলছি শুভুদা। কলেজের নিন্দে আমি সহ্য করতে পারি না। বলো, আমাদের খাওয়াবে কি না।

শুভ্র বলল, "আমাদের হোটেল ডি পিসিমণির মালিক এসে গেছে। দ্যাখ, ফোকটে লাঞ্চটা হয় কি না।"

রিসিভারটা পিসিমণির হাতে ধরিয়ে দিল শুভ্র। ও আর রানা ডাবের জল খেতে লাগল। টেলিফোনে পিসিমণি বলছেন, "আয় না মা, তোরা তো এখন আসিসই না। লাবুর মেয়েকে দে তো ফোনটা। হ্যারে...আমি তরুমাসি বলছি। মাকে বলিস, আমার বাড়িতে আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন...না, না...আমার নাম করে মাকে বলবি...শুভুকে তুই তো দেখেছিস, ওই যে রে সেদিন প্রাইজ নিল...আচ্ছা আচ্ছা...শ্যামলীকে ফোনটা দে... পিসিমণি...ফুলের মাকে আমার নাম করে বলবি...তোদের ফ্ল্যাটের ওপরেই তো থাকে...দ্যাখ না, শুভুকে বললাম নিয়ে যেতে...ও হারানকে দেখিয়ে দিল...লাবুর মেয়েটা কী সুন্দর হয়েছে নারে...ভারী মিষ্টি, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়...কখন আসছিস তোরা...ঠিক আছে। রাখি ?

রিসিভার রেখে পিসিমণি বললেন, "ওরা আসছে। বিধুকে একবার বাজারে পাঠাতে হবে।"

বাড়িতে কেউ খেতে চাইলেই পিসিমণি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শুভ্র তাই বলল, "তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। সিঁথির মোড়ে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ হয়েছে। ফোন করে খাবার আনিয়ে নেব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। রানা ব্রেকফাস্ট করেনি। আগে সে ব্যবস্থা করো।"

পিসিমণি অবাক হয়ে বললেন, "বাইরে থেকে খাবার আনাবি কী রে ! ও মা। তোর আক্কেল দেখে অবাক হচ্ছি। লাবুর মেয়ে আমার বাড়িতে প্রথম খাবে। কী ভাববে বল তো ?

শুভ্র বলে ফেলল, "তোমার লাবুর মেয়ে, ত্যাড়াব্যাঁকা মেয়ে। আমি বাজি ধরছি, ও আসবে না।"

—তুই সব জানিস। পিসিমণি বললেন, "ও ত্যাড়াব্যাঁকা মেয়ে হয়ে গেল ? কেন, তোর কিছু করেছে ?"

—এই তো, আমার প্রাইজটা নিয়ে গেছে। ফেরত দিল না।

—সে, ভুল তো হতেই পারে। তুই দিব্যটাকে ফোন কর। আর সন্তুর কাছে লোক পাঠা। সেদিন সেই যে গেল, আর এলই না, বড় দুঃখী রে ছেলেটা।

পিসিমণি চলে যেতেই রানা ফোন করল দিব্যকে। নবজাতকের ফাংশানে, নাটকে পুলিশ অফিসারের রোল করেছিল দিব্য। দুটো মারাত্মক ভুল করে, পাড়ার বন্ধুদের কাছে ও খোরাক হয়ে গেছে। একটা সিনে ডায়লগ বলতে বলতে টুপি খুলে টেবলে রেখেছিল দিব্য। অনেকক্ষণ পর, টুপি তুলে মাথায় দিয়ে নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে যাবে—এই ছিল সিন। বেরোবার সময় ভুল করে ও টুপিটা উল্টো করে পরেছিল।

দর্শকরা হাসতে শুরু করলে ও বেশ ঘাবড়ে যায়। আরেকটা সিনে, ওর ডায়লগ ছিল, ও মাই গড। তার বদলে ভুল করে বলে ফেলে, ও মাই ডগ। খোরাক হওয়ার ভয়ে দুদিন আর পাড়ায় বেরোচ্ছে না দিব্য।

ও প্রান্তে দিব্যর গলা পেতেই রানা গলা চেপে বলল, "দিব্য, শুভ্র বলছি। ও মাই ডগ, তুই এখনও বাড়িতে?"

দিব্য ইয়ার্কিটা হজম করে নিল। তারপর বলল, "শুভ্র, তোদের ম্যাচ রিপোর্টটাই এতক্ষণ আমরা পড়ছিলাম। কনগ্রাটস।"

রানা বলল, "আমরা মানে কারা?"

—আমার মাসতুতো বোনেরা বেড়াতে এসেছে সল্টলেক থেকে। একজন তো ক্যালকাটাতে পড়ে। তোকে চেনে বলছে। ইউনিভার্সিটিতে তোকে দেখেছে অনেকবার। তোর অ্যাডমায়ারার।

রানা দিব্যি শুভ্র হয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে, "শোন, পিসিমণি পিকনিক করছে। তোদের সবাইকে আসতে বলছে। সকালেই ঠিক হল। তোর অফিস আছে আজ?"

—সেটা বড় ব্যাপার নয়। দাঁড়া, ওদের জিজ্ঞাসা করি, যেতে পারবে কি না।...না রে, রীনা ছাড়া আর কেউ যেতে চাইছে না। ওই যে, তোদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কিছু নিয়ে যেতে হবে?

—না, না অন্য কিছু নয়। শুধু পুলিশের টুপিটা পারলে আনিস। শ্যামলী আর ফুল্লরাও আসছে। ঠিক আছে, রাখি?

ফোন ছেড়েই রানা হাসতে লাগল। শুভ্র বলল, "দিব্যটা কী রে। আমার গলা বুঝতে পারল না! তোরা এত পিছনে লাগলে, জীবনে কোনওদিন তো ও আর নাটকই করবে না।"

হাসি থামিয়ে রানা বলল, "দিব্যটা তো হল, এ বার সন্তুটাকে কোথায় ধরি? ব্যাটাচ্ছেলে, উচ্ছন্নে গেছে। ভাবতে পারিস, শেষ পর্যন্ত একটা কাজের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে!"

শুভ্র ওকে রাগাবার জন্যই বলল, "যার সাথে মজে মন, কিবা হাঁড়ি, কিবা ডোম। কাজের লোক বলে কি রাধি মানুষ না।"

রানা চটে উঠল, "দ্যাখ শুভ্র, তোর এই ভালমানুষিগুলোর কোনও মানে হয় না। প্রত্যেকের একটা স্ট্যাটাস থাকা উচিত।"

—থাম তো। স্ট্যাটাসটা কখনও স্ট্যাটিক না। কমে বাড়ে। সন্তু যদি রাধিকে ওর স্ট্যাটাসে তোলে, তোর অসুবিধে কোথায়?

রানা যেন খেই হারিয়ে ফেলল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। রিসিভার তুলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল শুভ্র, "সন্তু...তুই! অনেকদিন বাঁচবি। এই মাত্তর তোর কথা হচ্ছিল। আমরা পিকনিক করছি। তুই এখুনি চলে আয়।"

ও প্রান্ত থেকে সন্তু বলল, "কাগজে তোর ছবিটা দেখে ভাবলাম, তোকে একবার ফোন করি।"

—কোত্থেকে কথা বলছিস।

—চিতার ঠেক থেকে। তোকে সেদিন নাম্বার দিইনি?

—তুই চলে আয়। কখন আসবি ?

—না রে, আসতে পারব না। আজ আমি একা একা থাকতে চাই। কাল সন্ধ্যায় আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে।

—কী ঘটনা রে ?

—তোকে বলা যায়। তোকে বলতে অসুবিধা নেই।

—ভ্যানতাড়ামো না করে, চলে আয়। সামনাসামনি শুনব।

—না রে যেতে পারব না।

পাশ থেকে রানা শিখিয়ে দিল, পিসিমণির কথা বল না। তা হলে আসবে। তাই শুনে শুভ্র চেঁচিয়ে বলল, "পিসিমণি আসতে বলছে। প্লিজ আয়।"

পিসিমণির কথা শুনে ওদিকে একটু দমে গেল সন্তু। তারপর বলল, "ঠিক আছে, আসছি তা হলে। একটু দেরিও হতে পারে।"

ফোন ছাড়তেই রানা জিজ্ঞাসা করল, "সন্তু কী বলল রে ?"

—কিছুই বুঝতে পারলাম না। বলল, কাল ওর জীবনে নাকি কী একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে।

—নিশ্চয়ই রাধি নামের মেয়েটাকে নিয়ে।

—হতে পারে।

...ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুভ্রদের বাড়িতে পৌঁছে গেল শ্যামলী আর ফুল্লরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল শুভ্র আর রানা। ওখান থেকে বাগানের গেটটা দেখা যায়। ওরা দেখল, হাঁটতে হাঁটতে শ্যামলীরা আসছে। ফুল্লরার হাতে একটা প্যাকেট।

রানা বলল, "বাজিতে তুই হেরে গেলি। ফুল এসেছে।"

ওদিকেই তাকিয়ে শুভ্র বলল, "তাই তো দেখছি। মনে মনে ফুলের উদ্দেশে ও বলল, প্যাকেটটা যদি অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে, কখনই তোমাকে ক্ষমা করতাম না।

দুজনে ওপরে উঠে আসার পর শুভ্র শ্যামলীকে বলল, "যাক, আজকে অন্তত তোর সাজতে সাড়ে তেরো ঘণ্টা লাগেনি।"

শ্যামলী গানের ভঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে বলল, "উসনে পুকারা আউর ম্যায় চলি আয়ি।"

রানা শুনে হাসছিল। বলল, "মলি, প্লিজ তুই একটু আধুনিক গান গা। বড্ড বেশি সায়রা বানু, মীনাকুমারী হয়ে যাচ্ছে।"

ফুল্লরা চোখ পাকিয়ে বলল, "রানাদা। আবার তুই তোকারি।"

রানা জিভ কেটে, কান ধরে বলল, "আর হবে না। কী করব বলো, বহুদিনের অভ্যাস। তোমার ভয়ে এখন তুমি-তুমি করছি বটে, বিয়ের পর কিন্তু আবার পুরনো অভ্যাস ফিরে আসবে।"

—ও বাবা, এখন থেকেই বিয়ের চিন্তা শুরু করেছেন দেখছি।

—দেখো ফুলমণি, আমি যা করি, আগে শেষটা ভেবে নিয়ে শুরু করি। আমি বিয়ের কথাই শুধু ভাবছি না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং করব কি না, করলে কীভাবে করব—তাও ভাবছি।

শ্যামলী খুব হাসছিল। শুভ্র শুধু ফুল্লরাকেই লক্ষ করে যাচ্ছিল। ও অপেক্ষা

করছিল, প্রাইজের প্যাকেটটা ফুল্লরা ওকে দেয় কি না। এ বার ফুল্লরা ওর দিকে তাকাল। এগিয়ে এসে বলল, "এটা আমার নয়। মা ভুল করে সেদিন নিয়ে গেছিল।"

শুভ্র হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে টেবলের ওপর রেখে দিয়ে, ফুল্লরার প্যাকেটটা এনে বলল, "এটা আমার নয়। পিসিমণি ভুল করে সেদিন রেখে দিয়েছিল।" ওদের প্যাকেট বদলাবদলি করতে দেখে রানা বলল, "তালিয়া।"

—পিসিমণি আবার কী করল। বলতে বলতে ঢুকলেন পিসিমণি। ফুল্লরাকে দেখে খুশিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "আমি জানতাম, লাবু তোকে পাঠাবেই। কী সুন্দর দেখতে হয়েছিস মা, একেবারে তোর মায়ের মতো।"

পিসিমণির কথা শুনে শুভ্র জানলার দিকে তাকাল। জলপাই রঙের একটা চুড়িদার পরে এসেছে ফুল্লরা। মাথার চুল টানটান করে পিছন দিকে বাঁধা। সত্যি, বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। আলাদা একটা সৌন্দর্য যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। পিসিমণিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল ফুল্লরা। ওর দেখাদেখি শ্যামলীও। দুজনের চিবুক স্পর্শ করে পিসিমণি বললেন, "সুখী হও মা। শুভ্রটা আমার সঙ্গে বাজি ধরেছিল, তুই নাকি আসবি না। তোরা গল্পগুজব কর। বাকিরা আসুক। তারপর খেতে দেব।"

ফুল্লরা আদুরে গলায় বলল, "না তরুমাসি, আমি তোমার সঙ্গে একটু থাকব।

পিসিমণি বললেন, "তা হলে আমার সঙ্গে রান্নাঘরেই আয় মা।"

শুভ্রকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে পিসিমণি চলে গেলেন। কী দরকার ছিল, বাজির কথা বলার। ফুল্লরার সহজ সরল ব্যবহার দেখে শুভ্র অবাকই হচ্ছিল। শ্যামলী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। ও কানে কানে বলল, "ফুলকে পিসিমণি এখানে পার্মানেন্ট রেখে দেবে নাকি? আমার তো তাই মনে হচ্ছে। সাবধানে থেকো।"

—কেন, ওর তো ঠিক করাই আছে। সেদিন যে তুই বললি। পিসিমণির কানেও কথাটা তুলে দিস। শুভ্র বলল।

—আমি আবার কখন এ কথা বললাম!

—কেন, সেদিন পার্কের মাঠে।

—সে তো ওকে রাগাবার জন্য।

শুভ্রর বুকটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। মনটা ভরে উঠল খুশিতে। ওর চোখের সামনে এক হাজার ফুলঝুড়ি কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। শ্যামলী আর রানাকে ও বলল, "আমি চান করতে যাচ্ছি। ফাঁকা ঘর পেয়ে যেন তোরা আবার ফ্যামিলি প্ল্যানিং করিস না।

...আধ ঘণ্টা পর ফিরে এসে শুভ্র দেখল, সন্তু ছাড়া সবাই হাজির। সোফার এক কোণে বসে দিব্য জমিয়ে গল্প করছে ফুল্লরার সঙ্গে। শ্যামলী, রানা আর দিব্যর মাসতুতো বোন বারান্দায় আড্ডা মারছে। শুভ্রকে দেখে শ্যামলী বলল, "উফ্, কী হ্যান্ডসাম লাগছে তোমাকে শুভ্রদা। জিনসের প্যান্টটা কোত্থেকে কিনেছ?"

রানা চোখ পাকিয়ে বলল, "এই প্যান্টটা খুলে ফেল তো। দেখি, তোকে তখনও হ্যান্ডসাম লাগে কি না।"

দিব্যর মাসতুতো বোন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শুভ্রর দিকে। নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ করল, "আমার নাম রীনা। আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি

শুভ্রনীলদা। কিন্তু কথা বলতে সাহস পাইনি।"

শুভ্র বলল, "কেন, আমি বাঘ না ভালুক?"

রীনা বলল, "বাব্বাঃ, আপনি ইউনিভার্সিটির নামকরা ছাত্র। তার ওপর বিখ্যাত ফুটবলার। আমরা সাধারণ মেয়ে। হয়তো কথা বলতে গেলে পাত্তাই দিতেন না। দিব্যদাকে অনেকবার বলেছি, আলাপ করিয়ে দিতে।"

শুভ্র বলল, "চলো, ভেতরে গিয়ে বসি। বৃষ্টি নামল বলে।"

ঘরের ভিতর দিব্য আর ফুল্লরা যে সোফায় বসে গল্প করছে, তার ঠিক উল্টোদিকের সোফায় বসল শুভ্র। টুকটাক পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল রীনাকে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওর জানা হয়ে গেল, রীনারা সল্টলেকের বিডি ব্লকে থাকে, ওর বাবা সরকারি অফিসার। তিন ভাইয়ের এক বোন রীনা। ফুটবলের খুব ফ্যান। একবার নাকি কৃশানু দে-র অটোগ্রাফ নিয়েছিল যুবভারতীতে।

শুনে শুভ্রর খুব ভাল লাগছিল। আজকাল ক্রিকেটের ওপর বেশি ঝোঁক ছেলে-মেয়েদের। ক্রিকেটারদের নিয়েই মাতামাতি করে বেশি। টেস্ট ক্রিকেটাররা এলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই খেলাটা শুভ্রর কোনওদিন ভাল লাগল না। একবার লাঞ্চ, একবার টি—দুবার খেয়ে দেয়ে যে খেলা খেলতে হয়, সেটা আবার খেলা!

এ সব কথার মাঝখানে শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল, "হিয়ার কামস রিয়েল হি-ম্যান।"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই দরজার দিকে তাকাল। সন্তু ঢুকল ড্রয়িংরুমে। ওর হাতে একটা প্লেট। তাতে ভাজা মাছ। ওকে দেখেই, বিরক্তিভরা মুখে দিব্য সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। তবে শ্যামলী, রানা আর শুভ্র একসঙ্গে হইহই করে উঠল। সন্তুরও পরনে জিনস; গায়ে গাঢ় লাল রঙের অ্যাডিডাস গেঞ্জি। দাড়ি কামিয়ে আসায় ওকে আজ বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হচ্ছে। ভাজা মাছ খেতে খেতেই সন্তু ঘরের সবার দিকে একবার নজর বোলাল। ওর দৃষ্টি থেমে গেল ফুল্লরার ওপর। কয়েক মুহূর্ত ও তাকিয়েই রইল। তারপর সটান গিয়ে বসল দিব্যর জায়গায়। ঠিক ফুল্লরার পাশে। ফুল্লরার পিছনে হাত রেখে ও রানাকে বলল, "এই তুই তো রিপোর্টারের ছেলে। এই ছবিটার ভাল একটা ক্যাপশন দে তো।"

রানা কিছু বলার আগেই দিব্য বলে উঠল, "আমি বলছি, দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট।"

শুনে ওর দিকে একবার কড়া চোখে তাকাল সন্তু। পাছে ওদের মধ্যে ফের খটামটি লেগে যায়, এই ভয়ে রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তুই যতক্ষণ বসেছিলি, ততক্ষণ ওই ক্যাপশনটাই মানানসই ছিল। এখন একটু বদলে দিচ্ছি। দ্য বোল্ড অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল।

—কারেক্ট। সন্তু প্রসন্ন মুখে বলল। তারপর একটা ভাজা মাছ ফুল্লরার দিকে এগিয়ে দিয়ে ফের বলল, "এর আগেও একবার কোথায় যেন দেখা হয়েছে আমাদের, না, বিউটিফুল?"

সবাই ওর ভাঁড়ামো দেখে হাসছিল। শুভ্র একটু অস্বস্তিতে ছিল সন্তুকে নিয়ে। ওর মুডের তো কোনও ঠিক নেই। কখন কী বলে বসবে, হয়তো ফুল্লরা তা পছন্দ করবে না। শুভ্র খানিকটা অবাকই হল দেখে, ফুল্লরা বেশ আয়েস করে খাচ্ছে, সন্তুর

দেওয়া ভাজা মাছটা।

ও দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটল শ্যামলী, "ফুল, তোকে দেখে তো মনেই হয় না, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানিস। হি-ম্যানের সঙ্গে কোথায় আগে দেখা হল তোর?"

ফুল্লরা উঃ আঃ করতে করতে বলল, "বলব কেন?"

সন্তু বলল, "ওপরে ওঠার আগে কিচেনটা একবার ইন্সপেকশন করে এলাম, বুঝলি। এখনও হাফ অ্যান আওয়ার বাকি। একটু গান-ফান হলে কেমন হয়। এই মলি, ছোটবেলা থেকে তো গোটা আস্টেক হারমোনিয়াম ভেঙেছিস, শুনেছি। একটা লাগা।"

দিব্যর দিকে একবার তাকিয়ে রানা বলে উঠল, "ও মাই গড! আমাকে তো তা হলে হারমোনিয়ামের একটা ব্যবসা খুলতে হবে। এই খবরটা তো জানতাম না।"

কথাটা শুনে সন্তু একটু কৌতূহলের সঙ্গেই তাকাল রানার দিকে। তারপর বলল, "আমাকে পার্টনার করে নিস মাইরি। যারা হারমোনিয়ামের ব্যবসা করে, রোজ তারা প্রচুর মেয়েলি লোকের সান্নিধ্য পায়। আমার খুব হিংসে হয়।"

শ্যামলী, বলল, "খিদেয় নাড়িভুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। পেটে খিদে নিয়ে গান হয় না।"

রানা বলল, "সেটা বোলো না। খিদে নিয়েও গান গাওয়া যায়। ওই যে বিখ্যাত গানটা...উই শ্যাল ওভারকাম, উই শ্যাল ওভারকাম ওয়ান ডে। যারা গেয়েছিল, তারা খেয়েদেয়ে এসেছিল?"

ওর কথা শুনে সবাই হাসছিল। ফুল্লরা বলল, "রানাদা আপনি যে এত উইটি, আগে জানতাম না তো।"

পুরো পরিবেশটাই খুব ভাল লাগছিল শুভ্রর। সন্তুকে দেখে ওর আনন্দই হচ্ছিল। আগের দিন ওকে বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল। আজ অনেক আত্মবিশ্বাসী লাগছে। যেন সেই আগের সন্তু। ফুল্লরার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে। সোফায় বসে ওরা দুজন কী যেন কথা বলছে। সন্তু কোমরের কাছে হাত দিয়ে আছে। রিভলভারটা আজও এনেছে নাকি! কথাটা মনে হতেই শুভ্রর বুকে একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল। হঠাৎই ওর মনে পড়ল, খুকুমণিদার বাড়ির ওই মেয়েটাকে। এই পরিবেশে মেয়েটাকে মানাত? শুভ্র ঠিক করে রাখল, খাওয়া দাওয়ার পর সবাই চলে গেলে, রানা আর ও সন্তুকে চেপে ধরবে। মিনিট খানেকের মধ্যেই শুভ্র দেখল, রীনা উঠে গিয়ে সন্তুর পাশে বসেছে। হাত নেড়ে সন্তু ওদের দুজনকে কী যেন বোঝাচ্ছে।

শ্যামলী আর রানা বারান্দায়। দিব্য কারও কাছে পাত্তা পাচ্ছিল না বলে হঠাৎ বলল, "যা দেখছি, গান-টান গাওয়ার কারও ইচ্ছে নেই। একটা জোকস শোন। একদিন একটা ছেলে ওর বন্ধুদের কাছে এসেছে। বেশ শোকগ্রস্ত। সবাই জিজ্ঞাসা করল, তোর কী হয়েছে। ছেলেটা বলল, বাবা মারা গেছে। সবাই জানতে চাইল কী ভাবে? তখন ছেলেটা বলল, বাবা হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছিল। উপরে ওঠার পর খুব ঠাণ্ডা লাগছিল দেখে বাবা কপ্টারের পাখাটা বন্ধ করে দেয়...।"

এই পর্যন্ত শুনেই সন্তু বলে উঠল, "এই শুভ্র, জিজ্ঞাসা কর তো, বাবাটা অ্যাকচুয়ালি কার?"

রীনা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "সন্তুদা, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমার মেসোমশাই না।"

ঘরে ফের হাসির ঢেউ উঠল। বাইরে, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টির ছাঁট জানলা দিয়ে ঢুকে ঘরের কার্পেট ভিজিয়ে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় শুভ্র উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জানলা বন্ধ করার সময় ও তা টের পেল। এই মেঘলা দিনগুলো খুব ভাল লাগে শুভ্রর। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না। বাবার ইজিচেয়ারে বারান্দায় বসে বই পড়ে পড়েই সময় কাটিয়ে দেয় ও।

রীনা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর পাশে ফুল্লরা। দুজনে কথা বলছে। রানা ওদের কাছে গিয়ে বলল, "এই মেঘে বৃষ্টি হবেই।"

রীনা বলল, "নাও হতে পারে। কালবৈশাখী।"

রানা বলল, "বাজি।"

সন্তু পিছন থেকে বলল, "আই অ্যাকসেপ্ট। এক টাকায় পাঁচ টাকা।" রানা আবহাওয়াবিদের মতো ভান করে বলল, "দশ মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি নামছে। সন্তু, তুই টাকা বের কর।"

শুভ্র বলল, "টাকা আমার কাছে রাখ।"

সন্তু পকেট থেকে পার্স বের করে শুভ্রর হাতে দিল। দেখাদেখি রানাও। শুভ্র ঘড়িতে দেখল, ঠিক সাড়ে এগারোটা। ও বলল, "এগারোটা চল্লিশের মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে, তা হলে রানা পাঁচ টাকা পাচ্ছিস সন্তুর থেকে। আর না নামলে সন্তু পাবে টাকাটা।"

ফুল্লরা বলল, "আমি সন্তুদার দিকে।"

দিব্য বলল, আমিও আছি। তবে রানার দিকে।

সন্তু হাসছিল। ফুল্লরাকে ও বলল, "এই বিউটিফুল টাকা আছে তো তোর কাছে? নাকি আমি দেব।"

সেন্টার টেবলে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগ দেখিয়ে ফুল্লরা বলল, "ওই কালো চামড়ার ব্যাগটা আমার মশাই।"

সন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই তুই-তোকারিতে নেমে এসেছে। শুনে শুভ্রর খুব ভাল লাগল। এমন মেঘলা দিনে ফুল্লরাকে নিয়ে ছাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেই ও কাটিয়ে দিতে পারে। ও মনে প্রাণে চাইছে, ফুল্লরা অন্যদের মতো ওর সঙ্গেও স্বচ্ছন্দ হোক। কিন্তু ওর সঙ্গে যে কথাই বলছে না। তবে ওকে যে লক্ষ করছে, এ ব্যাপারে শুভ্র নিঃসন্দেহ। বেশ কয়েকবার দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হয়েছে। শুভ্রর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রতিবারই ফুল্লরা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ও হঠাৎ বলে বসল, "ফুল, তোমার ব্যাগটা আমার কাছে এনে দাও।"

পলকের জন্য চমকে উঠে, ফুল্লরা ব্যাগটা এনে দিল শুভ্রর হাতে। ওর টিকোলো নাকে ঘাম চকচক করছে। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এটা হওয়ার তো কথা নয়। শুভ্র সেদিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে নাকছাবি পরলে দারুণ মানাবে, ফুল। নিজের মনে মনেই এ কথা বলল। শুভ্রর হাতে এখন তিনটে লেডিস ব্যাগ আর তিনটে পার্স। ও বলল, "স্টেকটা বাড়ালে হত না। এক টাকা কোনও খেলা! ওটা দশ টাকা কর।"

সন্ত বলল, "আমার আপত্তি নেই ॥"

ওদের সবার চোখ এখন আকাশের দিকে। পাঁচজন বাজি ধরেছে দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। সন্ত আর ফুল্লরা উল্টোদিকে। এখন বারান্দায় শুভ্রর পাশেই ফুল্লরা দাঁড়িয়ে। ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল শুভ্র। সোঁ সোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে। নারকেল গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। দমকা হাওয়ায় ড্রেসিংরুমের জানলাটা একবার খুলে গেল। পাশেই টেবলে রাখা প্রাইজের প্যাকেটটা কার্পেটের ওপর পড়ে গিয়েছে দেখে শুভ্র পা চালিয়ে ঘরের ভিতর এল। ঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ও হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাল। তারপর প্রাইজের প্যাকেটটা তুলতে গিয়েই দেখল, উল্টো দিকে গার্ডারে বাঁধা ছোট্ট একটা চিরকুট। তাতে লেখা, অভিনন্দন—ফুল্লরা। চিরকুটটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরে রাখতে রাখতে ওর একটা লাফ মারতে ইচ্ছে করল। মনে মনে নয়, সবার সামনেই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আই লাভ ইউ, ফুল্লরা। আই লাভ ইউ। বাজিতে হেরে গেলেও ও এখন দুঃখ পাবে না।

দ্রুত বারান্দায় ফিরে এসে ও সব ব্যাগ ফুল্লরার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "ফুল, এগুলো তোমার জিম্মায় রাখো। আমি মন্ত্র পড়ে এখুনি বৃষ্টি আনাচ্ছি।

বারান্দার রেলিংয়ে একটা চাদর মেলা ছিল। সেটাকে গায়ে আলখাল্লার মতো জড়িয়ে, দুহাত আকাশের দিকে তুলে ও চিৎকার করে বলল, "হে ঈশ্বর, অল মাইটি গড, আল্লা দীন ইলাহি... আমরা তোমার কাছে আবেদন করছি...বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোমার করুণা সিন্ধু বর্ষিত হোক। জীবনে এই প্রথম সন্তকে হারাবার একটা সুযোগ পেয়েছি। অবিলম্বে বৃষ্টি পাঠিয়ে আমাদের জেতাও।" বলেই হিজবিজি মার্কা কথা বলতে শুরু করল।

হাওয়ায় চাদরের খুট উড়ছে। আবছা অন্ধকারে ওর লম্বা দেহটা, পিছন থেকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। হঠাৎ কোথায় যেন বাজ পড়ল বিকট শব্দ করে। রীনা আর শ্যামলী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। আকাশে আবার বিজলির রেখা। প্রবল হাওয়ায়, মেঘের নাগরদোলাটা ঘুরতে শুরু করেছে সারা আকাশ জুড়ে। রাস্তার দিকে ধুলোর ঘূর্ণিঝড়। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে সেই ধুলোর ঝড়। শুভ্র এখনও অবোধ্য কিছু কথা বলে যাচ্ছে। ওর হাত দুটো মাথার দুপাশে টানটান, যেন আকাশ থেকে অতি প্রাকৃত কিছু আহ্বান করছে। ওর গলার স্বর ক্রমশই চড়ছে। তবে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে সেগুলি কিছুই শোনা যাচ্ছে না। খুব কাছেই আবার বাজ পড়ল।

দু হাত রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সন্ত হঠাৎ হাসতে হাসতে শুরু করল। শুভ্র ছাড়া সবাই চমকে ওর দিকে তাকাল। হাসতে হাসতেই সন্ত বলল, "দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এগারোটা চল্লিশ। শুভ্র, তোর তুকতাক মোটেই কাজে লাগল না।"

অন্ধকার কেটে গিয়ে তখনই আকাশে আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতি তাণ্ডব থামিয়ে দিয়েছে। হাওয়ার বেগ কমছে। চাদরটা গা থেকে খুলে শুভ্র বলল, "নাঃ, ভগবান দেখছি, সত্যিই একচোখো।"

ফুল্লরা ফ্যাকাশে মুখে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে শুভ্র বলল, "ফুল, তোমার কী হয়েছে?" বলেই ওর হাতটা ধরল।

থরথর করে কাঁপছে।

ফুল্লরার পিঠে হাত দিয়ে, ওকে যত্নের সঙ্গে হাঁটিয়ে এনে সোফাতে বসিয়ে দিল শুভ্র। বারান্দা থেকে পুরো ভিড়টা চলে এল ঘরের মধ্যে। শুভ্রকে সরিয়ে শ্যামলী বসল ওর পাশে। উদ্বেগভরা গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে রে ফুল। ভয় পেয়ে গিয়েছিলি ?"

ফুল্লরা ঘাড় নাড়ল। সন্তু প্রথমে পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে, জানলাটা খুলে দিল। ঝড় থেমে গেছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এখন ঘরে। ভিড় ঠেলে সোফার সামনে বসে ও ফুল্লরাকে বলল, "পঞ্চাশ টাকার বাজি জিতেছিস। মাল এই বেলা হাতিয়ে নে।"

দিব্য তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওখান থেকেই হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠল, "শুভ্র তোদের বাড়িতে পুলিশ !"

পুলিশ ! শুভ্র ছিটকে বারান্দায় চলে এল। দেখল, গেটের বাইরে সত্যিই একটা পুলিশ-ভ্যান। গেট দিয়ে একজন অফিসার ঢুকছেন। ওপর থেকেই ও চিনতে পারল, থানার সেই এস আই। একবার সন্তুর দিকে তাকাল শুভ্র। পরক্ষণেই দ্রুত পায়ে নেমে গেল নীচের দিকে। বাগানের মাঝামাঝি ও গিয়ে পৌঁছতেই সেই এস আই বললেন, "আপনি শুভ্রনীল চ্যাটার্জি ?"

শুভ্র ঘাড় নাড়ল।

—হারান দাস নামে কোনও রিক্সাওয়ালা এখানে থাকে ?

শুভ্র ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

—মিঃ চ্যাটার্জি, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জুড়ি

দীপ্তি ধৌতবাসের ভেতর থেকে হাঁক পাড়লেন যতীনদা, "ভাইয়া, ও হারান ভাইয়া।"

রিক্সা স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগিয়ে সিটের ওপর বসে ছিল হারান। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ধৌতাবাসের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলেটা। তার মানে হারানের জন্য এক ভাঁড় আনিয়েছেন। সিট থেকে নামতে নামতে ও বলল, "এই আসি।"

ধৌতাবাসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল হারান। কয়েক ধাপ উঠলেই লাল রক। সেখানে কোনও বাজে লোককে বসতে দেন না যতীনদা। এ অঞ্চলে এই একটাই লন্ড্রি। অনেক সময় বাড়ির মেয়েরাও আসে জামা-কাপড় ধুতে দিতে। যতীনদা চান না, যাতায়াতের পথে মেয়েদের কোনও অসুবিধা হোক। রকে আড্ডা দেওয়া নিয়ে যতীনদার সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের, এর আগে বেশ কয়েকবার ঝামেলাও হয়ে গেছে।

দোকানে উঠতেই চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিলেন যতীনদা। হারান লক্ষ করেছে, উনি কখনই কাঁচের গ্লাসে চা খান না। বলেন, "দোকানের ছেলেগুলো গ্লাস ভাল করে ধোয় না। কার শরীরে কী জার্ম আছে, বলা যায় না ভাইয়া। আমরা গরিব-গুর্বো

মানুষ। আমাদের মাটির ভাঁড়ই ভাল।"

হারান টুলের উপর বসে ভাঁড়ে চুমুক দিল। লন্ড্রিতে এ সময়টায় যতীনদা আয়েস করেন। ওঁর ছোট ছেলে এসে যায় সাড়ে দশটার মধ্যেই। একটু অবসর মেলে। এই সময়টায়, বিরাট বোঁচকায় জামাকাপড় ধুতে নিয়ে যায় ধোপা। সারাদিনে, এই সময়টুকুতেই যতীনদার সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সময় পায় হারান।

—পনেরোই আগস্ট তো এসে গেল, হারান।

—আর কদিন বাকি, দাদা।

চায়ে চুমুক দিয়ে যতীনদা বললেন, "এই মাত্র মাস তিনেক। তা, ওই দিন তোমার কী প্রোগ্রাম বলো, ভাইয়া।"

হারান একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে, তারপর বলল, "আমি কে?

আপনিই ঠিক করেন।"

যতীনদার মুখে ভাইয়া ডাকটা খুব ভাল লাগে হারানের। সেই সঙ্গে লোকটাকেও। যতই কাজ থাক, রোজ বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হারান একবার এই রিক্সা স্ট্যান্ডে আসবেই। ওই সময় চা খাওয়ানোর জন্য যতীনদা একবার দোকানে ডাকেন। বেশির ভাগ দিন একই ধরনের কথাবার্তা হয়। যতীনদা খুব গান্ধীভক্ত। এক সময় গান্ধীজির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন সোদপুর না কোথায়। দোকানে বড় একটা ছবি বাঁধিয়ে রেখেছেন গান্ধীজির।

হারান যখন বেদিয়াপাড়ায় থাকত, তখন একবার এই রিক্সা স্ট্যান্ডে এসে, বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখে ফেলেছিল দোকানের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটাকে। অত বড় ছবিটাকে দেখে, একেবারে জীবন্ত মনে হয়েছিল। ওর মনে সেদিন খুব ভক্তি এসে যায়। মাথায় দু হাত ঠেকিয়ে ও প্রণাম করে। তারপর থেকে এ দিকে স্ট্যান্ডে এলে একবার ধৌতাবাসের সিঁড়ি থেকে গান্ধীজিকে প্রণাম করে যেত হারান। একদিন সেটা লক্ষ করে যতীনদা ওকে ডেকে বসান। সেদিন থেকেই ওকে ভাইয়া বলে ডাকতে শুরু করেন, "ভাইয়া তুমি আর আমি একই পথের পথিক। রোজ একবার আসবে।" যতীনদা একবার ওকে এও বলেছিলেন, "রিক্সা-টিক্সা ছেড়ে দাও হারান। ইস্ত্রি করার কাজটা বরং শিখে নিয়ে আমার দোকানে ঢুকে পড়ো। দাদা-ভাই মিলে দোকানটা চালাই। হারান অবশ্য রাজি হয়নি।"

চা খেতে খেতে যতীনদা বললেন, "ভাইয়া, এ বার একটা নতুন প্রোগ্রাম করা যাক। কী বলো?"

হারান বলল, "আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। আমি আর কী জানি।"

—চলো, এ বার দিল্লি যাওয়া যাক। দিল্লিতে ওঁর সমাধিটা এখনও আমার দেখা হয়নি। রাজঘাটে।

—সে তো অনেকদূর। কদ্দিন লাগবে?

—যেতে আসতে দিন সাতেক তো বটেই। পয়সা কড়ি যা লাগবে, আমিই দেব।

হারান একটু ভেবে বলল, "আমার আছে।"

বছরে তিনটে দিন যতীনদা আর ও প্রোগ্রাম করে। তিরিশে জানুয়ারি, পনেরো আগস্ট আর দোসরা অক্টোবর। ওই তিনটে দিন হারান গাড়ি বের করে না। যতীনদাও ধৌতাবাস বন্ধ রাখেন। গান্ধীজির জন্মদিন আর মৃত্যুদিনে ওঁর সঙ্গে হারান

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে যায়। সারাটা দিন ওখানে কাটিয়ে যখন ফিরে আসে, শান্তিতে মনটা ভরে থাকে। পনেরোই আগস্ট প্রতিবার ওরা প্রোগ্রাম বদলায়। একেকবার একেকরকম কাটায়। গেল বার ভিডিওতে গান্ধীজির বই দেখিয়েছিলেন যতীনদা। সাহেবদের করা বই। গান্ধীজিকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, লোকটা সাহেব। খুব ভাল কেটেছিল দিনটা।

যতীনদা সিগারেট খান না। সঙ্গে একটা টিনের কৌটোতে বিড়ি রাখেন। কৌটো খুলে উনি একটা বিড়ি বের করে ধরালেন। তারপর বললেন, "কী ঠিক করলে ভাইয়া, দিল্লি যাবে ? তা হলে এখনই টিকিট কাটতে হবে।"

হারান বলল, "কাটেন।"

—তোমার রিক্সার পিছন দিকটা নতুন করে রঙ করিয়ে নাও হারান। কেমন যেন জোলো দেখাচ্ছে।

কথাটা শুনে হারান রাস্তার দিকে তাকাল। অন্যদের রিক্সায় সিটের পিছনে মেয়েছেলের ছবি থাকে। হারানের পছন্দ অন্যরকম। গেল বার রিক্সার পিছন দিকে ও গান্ধীজির একটা ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে দমদম রোডের একটা সাইনবোর্ডের দোকান থেকে। যে ছেলেটা আঁকে, তার খুব বুকনি। একবার বলেছিল, এ সব বুড়ো-হাবরাদের ছবি এঁকে কী লাভ হবে। বলো তো, শ্রীদেবীর ছবি এঁকে দিই। হারান রাগ করায় গান্ধীজির ছবি এঁকে দিয়েছে। ছবির তলায় নিজেই বুদ্ধি করে লিখে দিয়েছে—তোমাকে প্রণাম। যতীনদার কথা শুনে, নিজের রিক্সার দিকে তাকিয়ে হারান দেখল, সত্যিই তেলরঙা ছবিতে কেমন যেন ময়লা পড়ে গেছে। আগে ও রোজ রিক্সা ধোয়াধুয়ি করত। এখন পারে না, শরীরে আর কুলোয় না। হারান ঠিক করল, পনেরো আগস্টের আগেই ও আবার সেই সাইনবোর্ডের দোকানে যাবে।

যতীনদা বললেন, "সকাল থেকে কটা ট্রিপ মারলে ভাইয়া ? আকাশে যা মেঘ, ঢালবে মনে হচ্ছে।"

হারান বলল, "গুমোট কমে নাই।"

—এই তো মজা। দিল্লিতে গেলে দেখবে, প্রচণ্ড গরম। অথচ ভাইয়া তোমার ঘাম হচ্ছে না।

—আশ্চয্যি। বলে হারান আবার রাস্তার দিকে তাকাল। চা শেষ হয়ে গেছে, অথচ ভাঁড় ওর হাতে এখনও ধরা। লাল রকের নীচে, স্ট্যান্ডের লাগোয়া কাঁচা নর্দমা। ও ভাঁড়টা নর্দমায় ফেলে দিল। টুলে বসেই ঠিক করল, বৃষ্টি যদি নামে, তা হলে আর গাড়ি চালাবে না। শুভ্র দাদাবাবুর বন্ধুরা আজ বাড়িতে সবাই মিলে পিকনিক করবে। পিসিমণি একটু সকাল সকাল ফিরতে বলে দিয়েছেন।

যতীনদা বললেন, "ও ভাইয়া...শুভ্রর ছবি আজ খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তুমি দেখেছ।"

হারান ঘাড় নাড়ল। সকালেই পিসিমণি দেখিয়েছেন। ও বলল, "বাড়িতে আজ পিকনিক। দাদাবাবুর বন্ধুরা সব এয়েচেন।"

—সন্তুভাইয়া আসবে ?

—হ্যাঁ।

—ওকে বলো তো, যতীনদা যা বলেছে, তা যেন তাড়াতাড়ি করে।" পচার

দোকানের দিকে ইশারা করে উনি ফের বললেন, "এ যা চলছে, এরপর এখানে দোকান টেকানোই মুসকিল হবে।"

পচাদার চায়ের দোকানে আজকাল রতার সাট্টার ঠেক। পার্কের মাঠ থেকে এখানে উঠে এসেছে। যতীনদা প্রথম দিকে দুচারদিন চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিল। কোনও লাভ হয়নি। পাড়ার মানুষদের কোনও হুঁশ নেই। যতীনদা একা বুড়োমানুষ, রতাকে ঠেকাবে কী করে? নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, পাঁচ-ছয় দিন হল হারান ফের রিক্সা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রতার সামনাসামনি হয়েছে বেশ কয়েকবার। হারানকে না চেনার ভান করে সরে গেছে। সন্তু দাদাবাবুর হাতে সে দিন বেদম মার খাওয়ার পরও কিন্তু, এ দিকে রতার মাস্তানি কমেনি। হারান উঁকি মারতেই দেখল, পচাদার দোকানে রতা বসে আছে কয়েকটা ছেলের সঙ্গে।

টুলের উপর বসে থাকতে থাকতেই হারান দেখল, হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে একটা মেয়ে উঠে আসছে। দোকানের ভেতর মেয়েটা যাতে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে, সে জন্য হারান দরজার পাশ থেকে টুলটা একটু সরিয়ে নিল। মেয়েটাকে ও চেনে। নিরালায় শ্যামলী দিদিমণিদের একতলার ফ্ল্যাটে কাজ করে। গায়ের রংটা শ্যামলা হলেও, মুখের গড়নটা বেশ ভাল। কেমন যেন মায়া মাখানো।

যতীনদা মেয়েটাকে চেনেন। কাউন্টারে উঠে আসতেই ওকে বললেন, "আয় রাধি, অনেকদিন পর এলি।"

পলিথিনের প্যাকেটটা কাউন্টারের ওপর রেখে রাধি হেসে বলল, "তিনটে তাঁতের শাড়ি আর দুটো প্যান্ট।"

অর্ডিনারি না আর্জেন্ট?

যতীনদা খসখস করে লিখতে শুরু করলেন। মাঝে একবার মুখ তুলে বললেন, "খুকুমণি কোথায় রে?"

—দাদা বৌদি কামদেবপুর গেছে। অনাথ আশ্রমে।

—অনাথ আশ্রমে কেন রে?

—বৌদি একটা বাচ্চাকে দত্তক নেবে।

কথাটা শুনে হারান একটু অবাকই হল। রাধিকে ও খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল। কত বছরই বা বয়স—সতেরো-আঠারো। নিশ্চয়ই ভাল খায় দায়। স্বাস্থ্যটা ভালই। বহুদিন ধরে খুকুমণিবাবুর বাড়িতে রয়েছে। ওরা এই মেয়েটাকে তো দত্তক নিলে পারে।

পাতা ছিঁড়ে যতীনদা বিলটা এগিয়ে দিতেই, রাধি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পুরনো একটা বিল বের করে বলল, "এই জামা-কাপড়গুলো দিন।"

যতীনদা বিলের নম্বর খুঁজে জামা খুঁজছেন দেখে হারান মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ঠিক উল্টোদিকের বাড়িতে এই সময় ছেলে-মেয়েরা গান শিখতে আসে। গানের মাস্টারের খুব নাম। টুলে বসেই হারান দেখতে পেল, স্টেশনের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে গানের মাস্টার এদিক পানে আসছেন। চোখ-মুখে এক রাশ বিরক্তির ছাপ। বাড়িতে ঢোকার আগে উনি একবার ধোঁতাবাসের দিকে তাকালেন। গানের মাস্টার অন্য জগতের লোক। পাড়ার কোনও ঝুটঝামেলায় থাকেন না। একবার অবশ্য ওঁর ওপর খুব রাগ হয়েছিল হারানের। যতীনদাকে উনি বলেছিলেন, গান্ধীজি

খুব বাজে লোক। নেতাজিকে নাকি হিংসে করতেন।

মাস্টারকে দেখলেই হারানের ওই কথাটা মনে পড়ে। গান্ধীজির নামে এ সব কথা শোনাও পাপ। যে লোক নিজে সবাইকে হিংসা করতে বারণ করতেন, তিনি করবেন অন্যকে হিংসা! হতেই পারে না। যত সব বাজে কথা।

—হ্যাঁরে, জামাকাপড় ধুতে দেওয়ার আগে পকেটগুলো দেখে দিস না। যতীনদা জিজ্ঞাসা করলেন রাধিকে, আগেরবার খুকুমণির জামার পকেটে একশো টাকার একটা নোট পেলাম। তুলে রেখেছি। এক ফাঁকে ওকে নিয়ে যেতে বলিস।"

কথা বলতে বলতেই রাধির হাতে খুচরো টাকাপয়সা তুলে দিতে লাগলেন উনি। ব্যাগে খুচরো রেখে, জামার প্যাকেট নিয়ে মেয়েটা নেমে গেল।

—প্রায়শ্চিত্ত, বুঝলে হারান ভাইয়া এ জনমে সবাইকেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হয়।

কার উদ্দেশে এ কথা বললেন যতীনদা, বুঝল না হারান। ও অবাক হয়ে তাকাতে উনি ফের বললেন, "এই আমাদের খুকুমণির কথাই বলছি। এখনও সন্তানের বাবা হতে পারল না। বিধবা মাকে কোনও ভাই দেখল না। শেষে না খেতে পেয়ে মরল। আমার কাছে এসে কত দুঃখ করত খুকুমণির সম্পর্কে। সেই পাপ, বুঝলে। ঘর বাড়ি সবই হয়েছে, অথচ দেখো, ওর মনে কোনও সুখ নেই।"

দোকানে একজন কাস্টমার আসায় যতীনদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জামার কলারের এক জায়গায় ফেঁসে গিয়েছে, লোকটা এসে রাগ দেখাচ্ছে। দিনে এ রকম হুজ্জত পাঁচবার পোহাতে হয় যতীনদাকে। কারও জামায় ইস্ত্রির দাগ লেগে রয়েছে, কারও শাড়ির রঙ উঠেছে—কাস্টমারদের কত কথা। যতীনদা কিন্তু মেজাজ ঠাণ্ডা রাখেন সব সময়। যেমন এই লোকটাকে বললেন, "জামাটা তো দশ বছর ধরে কাচছি। এ বার নতুন কিছু করুন।"

ধৌতাবাসের টুলে বসে হারান অবশ্য ভাবতে লাগল খুকুমণিবাবুর কথা। দেখলে তো মনে হয় না ওঁর মনে এত কষ্ট। দিব্যি স্যুট-প্যান্ট পরে অফিসে যান, পাড়ার নানা কাজে খাটাখাটনি করেন। লোকের আপদে-বিপদে দৌড়ে যান—মনে সুখ নেই। এটা বোঝাই যায় না। মুখ দেখে কি বোঝা যায়, মনের কথা?

কাস্টমারকে ভাগিয়ে দিয়ে ফের খুকুমণিবাবুর কথা পাড়লেন যতীনদা, "বউয়ের সঙ্গেও নাকি সদ্ভাব নেই এখন। লোকে ভাবে এক, হয় আর এক।"

ফট করে খুকুমণিবাবুর বউয়ের মুখটা মনে ভেসে উঠল হারানের। বিয়ের পর পর নতুন বউকে রাতের শোতে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেত খুকুমণিবাবু। বউ তখন বেশ ঢলঢলে চেহারার ছিল। হারান সবে লাইনের এ পারে তখন রিক্সা চালাতে শুরু করেছে। প্যাসেঞ্জারদের অনেক কথা শুনত, কান খোলা রাখত। জগতে কত কী জানার আছে। সবেতেই ওর তখন আগ্রহ। সেদিনটার কথা এখনও হারান মনে করতে পারে। রাতের শো দেখে নতুন বউকে নিয়ে ফিরছিলেন খুকুমণিবাবু।

রিক্সায় বসে নতুন বউ বলেছিল, "এখানে চার দিকটা এত ফাঁকা, ভয় ভয় করে। রাত দশটায় সব শুনশান। আমাদের ভবানীপুরে এই সময় এখন জমজমাট।"

খুকুমণিবাবু হেসে বলেছিলেন, "আর দশ-বারো-বছর পর দেখো লালি, এমনটা থাকবে না। বেদিয়া পাড়ায় পাতাল রেলের স্টেশন হচ্ছে। কাজ শুরু হলে এ

অঞ্চলে হু হু করে লোক বাড়বে। এখন কিছু জমি কিনে রাখতে হবে। লোকে পাতাল রেলের কথা জানে না। পরে এই সব জমির দাম, দেখবে প্রচণ্ড বেড়ে যাবে।"

নতুন বউ জিজ্ঞাসা করেছিল, "পাতাল রেলটা কী গো?"

—মাটির তলা দিয়ে ট্রেন যাবে। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় আছে। আমাদের এই স্টেশন থেকে ট্রেন যাবে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। এখান থেকে আমরা দু'জন ট্রেনে চাপব, আর হুস করে নামব তোমাদের ভবানীপুরে।

কত বছর আগেকার কথা? তা, বছর আঠারো-কুড়ি তো হবেই। তখন হারানের খুব হাসি পেত একেক সময়, খুকুমণিবাবুর বউয়ের কথা শুনলে। সাইকেল রিক্সা চাপতে নাকি ভয় করে! নতুন বউ আগে কখনও নাকি সাইকেল রিক্সা চাপেনি। ভবানীপুরের দিকে সব হাতে টানা রিক্সা। হারানকে খালি বলত, এই রিক্সাওয়ালা, একটু আস্তে চালাতে পারো না। খুকুমণিবাবুর জামা ধরে বসে থাকত, পড়ে যাওয়ার ভয়ে। এখন অবশ্য ওঁদের আর রিক্সায় চড়ার দরকার হয় না। মোটর গাড়ি আছে।

যতীনদার গলা পেল হারান, "কী ভাবছ হে। এত ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না। ভাইয়া, তোমারও বয়স হয়ে যাচ্ছে।" হারান একটু লজ্জা পেয়ে গেল। ও দেখল, রাধি নামের সেই মেয়েটা ফের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। হয়তো ভুল করে কিছু ফেলে গেছে। মেয়েটার হাতে এখন বাড়তি একটা প্যাকেট— মিষ্টিমহলের। হারান এবার উঠে দাঁড়াল। ট্রিপ করার সময় হয়েছে। লাইনে আর কোনও রিক্সা নেই। দোকান থেকে নামার জন্য সিঁড়িতে পা দেওয়ার সময় ও শুনতে পেল রাধি বলছে, "যতীনদা, আপনি আমাকে পাঁচ টাকা বেশি ফেরত দিয়েছেন।"

রাধির কথা শুনে হারান ঘুরে দাঁড়াল। যতীনদা বললেন, "এ হে হে। কথা বলতে বলতে ভুল করে ফেলেছি।"

টাকা ফেরত দিয়ে রাধি নেমে যাচ্ছিল। যতীনদা ডাকলেন, "শোন মা, একশো টাকার নোটটা নিয়ে যা।"

হারানের খুব ভাল লাগল রাধির সততা দেখে। গান্ধীজি সত্য কথা বলা শিখিয়েছেন। ইচ্ছে করলে তো রাধি ওই পাঁচটা টাকা মেরেও দিতে পারত। যতীনদা বুঝতেও পারতেন না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ও রাধিকে লক্ষ করতে লাগল। বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে। বুকের কাছে জামা-কাপড়ের প্যাকেটটা চেপে ধরা, গায়ে আঁচল দেওয়া। ওর দিকে তাকিয়ে, দূর থেকেই হারান আশীর্বাদ করল, গান্ধীজি তোমার ভাল করুন মা।

প্রায় গা ঘেঁষেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন গানের মাস্টারমশাই। হাতে মাড় দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি। বোধহয় ইস্ত্রি করাবেন। দোকানে ঢুকে যতীনদাকে উনি বললেন, "আর ভদ্রলোকের মতো থাকা যাবে না যতীনবাবু। স্টেশনে আজ কি হয়েছে, শুনেছেন?"

হারান রাস্তায় নামতে গিয়েও ফের উঠে এল। মাস্টারকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে, "গোখনার গদিতে পুলিশ রেইড করেছিল। বেশ কিছু লোককে ধরে নিয়ে গেছে। রাজাবাগানে এখন লঙ্কা কাণ্ড।"

যতীনদা বললেন, "সে কী? কখন হয়েছে?"

—এই ঘণ্টাখানেক আগে। রাজাবাগানের মিউজিক কর্নারে হারমোনিয়াম সারাতে দিয়েছিলাম। আজ আনতে গিয়ে দেখি, রাস্তা অবরোধ চলছে। কী, না পুলিশ অত্যাচার করেছে। আপনার পার্টির লোকজনও দেখলাম, আছে।

যতীনদা বললেন, "তবে আর কী। এখুনি সব লোকজন ছাড়া পেয়ে যাবে। পুলিশের বোধহয় হঠাৎ টাকার দরকার হয়েছিল! এই দেখুন না, নাকের ডগাতেই সাট্টার রমরমা কারবার চলছে। আপনার কিছু করার নেই।"

নীচে নেমে এসে হারান এ বার রিক্সার সামনে দাঁড়াল। না:, আর ট্রিপ দেবে না। শুভ্র দাদাবাবুরা বাড়িতে পিকনিক করছে। ওদের কোনও দরকার হতে পারে। রিক্সার ঢাকনা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে হারান সিটে চড়ার আগে দেখল, পালের বাগানের সেই নষ্ট মেয়েছেলেটা দৌড়ে দৌড়ে আসছে পচাদার চায়ের দোকানের দিকে। রতার সঙ্গে রোজ রাতে পার্কের মাঠে বসে এই মেয়েটা ফস্টিনস্টি করে।

মেয়েটার ডাক শুনে পচাদার দোকান থেকে বেরিয়ে এল রতা।

—কী হয়েছে রে মঙ্গলা।

—গোখনাদার গদিতে হেবো কাল রেতে ছেলো। আজ সকালে পুলিশ তুলে নে গেছে। আমার কী হবে গো?

হেবোকে হারান চেনে। লাইনের ওপারে রিক্সা চালায়। থাকে পালের বাগানের দিকে। রাতে পেনসিলারদের রানারের কাজ করে হেবো। সারা দিন চুল্লু খেয়ে কাটায়। আর ওর বউটাকে ভোগ করে রতা। মেয়েটাকে রতা বলল, "অত চেঁচাস না। কাঁদছিস কেন? কে তোকে খবরটা দিল।"

মেয়েটা চোখ মুছে বলল, "গদি থেকে কালিয়া একজনকে পাট্‌ঠেছিল।

—কী শুনেছিস, গোখনাকেও ধরেছে?

—না গো। পাইলেচে। রেতে যারা ওখানে শুয়ে ছেলো, তাদেরগে ধরেচে।

রতা আর মেয়েটাকে ঘিরে, মুহূর্তেই ছোটখাটো ভিড়। রতা মেয়েটার হাত ধরে বলল, "আয়, আমার সঙ্গে চল। এই, কেউ একটা রিক্সা ধর তো?"

ভিড়টা এ দিকেই আসছে দেখে হারান প্যাডেলে চাপ দিল। স্ট্যান্ডে আর কোনও রিক্সা নেই। হয়তো ওকেই যেতে বলবে। ওই নষ্ট মেয়েছেলেটাকে হারান কিছুতেই রিক্সায় তুলবে না! একটা ছেলে দৌড়ে এসে রিক্সা থামাল, "রতাদা, এই সেই পাগলটা। পালিয়ে যাচ্ছে।"

—ধর তো, শুয়োরের বাচ্চাকে।

পা চালিয়ে এসে পা দানিতে পা দিল রতা। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "এই শালা, একটুও রিক্সাটা সরাবি না। পেঁয়াজি মারলে আজ তোকে খুন করে ফেলব।"

হারান বলল, "ছাড়ো ছাড়ো। সেদিনের মারের কথা মনে নেই।"

—কী বললি? নাম হারামির বাচ্চা।

রতাকে মঙ্গলা বলল, "তোমার কোনও ক্ষ্যামতা নেই। একটা রিক্সাওয়ালাও তোমার ওপর রোয়াবি মারচে।

আরও গরম খেয়ে গেল রতা, "রোয়াবি দেখাচ্ছি।" দোকানের ভিতর ছুটে গেল দু'তিনটে ছেলে। রড, চেন আর লোহার পিচকিরির মতো কী একটা নিয়ে এল। একজন ক্ষিপ্ত হয়ে লাথি মারল রিক্সায়। ঝনঝন শব্দ হল। হারান ছিটকে পড়ল

রাস্তায়। রিক্সাটা এখন নর্দমায়। সামনের দিকের চাকাটা ঢুকে গেল পাঁকে।

চুলের মুঠি ধরে হারানকে তোলার চেষ্টা করল রতা, "এখনও বল শালা, নিয়ে যাবি কি না।"

হারান দেখতে পেল, ধৌতাবাসের রকে বেরিয়ে এসেছেন যতীনদা। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলছেন, "রতা, ছাড় ছাড় ওকে। একটা নিরীহ লোকের ওপর মাস্তানি করছিস, লজ্জা করে না?"

চুলের মুঠি ধরেই, লাল লাল চোখে যতীনদার দিকে তাকিয়ে রতা বলল, "আপনি আপনার কাজে যান। এখানে নাক গলাবেন না। পোদ্দারি মারতে এলে দোকান ভাঙচুর করব।"

বলেই ও ঘুরে দাঁড়াল হারানের দিকে। এর পরই তল পেটে তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করল হারান। আত্মরক্ষার্থে ও একটু কুঁজো হয়ে গেল। দেখল, রতার পা আবার উঠে আসছে। ডান কানের পিছনে সেটা লাগতেই ও রাস্তায় পড়ে গেল। আর তখনই দু'হাত দূরে, রিক্সার পিছনে আঁকা গান্ধীজির ছবিটাকে দেখতে পেল। তলপেট থেকে যন্ত্রণাটা উঠে আসছে শরীরের ওপরের দিকে। সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। দম নেওয়ার জন্য ও মুখ খুলল। বহু বছর রিক্সা চালানোর জন্য ওর দুটো অণ্ডকোষ ভীষণ ফোলা। জগৎ ডাক্তারকে একবার দেখিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, হাইড্রোসিল। অপারেশন করাতে হবে। রতা ওখানেই প্রথম লাথিটা মেরেছে।

ওই কষ্টকর মুহূর্তে, হারানের হঠাৎ মনে পড়ল গত বছর ভিডিওতে দেখা একটা দৃশ্য। ট্রেনের কামরা থেকে সাদা চামড়ার কয়েকটা লোক টেনে হিঁচড়ে নামাচ্ছে গান্ধীজিকে। লাথি মেরে গান্ধীজিকে ওরা প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল। টুপি পরা দু'একজন লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করল। ওই দৃশ্যটা দেখে চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল হারানের।

ওই দৃশ্যটা ভাবার মুহূর্তে হারান শুনতে পেল, "শালার রিক্সাটা ভেঙে দুমড়ে দে। আর যেন চালাতে না পারে।" পরক্ষণেই লোহার রড দিয়ে আঘাতের শব্দ শুনল ও। হুস করে চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। কে যেন চাড় দিয়ে বাঁকিয়ে দিচ্ছে চাকার স্পোকগুলো।

শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য হারান কিছু একটা ধরতে চাইছিল। হাত বাড়িয়ে একটা কিছুর স্পর্শ পেল। মনে হল, স্ট্যান্ডের গায়ের, সেই ইলেকট্রিক মিটার বক্সটা। কুড়ি বছর, ঠিক কুড়ি বছর আগে আরও একবার ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল এই মিটার বক্সের সামনে। তখনই টায়ার পোড়ার গন্ধটা পায়। নকশালরা হয়তো সেদিন মেরেই ফেলত হারানকে। হঠাৎ একটা পুলিশের ভ্যান এসে যাওয়ায় ওরা পালিয়ে যায়। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় এই মোড়েই নকশালরা খুন করেছিল সি পি এমের একটা নিরীহ ছেলেকে। হারানের চোখের সামনেই। অন্তর থেকে কে যেন ঠেলে ওকে পাঠিয়েছিল থানায়। সব জানিয়ে এসেছিল পুলিশকে। পরদিন সকালেই সেই খবর পৌঁছে যায় নকশালদের কাছে।

মিটার বক্সের গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল হারান। আশপাশের দোকানের ঝাঁপ বন্ধের শব্দ শুনতে পেল ও। শেঠ লেনের দিকে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে

ট্যাক্সি ফিরিয়ে দিচ্ছে। পায়ে ভর দিয়ে কোনও রকমে উঠে দাঁড়াতেই, হারান কিসের যেন আঘাত টের পেল ঘাড়ের কাছে। মাংস, মজ্জা ভেদ করে কিছু ঢুকে গেল শরীরের ভেতর। ডান দিকের হাতটা হঠাৎ ভারশূন্য মনে হল। মুখ কুঁচকে ও ফের বসে পড়ল। মুখ ছিটকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, "আঃ।" চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা সত্ত্বেও, বাঁ হাতের সামনে একটা থান ইট দেখতে পেল হারান। মুঠোয় ধরে, টলতে টলতে ও উঠে দাঁড়াল আবার। তার পর শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ইটটা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। জীবনে এই প্রথম, কাউকে হারান পাল্টা আঘাত করল।

—উফ্, তোমাকে মেরে ফেলল গো। মেয়েটার তীক্ষ্ণ গলা শুনতে পাচ্ছে হারান। "ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে কপাল দিয়ে।"

শব্দটা যেদিক থেকে আসছে, প্রাণপন চেষ্টা করে সেদিকে একবার তাকাল হারান। গানের মাস্টারের রকে বসে পড়েছে রতা। কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। নষ্ট মেয়েটা শাড়ির আঁচল দিয়ে চেপে ধরেছে জায়গাটা। ওর বুকে ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটা একবার বলল, "তোরা মার, মার খানকির বাচ্চাকে।"

দু'টো ছেলে রড নিয়ে দৌড়ে এল। একজন লাথি মেরে বলল, তোর গান্ধীর গায়ে আজ প্রস্রাব করব রে শালা।"

অন্যজন, প্যান্টের জিপার খুলে দাঁড়িয়ে গেল রিক্সার পিছনে। এই সময় হারান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশে ঘোর অন্ধকার। সোঁ সোঁ হাওয়া দিচ্ছে। বুকের কাছটায় শীতল স্পর্শ পেল শুয়ে শুয়ে। বাঁ হাতটা বুকের কাছে তুলতেই চটচটে একটা পদার্থ হাতে লাগল। হারান বুঝতে পারল, রক্ত। কাঁধের কাছ থেকে নেমে আসছে। আশপাশের বাড়ির বারান্দায় কয়েকটা মুখ। একটা ছেলে হুমকি দিল ওপরের দিকে তাকিয়ে, "কী দেখছেন কী? সবাই ঘরে ঢুকে যান।"

ভয়ার্ত মুখগুলো সরে গেল। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না হারান। হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে ও দেখল, গান্ধীজির আঁকা সেই ছবিটাতে গাঢ় হলুদ পেচ্ছাব করছে সেই ছেলেটা। হারানের গায়ে হঠাৎ অসুরের শক্তি ফিরে এল। বাঁ হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা দিয়ে গুঁতো দিল ওই ছেলেটাকে। রিক্সার পিছনের ছবিটা বুক দিয়ে আড়াল করতেই ও প্রস্রাবের গন্ধ পেল।

—আর সহ্য করা যায় না। এই, পাইপ গানটা দে তো। রতার ক্ষ্যাপা গলা ঠিক এই সময় শুনতে পেল হারান। পিছনে এখন কী হচ্ছে ও দেখতে পাচ্ছে না। গান্ধীজিকে ওর রক্ষা করা দরকার।

খুট করে একটা আওয়াজ। হারান হুমড়ি খেয়ে পড়ল নর্দমার পাঁকে।

পাত্তি টু সিঙ্গল

রাজা বাগানের গলির মুখে ঢুকেই কেলে পাঁচু দেখল, ক্যাসেটের দোকানে নিমাই বসে রয়েছে। অন্য দিন দেখা হলেই হেসে ডাকে। আজ হঠাৎ যেন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বছর দেড়েক হল, নিমাই অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের দোকান করেছে এখানে। আসলে ব্যবসাটা গোখনার টাকায়। এই এরিয়ায় সাট্টা কিং হওয়ার পর

নিজের শালাকে দোকান করে দিয়েছে গোখনা।

অন্য কেউ জানে না, পাঁচু জানে এই ক্যাসেটের দোকানটায় বসে নিমাই আসলে কী কাজটা করে। দমদম রোড দিয়ে রাজাবাগানে ঢোকার মুখেই এই দোকান। দশ-বারো গজ ভেতরে, আরেকটা গলির বাঁকে, একটা বাড়ির দোতলায় গোখনার সাট্টার গদি। ক্যাসেটের দোকান থেকে একটা অ্যালার্ম বেল লাগানো আছে গদি পর্যন্ত। পুলিশ বা অন্য কোনও সন্দেহজনক লোক দেখলেই ক্যাসেটের দোকান থেকে বেল টিপে গদিতে বসা গোখনাকে সাবধান করে দেয় নিমাই। গদিতে সেই লোক পৌঁছবার আগেই যাতে প্যাডের কাগজ সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

হাওয়া বোঝার জন্যই নিমাইয়ের দোকানে উঠে এল পাঁচু। নিমাইয়ের চেহারার সঙ্গে গোখনার বউ পুতুলের খানিকটা মিল আছে। দেখে বোঝা যায় ভাই-বোন। তবে বোনের মতো উগ্র ধরনের নয় নিমাই। একটু শান্ত, ভদ্র গোছের। কথায় টথায় মার-প্যাঁচ নেই।

দুটি অল্পবয়সী মেয়ে গানের ক্যাসেট কিনছিল। দাম মিটিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর কয়েকটা ক্যাসেট তাকে তুলে রেখে নিমাই বলল, "তোমার সঙ্গে গোখনাদার কী গণ্ডগোল হয়েছে পাঁচুদা ? তোমার উপর খুব খচে রয়েছে।"

বুকটা একবার ধক করে উঠল পাঁচুর। গোখনা কি তা হলে সব জেনে গেছে ? গোখনার স্বভাব ও জানে। ও খচে যাওয়া মানে বেশ বিপদ। সাট্টা মহলে কোনও কিছু গোপন থাকে না। সন্তুবাবুকে ও যে কলাবাগানে নিয়ে গিয়েছিল, হয়তো সে খবর এখানে পৌঁছে গেছে। নিমাইয়ের একটা কথাতেই সতর্ক হয়ে গেল পাঁচু। আজই গোখনার সঙ্গে ফয়সালা করে যেতে হবে। দু'নৌকায় পা দিয়ে বেশিদিন চলা যাবে না। মুখ স্বাভাবিক রেখেই ও জিজ্ঞাসা করল, "গোখনা আছে ?"

—না, দিদিকে নিয়ে জপুরে গেছে। কালীমন্দিরে পুজো দিতে।

—এখন ফিরবে ?

—গেছে তো অনেকক্ষণ। বাইকে। তুমি চলে যেও না। দু'দিন ধরে পাগলা কুকুরের মতো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ তোমার কোনও পাত্তা নেই।

—আসব কী করে বল। রোববার ছাড়া আসার উপায় আছে। শরীরটা খারাপ। তিনদিন ঠেক বন্ধ রেখেছি।

—ঠেক বন্ধ কেন ? বিল্লা তো আছে।

—না রে। আজকাল ও ড্রাইভারি শেখায় সময় দিচ্ছে।

—পাঁচুদা, তোমার নামে অনেকে অনেক কথা এসে বলছে গোখনাদার কাছে। তুমি নাকি, সন্তু না কে, তাকে সাট্টায় নামাচ্ছ।

—সন্তু কে রে ? আমি চিনিই না।

—মিথ্যে কথা বলো না। ওই ছেলেটা নাকি লালবাজারটা ম্যানেজ করে নিয়েছে। গোখনাদা খবর পেয়েছে ওখান থেকেই। যাক গে, এসব কথা আমার কাছ থেকে শুনেছ, গোখনাদাকে আবার বলে বোসো না।

নিমাইয়ের দোকানে বসে থাকতে থাকতেই পাঁচু লক্ষ করল, উল্টোদিকে স্কুলবাড়ির গায়ে কতগুলি পোস্টার মারা রয়েছে। "সিঁথি বাঁচাও, সাট্টা হঠাও।" "সাট্টা বিরোধী অভিযান চলছে, চলবে।" পোস্টারগুলো দেখে ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

এখানে অবশ্য কেউ ওকে তেমন চেনে না। কিন্তু খোদ গোখনার গদির সামনে এই রকম পোস্টার দেখে পাঁচু বেশ অবাকই হল। দিন সাতেক আগে এখানে একবার পুলিশ রেইড করেছিল। খবর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে যায়। ওইদিনই কাঠগোলার কাছে একটা রিক্সাওয়ালাকে মার্ডার করে রতা। তারপর থেকেই এ অঞ্চলের হাওয়া খারাপ। বিল্লা রোজ খবরের কাগজ পড়ে। পরদিন খবরের কাগজে হেড লাইন শুনিয়েছিল, 'সাট্টার পেনসিলার খুনের অভিযোগে ধৃত।"

রতাটা চিরদিনই মাথা মোটা ধরনের। ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া ওর অভ্যাস। গোখনাটা ওকে খুব প্রশ্রয় দিত। পাঁচু ভাবল, "আরে, আমরা হলুম গে, সমাজবিরোধী। ভদ্রলোকেদের সঙ্গে বেশি ঝামেলায় গেলেই বিপদ। এখন দিন কাল খুব খারাপ। কথায় কথায় পার্টির লোকেরা জুটে যায়। পোস্টারগুলো কি ভাল লক্ষণ? রতাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। সাট্টার কেস নয়। এটা মার্ডার কেস। জেলের ঘানি কেউ আটকাতেও পারবে না। সাট্টার কেস হলে পরদিনই জামিন পাওয়া যায়। কোর্টে বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট টাকা ফাইন করে। গোখনার সব ব্যবস্থাও করা আছে। শেয়ালদা কোর্টে লোক আছে। পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে উকিলবাবুরাই ছাড়িয়ে দেয়। রতা কি এখন ছাড়া পাবে? মনে হয় না।

নিমাই ক্যাসেট বিক্রিতে ব্যস্ত। একটু অন্ধকার হয়ে আসছে। দোকানের লাইটগুলো ও জ্বালিয়ে দিল। খুব ঝকঝক করছে। এ সব দোকান আবার একটু ঝকঝকে না হলে কাস্টমার টানে না। একটু ফাঁকা হতেই নিমাইকে ও জিজ্ঞাসা করল, "রতার কেসটা কতদূর গড়াবে বল তো?"

নিমাই খুব নিরাসক্তভাবে বলল, "দিদি বারণ করে দিয়েছে।

গোখনাদা জড়াবে না।"

কেলে পাঁচু একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রতা এখন কোথায়?

—কোথায় আবার, পুলিশ হাজতে। এমন পিটিয়েছে, এখন নড়তে পারবে না।

—কেন এটা করতে গেল?

—শালাটা সব চৌপাট করে দিয়েছে। গোখনাদা বলেই দিয়েছে, কোনওদিন ও ফিরে এলেও শেল্টার দেবে না। ওর জন্য বিজনেস গুটিয়ে দিতে হল।

—পোস্টারগুলো এখানে কে মারল?

—নাগরিক কমিটির লোকেরা। আজ তো শুনলাম, পেয়ারাবাগানে এখন ওরা মিটিংও করছে। আমাদের লোকজনও মিটিংয়ের মধ্যে রয়েছে।

পাঁচু বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল নিমাইয়ের কথা শুনে। আজ এখানে এসে ও ভালই করেছে। বি টি রোডের ধারে ওর ঠেকে বসে থাকলে, টেরই পেত না— এ অঞ্চলে এত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। গোখনার অবস্থা কি খুবই কোণঠাসা? না হলে ওর গদির এত কাছাকাছি—লোকের সাহস হবে কেন মিটিং মিছিল করার। থানায় কি ওর তেমন লোকজন নেই? নিমাইকে প্রশ্ন করল, "তোমাদের এখানে রেইড হল কী করে? থানা থেকে আগে খবর দেয়নি?

নিমাই বলল, "এই থানা থেকে তো আসেনি। সেদিন পুলিশ এসেছিল লালবাজার থেকে। তাও সিম্পল ড্রেসে। আলাদা আলাদাভাবে। আমরা প্রথমে বুঝতেই পারিনি।" পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, "গদিতে তখন গোখনা ছিল না?" নিমাই বলল,

"গোখনা ছিল। তবে পুলিশ ঢোকার আগেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেদিন পুলিশের যা অ্যাটিচুড দেখলাম, ধরলে গোখনাকেও ছাড়ত না।"

পাঁচু ভাবল, একবার জিজ্ঞাসা করে পুলিশের হিস্যা নিয়ে কোনওরকম গণ্ডগোল হয়েছে কি না। কিন্তু জানতে চাইল না। ও সব বড়বড় ব্যাপার। পেনসিলারের জানার কথা নয়। গোখনার পরিধি অনেক বড়। লালবাজারের অনেক কর্তার সঙ্গে দহরমমহরম। পাঁচু নিজেও একবার দেখেছে। কাঁটাকলে থাকত পুলিশের এক বড় অফিসার। তার মেয়ের বিয়েতে পুরো খাওয়ার খরচ দিয়েছিল গোখনা। এলাকাটা পাঁচুর বলে গোখনা সেদিন কিছু কাজ দিয়েছিল। বউ বাজারের শাহি দরবার থেকে মাটন বিরিয়ানি আনার দায়িত্ব পড়েছিল পাঁচুর উপর। বিয়ের দিন পুরো সময়টা গোখনা হাজির ছিল সেই বাড়িতে। সেদিনের কথাটা মনে আছে এই কারণে, এক ফটোগ্রাফার গোখনার ছবি তুলেছিল বলে ও খুব চটে গিয়েছিল।

এই গোখনার সঙ্গে বিবাদ আসন্ন ভেবে পাঁচু এখন বেশ চিন্তিত। যার ওপর গোখনা একবার খচে, তাকে শেষ না করে ছাড়ে না। কেলেবাবু বলে একজন পেনসিলার ছিল। একদিন টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ঠেক চালাত শেঠবাগান এরিয়ায়। গোখনা লোকজন পাঠিয়ে প্রথম কয়েকদিন খোঁজ খবর নিয়ে জানল, কেলেবাবু শ্বশুরবাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। ও কিছুই করল না। মাস ছয়েক পর বদলা নিল। দমদম রোড দিয়ে সন্ধ্যা বেলায় হেঁটে হেঁটে শেঠবাগানের দিকে যাচ্ছিল কেলেবাবু। পিছন থেকে একটা লরি এসে ওকে চাপা দিয়ে চলে গেল। কেউ জানল না, কার জন্য কী হল। কেলেবাবুর কথা মনে হতেই একবার শিউরে উঠল পাঁচু।

নিমাইয়ের দোকানে বসে থাকতে থাকতেই পাঁচু ঘেমে উঠল। চারদিকে চলমান জনতার মধ্যেও ও এক ধরনের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করতে লাগল। মোড়ের কাছে এক দল ছেলে গজলা করছে। কেউ কেউ হয়তো গোখনার লোক। কেউ ওয়াগনব্রেকার। কেউ সাহায্য করে স্মাগলিংয়ে। গোখনা অনেক ধরনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এক সময় নকশাল করত। বার দু'য়েক জেলও খেটে এসেছে। ও এখন পারে না, এমন কোনও কাজ নেই।

পাঁচু এই সময় লক্ষ করল, একটা অল্প বয়সী ছেলে দ্রুত পায়ে দোকানের দিকে আসছে। চোখ মুখের চাউনি দেখে মনে হল কাস্টমার নয়। ইশারায় নিমাইকে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে ছেলেটা আবার বেরিয়ে গেল। নিমাইয়ের চোখ মুখে উদ্বেগের ছাপ। কাউন্টারের এ পাশে এসে ও বলল, "পাঁচুদা, তুমি গদিতে গিয়ে বসো। আমি দোকান বন্ধ করে দেব। পেয়ারাবাগানে মিটিং শেষ হয়ে গেছে। ওরা মিছিল করে এখন এদিকেই আসছে। খোলা রাখলে দোকান ভাঙচুর করে দেবে।"

শুনে পাঁচুর বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। এখান থেকে চলে যেতে পারলে ও বাঁচে। কিন্তু গোখনার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটাও খারাপ হবে। নিমাই গদিতে যেতে বলছে বটে, কিন্তু একবার ওখানে ঢুকলে অনেক বিপদ। গোখনাই হয়তো কায়দা করে ধরিয়ে দেবে পুলিশের হাতে। মারধোরও করতে পারে ছেলেদের দিয়ে। তিন-চারদিন ধরে গোখনার কাজ ও আর করছে না। তবে টাকা-পয়সা মারেনি। পাই পাই বুঝিয়ে দিয়েছে। ঠেক চালিয়ে রোজ গোখনাকে চার-সাড়ে চার হাজার টাকা

ও দিত। কমিশন কেটে রেখেই দিত। এই রোজগারটা বন্ধ হলে গোখনা নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবে না। নিমাইকে দোকানের শাটার টানতে দেখে কেলে পাঁচু রাস্তায় নেমে এল। তারপর বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি রে নিমাই। বেদিয়াপাড়ায় যাব আর আসব। গোখনাকে বলিস।"

নিমাই একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বলল, "তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে পাঁচুদা। বললাম দেখা করে যাও। না করে পালাচ্ছ। তোমার এত সাহস হল কোত্থেকে?"

পাঁচু বলল, "পালাচ্ছি না রে ভাই। তোদের এখানে অবস্থা এত খারাপ, না এলে জানতেই পারতুম না।"

নিমাই বলল, "সে তোমায় দেখতে হবে না। গোখনাদা সব ম্যানেজ করে নেবে।"

এক ফোঁটা এই ছেলেটাও ধমকের সুরে কথা বলছে দেখে পাঁচু একটু উত্তেজিত হল। তবে তার প্রকাশ ঘটতে দিল না। কোনও কথা না বলে একটু হেঁটে ও স্কুল বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির উপর গিয়ে দাঁড়াল। ওখান থেকে দমদম রোড দেখা যায় আবার স্টেশনের দিক থেকেও কেউ এলে চোখে পড়ে। নিমাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথায় ও বুঝে গিয়েছে, ওকে নিয়ে গদিতে বেশ আলোচনা হয়েছে। গদিতে প্রায় জনা কুড়ি লোক কাজ করে। পেনসিলাররা যে সব প্যাড পাঠায়, সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করে। স্কুল বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই পাঁচু ভাবতে লাগল, এ দিকে আর কখনও আসবে না। গোখনার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখবে না। বি টি রোডের ওপারে গোখনার তেমন লোকজন নেই। তেমন হলে, গোপেশ্বর দত্ত স্কুলের পিছন থেকে ঠেক তুলে নিয়ে, ও রাস্তার ওপারে কাঁটাকলের দিকে চলে যাবে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তলপেটে চাপ অনুভব করল কেলে পাঁচু। এদিক ওদিক তাকাল, কোথাও প্রস্রাব করা যায় কি না। স্কুল বিল্ডিংয়ের দরজায় কোলাপসিবল গেট দেওয়া। ভেতরে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাস্তার উল্টোদিকে নিমাইয়ের দোকানের পাশেই ছোট একটা গলতি। পিছনে সামান্য ফাঁকা জায়গায় ঝোপ ঝাড়। অন্য একটা বাড়ির দেওয়াল। ওই জায়গাটা বেছে নিয়েই পাঁচু রাস্তা পেরোল।

প্রস্রাব করার সময়ই ও মোটরবাইক এসে দাঁড়ানোর একটা আওয়াজ শুনল। ইঞ্জিনটা বন্ধ হতেই গোখনার গলা, "মিটিংয়ে কী হল রে নিমাই?"

নিমাইয়ের উত্তর, "মিছিল করে এদিকে আসছে।"

গোখনা হাসল। গলতির মুখটা অন্ধকার বলে পাঁচু বেরোল না। দোকানের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। গোখনা, পুতুল আর নিমাইয়ের সঙ্গে ওর ব্যবধান মাত্র দু'তিন হাতের। ও দাঁড়িয়েই গোখনার মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল। গোখনা বলছে, "ও সব ঠিক আছে। দুপুরে কথা হয়ে গেছে। নাগরিক কমিটির মহিলা সমিতি মাঝে পেয়ারাবাগানে মেলা বসাবে। সব খরচ আমি দেব। ওরা আজ সামান্য হামলা করবে আমাদের গদিতে। তারপর চুপ করে যাবে।"

নিমাই হাসল, "তুমি গ্রেট, গোখনাদা। শোনো, পাঁচুদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি গদিতে যেতে বললাম। গেল না।"

গোখনার প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য পাঁচু দম বন্ধ করে রইল। গোখনা মুখ চোখ

খিঁচিয়ে উঠে বলল, "শুয়োরের বাচ্চাটাকে আটকে রাখলি না কেন ? আমার সঙ্গে বেইমানি করছে। দেখ তো গেল কোথায় !

নিমাই বলল, "এই তো এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। তোমাকে দেখে বোধহয় সরে পড়েছে।"

গোখনা হিসহিস করে বলল, "পালাবে কোথায় ? তিনদিন ধরে ম্যাসেঞ্জার ফিরে আসছে খালি হাতে। শুনলাম, শালা নাকি এখন থেকে সন্তুর হয়ে কাজ করবে। বেশি কমিশন পাচ্ছে। অত সোজা। আমার এরিয়া থেকে সরে পড়া ? কালিয়া আছে গদিতে ? ওকে মাল নিয়ে রেডি থাকতে বল। মিছিলটা চলে গেলে আজই ওকে ধরতে হবে।"

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গোখনার প্রতিটা কথা শুনল পাঁচু। কালিয়ার নামটা শুনে ওর বুকটা একবার ধক করে উঠল। গোখনার ডান হাত এখন কালিয়া। রতা ধরা পড়ার পর কালিয়ার পদোন্নতি হয়েছে। বিহারের ছেলে। নকশাল আন্দোলনের সময় পালিয়ে এসেছিল। কিছুদিন আসানসোল বেল্টে সুরজভান সিংহের কাছে ছিল। গোখনার কাছে শেল্টার নিয়েছে এখন। ওয়াগনব্রেকিং লাইনে দেখাশুনো করে।

মোটরবাইকে স্টার্ট দিল গোখনা। নিমাইকে বলল, 'এখান থেকে এখন সরে যা। পুতুলকে বলে দিয়েছি, গদি ফাঁকা রাখতে। শাটার নামিয়ে দিতে। আমি রণেনদার কাছে যাচ্ছি। কালিয়াকে ওখানে পাঠিয়ে দিবি।

বাইক ঘুরিয়ে নিয়ে গোখনা দমদম রোডের দিকে চলে গেল। হেড লাইটটা একবার ছুঁয়ে গেল পাঁচুর সিঁটিয়ে যাওয়া শরীরকে। চোখে পড়লে আর রক্ষা ছিল না। পাঁচু মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করল হাঁফ ছেড়ে, মুখটা বাড়িয়ে দেখল গদির দিকে রওনা দিয়েছে নিমাই। পাঁচুর একবার ইচ্ছে করল, ছুটে গিয়ে পাছায় লাথি মারে। গোখনা নজরের বাইরে চলে যাওয়ার পর থেকেই একটু একটু করে ওর সাহস ফিরে আসছে। শালা, সন্তুবাবু তোমায় এমন শিক্ষা দেবে, বাপের জন্মেও ভুলবে না। সন্তুবাবু অনেক করিতকর্মা লোক। এই ক'দিনেই বুঝে গেছে গোখনা ডুবছে। আরও ডুববে। পাঁচু ভাবল, শালা সারাদিন আমরা তোমার জুয়াচুরির খিদমত খাটব আর তুমি গদিতে বসে রাজা উজির মারবে, এ চলবে না। আমারও একটা জীবন আছে। একটা সুন্দরী বউ আছে। লেখা পড়ায় ভাল ছেলে আছে। সন্তুবাবু বলেছে, ওর হয়ে কাজ করলে বেশি পয়সা দেবে। খারাপ লোকদের সংস্পর্শে আর থাকবে না, ঠিক করে গলতি থেকে বেরিয়ে এল পাঁচু। রাস্তা পেরিয়ে ফের গিয়ে দাঁড়াল স্কুলবাড়ির সিঁড়িতে। সেই মুহূর্তেই ও দেখতে পেল, সাউথ সিঁথি রোডের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। স্নায়ুগুলো টানটান করে ও দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িতে ওর পাশেই একটা লোক দাঁড়িয়ে। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বুঝল, স্কুলের দারোয়ান। সেও মিছিল দেখার জন্য বেরিয়ে এসেছে। লোকটা বলল, "অব মজা আয়েগা। সালে লোগ, বহুত খতরনাক হ্যায়। ইধার আভি স্কুল মে ভি কভি কভি আ ঘুসতা।" লোকটা তাকিয়ে থেকে সমর্থন চাইল। পাঁচু ঘাড় নেড়ে বলল, "আপনে সহি বাত বোলা।"

মিছিলটা দ্রুত কাছে এসে বাঁক নিল ডান দিকে রাজাবাগানে। অনেকের হাতে পোস্টার। একেবারে সামনের দিকে কয়েকজন কনস্টবল লাঠি হাতে। মিছিলের

পিছনে একটা পুলিশের জিপ। পঞ্চাশ-ষাট জনের মিছিল। কী মনে করে পাঁচু লাইনে ঢুকে পড়ল। জিপের সামান্য তফাতে ও হাঁটতে লাগল রাজাবাগানে গোখনার গদির দিকে। মিছিলটা কিন্তু গদির সামনে দাঁড়াল না। সোজা চলে যাচ্ছে সেভেন ট্যাংক লেনের দিকে। দ্রুত পা চালিয়ে ও মিছিলের সামনের দিকে চলে এল। কয়েকটা অল্প বয়সী ছেলে শ্লোগান দিচ্ছে সাট্টার বিরুদ্ধে। দেখে মনে হল, পার্টির ছেলে। মিছিলের মধ্যে চুপ করে থাকলে পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই পাঁচু গলা মেলাল। রোববার সন্ধ্যায় রাস্তায় লোকজন বিশেষ থাকে না। আশপাশের বাড়ি থেকে লোকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। সাউথ সিঁথি রোডের মুখে ফিরে এসে, কাঠগোলায় ঢুকতেই পাঁচু সরে পড়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। গোখনা বলেছিল, গদিতে সমান্য হামলা হবে। কই, তা তো হল না ? পুলিশ আছে বলে হয়তো কেউ ঝামেলায় গেল না। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল কাঠগোলার মোড়ে দীপ্তি ধৌতাবাসের কাছে।

রিক্সা স্ট্যান্ডে একটা জলের কল দেখতে পেল পাঁচু। সঙ্গে সঙ্গে ও মন ঠিক করে ফেলল। ডানদিকের লাইনে সরে গিয়ে, শেষে বেরিয়ে এল। কলের দিকে ঝুঁকে জল খেতে খেতে ও আড়চোখে লক্ষ করল, মিছিলটা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জল খাওয়ার ফাঁকে সময় নষ্ট করার জন্য ও চোখ মুখ ধুতে লাগল। যতক্ষণ না শেষ লোকটা পেরিয়ে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়াল না। এই জায়গাটাতেই কয়েক দিন আগে রতা মার্ডার করেছে এক রিক্সাওয়ালাকে। সম্ভবাবুর খুব চেনা রিক্সাওয়ালা। সম্ভবাবু বলেছে, রতাকে পাওয়া যাবে না। তাই গোখনাকে দেখে নেবে। এমন শিক্ষা দেবে, যাতে কোনওদিন আর মাস্তানি করতে না পারে।

সামনেই একটা মিষ্টির দোকান দেখে পাঁচুর হঠাৎ প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও দেখল, দশ টাকার কয়েকটা নোট আছে। খাস্তা কচুরি খেতে এক সময় ওর খুব ভাল লাগত। গোটা চারেক খাস্তা কচুরি কিনে ও দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই খেতে লাগল। একবার ভাবল, যমুনার জন্য কয়েকটা নিয়ে যাবে। পরক্ষণেই সম্ভবাবুর মুখটা ভেসে উঠল। না, বরানগরে ওস্তাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে যেতে হবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা তো হবেই।

খাওয়া শেষ হতেই হাতের ঠোঙাটা দোকানের পাশে রাখা একটা ড্রামে ফেলে, ফের কলের সামনে গিয়ে পাঁচু দু'আজলা জল খেয়ে নিল। পেটে কিছু পড়তেই মাথাটা একটু সাফ হয়ে গেল। ও যাবে সিঁথির মোড়ের দিকে। সাউথ সিঁথি রোড ধরে হাঁটলে মিনিট দশেক। একটা রিক্সা নিলে হয়। ভেবেও পাঁচু মত বদলাল। সপ্তাহে ছয়দিন বসে বসে কাজ। হাঁটা হয় না। অথচ আগে...।

হাঁটতে হাঁটতেই পাঁচু মনে করার চেষ্টা করল গোখনার প্রতিটা কথা। কালিয়াকে রেডি থাকতে বলল। সাট্টার বুকিদের নিয়ে এই এক সমস্যা। ওরা দু'ধরনের লোক নিয়ে সাট্টা চালায়। এক ধরনের লোক হচ্ছে পেনসিলাররা। যারা পয়সা এনে দেয় সারা দিন খেটে। আরেক ধরনের লোক হচ্ছে, গুণ্ডা-মাস্তান। এদের কাজ পেনসিলারদের ওপর নজরদারি করা। আর সে জন্য কমিশন নেওয়া। পাঁচুর এখানেই আপত্তি। গোখনা আট পার্সেন্টের বেশি কমিশন দেবে না। ছয় পার্সেন্ট পায় পেনসিলাররা। বাকি দু'পার্সেন্ট, কোনও কাজ না করেই ফালতু পেয়ে যায় মাস্তানরা। এতদিন ওই দু'পার্সেন্ট নিয়ে যেত রতা। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার আগে

আপত্তি জানিয়েছে পাঁচু। এখন রতা নেই। তাই দু'পার্সেন্ট ওকে দেওয়ার কোনও প্রশ্নও নেই।

গোখনার সঙ্গে বিরোধ এই দু'পার্সেন্ট কমিশন নিয়েই। সাধারণত দিনের শেষে পেনসিলারের কাছে যত টাকা জমা পড়ে, তার থেকে কমিশন কেটে রেখেই বাকি টাকাটা ম্যাসেঞ্জারের হাত দিয়ে বুকির ঘরে পাঠিয়ে দেয় পেনসিলাররা। মাঝে একদিন আট পার্সেন্ট কমিশন কেটে রেখেই কেলে পাঁচু বাকি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল গোখনার গদিতে। এই কারণেই চটে গেছে গোখনা। কিন্তু ও চটলে কিচ্ছু করার নেই পাঁচুর। ও মনে মনে বলল, "অনেক শোষণ করেছ আমাকে। আর পারবে না। সন্তুবাবু পুরো আট পার্সেন্টই দেবে বলেছে। এটা হাতছাড়া করা যায় না। রতা যদ্দিন বাইরে ছিল, ঝামেলা করার ক্ষমতা রাখত। কেন না, কালোয়ার পট্টির চোলাইয়ের ঠেকে ওর অনেক চ্যালা। এখন আর সেই ভয় নেই। কালিয়ার পক্ষে বি টি রোডে এসে মাস্তানি করা সম্ভব না।

এ সব ভাবতে ভাবতেই পাঁচু পৌঁছে গেল সিঁথির মোড়। ওখানে চায়ের দোকানে এ সময় আড্ডা মারে সন্তুবাবু। দোকানে খোঁজ করতেই একজন রুক্ষস্বরে জানতে চাইল, কী দরকার ? সন্তুদা এখন ব্যস্ত রয়েছে, দেখা হবে না।

পাঁচু নিজের পরিচয় দিয়ে, প্রয়োজনটা বোঝাতেই ছেলেটা বলল, "এখানে দাঁড়াও। আগে সন্তুদাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" দোকানের পিছন দিক দিয়ে ছেলেটা ভেতরে গেল। পাঁচু এ বার বেঞ্চে বসল। দোকানে আরও তিন-চারজন বসে। ওদের মধ্যে একজনকে একটু চেনা-চেনা মনে হল। ভাল করে দেখতেই, মনে পড়ল— বঙ্কু। ক'দিন আগেও, এই বঙ্কু বাবুলালের কাজ করত কাশীপুরে ছোটেলালের কাছে। তবে ওর এরিয়া কুটিঘাটের দিকে। ও কী করছে এখানে ? সন্তুবাবু কি ওকেও হাত করেছে ?

ছেলেটা এসে বলল, "চলো সন্তুদা তোমায় ডাকছে।" পাঁচু বেঞ্চ থেকে উঠে ওর পিছু নিল। দোকানের পিছন দিক দিয়ে একটা বস্তির অলি-গলি পেরিয়ে ছেলেটা নিয়ে গেল একটা একতলা বাড়ির সামনে। পাঁচু বুঝতে পারল— রামলাল আগরওয়াল লেন। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান-হাতে একটা ঘরে ও সন্তুবাবুকে দেখতে পেল। চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘর। দু'টো টেলিফোনও আছে। সোফায় একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে বসে।

সন্তুবাবু হেসে বলল, "আরে পাঁচুদা, এসো। এক মিনিট বসো। আগে এর সঙ্গে কথা বলে নিই।"

সন্তুবাবুর হাতে একটা টেপ রেকর্ডার। মেয়েটাকে বলল, "আমার এতেই কাজ হয়ে যাবে। তুমি কি এখনই বাড়ি ফিরে যাবে ?"

মেয়েটা বলল, "দাদা-বৌদি বিকালের দিকে কামদেবপুর না কোথায় যেন গেছে। আসতে আসতে দশটা বেজে যাবে।"

—কী জন্য গেছে ? বাচ্চা-কাচ্চা ?"

মেয়েটা হেসে বলল, "হ্যাঁ, ওখানে নাকি ভর হয়। পীরবাবার থান আছে।"

সন্তুবাবু বলল, "পীরবাবা-টাবা দিয়েও হবে না।"

—যা, বলো না। বৌদির মনে খুব কষ্ট।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তুবাবু এবার বলল, "রাধি, তুমি একটু বসো। দশটা বাজতে এখন অনেক দেরি। আগে পাঁচুদাকে আমি ছেড়ে দিই।" বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল সন্তুবাবু। তারপর ডেকে নিয়ে ঢুকল অ্যান্টি চেম্বারে।

নিমাইয়ের দোকান থেকে সিঁথির মোড়ে এসে পৌঁছনো নিয়ে সব কথা সন্তুবাবুকে জানাল পাঁচু। তারপর বলল, "গোখনার হয়ে আমি আর কাজ করব না। তোমার এ দিকে কদ্দুর ওস্তাদ?"

সন্তুবাবু বলল, "গুছিয়ে এনেছি। লালবাজারের অ্যান্টি রাউডি সেকশনের লোকজনের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেছে। এখনও লোকাল থানা ম্যানেজ করতে পারিনি। দু'একদিনের মধ্যেই ও সি-র সঙ্গে মিটিং। তারপর তোমাকে খবর দেব।"

পাঁচু বলল, "দিন তিনেক কোনও কারবার নেই। আমার তো, জানোই, দিন আনি দিন খাই অবস্থা।"

"আমার কাছ থেকে অ্যাডভান্স কিছু নিয়ে যাও।" বলতে বলতে পার্স খুলে পাঁচশো টাকার একটা নোট বের করে দিল সন্তুবাবু। "বি টি রোডে গোখনাকে আর ঢুকতে দিচ্ছি না। বরানগরেও ঢুকতে দেব না বাবুলালকে।"

টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পাঁচু বলল, "একটু বুঝে শুনে সব করবে ওস্তাদ। গোখনা খুব খতরনাক লোক। কালিয়া বলে একটা ছেলে আছে ওর হাতে।"

সন্তুবাবু হাসল, "মাস্তানি করে লাভ হবে না আমার সঙ্গে। গোখনার গদিতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে আসব তা হলে। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে পাঁচুদা। তাঁতিপাড়ায় একটা ডেয়ার ডেভিল ছেলে আছে। নাম জিতেন। পুলিশ ওকে একটা পেটি কেসে ধরেছে। ওকে ছাড়িয়ে আনার কেউ নেই। আমি ওকে ছাড়াব। উকিলও ফিট করেছি। তোমাকে ওর বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। ওর মা-বাবাকে জানিয়ে আসতে হবে ; আমার নাম করে, আমি ওকে ছাড়াচ্ছি। ছেলেটাকে আমার দরকার।"

পাঁচু ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, "আমাকে কি এখনই ওখানে যেতে হবে?"

সন্তুবাবু একটু চিন্তা করে বলল, "পারলে এখনই যাও। আমার কাছে খবর আছে, কালই ওকে কোর্টে তুলবে।"

তাঁতিপাড়া খুব বেশি দূরে নয়। রিক্সা করে গেলে বড়জোর মিনিট আটেক। পাঁচু মনে মনে হিসাব করে নিল, ওখান থেকে বাড়ি ফিরতে আরও আধ ঘন্টা লেগে যাবে। যমুনা একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছিল। সন্তুবাবুর সঙ্গেই অ্যান্টি চেম্বার থেকে ও বেরিয়ে এল। বেরিয়েই দেখতে পেল মেয়েটাকে। এক ঝলক সামনাসামনি দেখে ওর খুব ভাল লাগল। ওস্তাদের সঙ্গে এই মেয়েটার কি ভালবাসা আছে? দু'জনের কথা শুনে অবশ্য সেটাই মনে হচ্ছিল। কেলে পাঁচু ভাবল, দু'জনকে কিন্তু ভাল মানাবে। কোথায় থাকে মেয়েটা? নিশ্চয়ই আশ-পাশে। আরেকবার মুখটা দেখার জন্য ও তাকাল। না, এই অঞ্চলে মেয়েটাকে ও কোনওদিন দেখেনি।

...জিতেনের বাড়ি ঘুরে বিবিবাজারে পৌঁছবার পর পাঁচু একটু ক্লান্তি অনুভব করল। বিকালে গোখনার গদিতে যাওয়ার পর থেকেই ও এক ধরনের টেনশন অনুভব করছিল। সন্তুবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর সেই টেনশন ধুপ করে চলে গেছে। নিজের বাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, রাস্তায় একটা

মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে দেখতেই ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। গোখনার বাইক না ? রাত আটটা-ন'টার পর সাধারণত এই অঞ্চলে রাস্তায় কেউ থাকে না। কাছেই রেল লাইন। পাঁচু সরাসরি বাড়িতে না ঢুকে রেল লাইনের দিকে গেল। লোহার রেলিং টপকে চুপিসাড়ে চলে এল নিজের বাড়ির পিছন দিকে। পুরনো আমলের বাড়ি। নীচের তলায় তিন ঘর লোক থাকে। গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। খুব সকালে অফিস যেতে হয় বলে একটু তাড়াতাড়িই ওরা শুয়ে পড়ে। পাঁচু থাকে দোতলায় দু'টো ঘর নিয়ে। বাড়ির পিছন দিকে একটা লোহার সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় বাথরুমে।

পা টিপে টিপে পাঁচু সোজা উপরে উঠে এল সিড়ি দিয়ে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ। দরজা থেকে জানলার দিকে যাওয়ার জন্য একটা কার্নিশ আছে। বেশ চওড়া। হামাগুড়ি দিয়েই ও জানলায় চলে গেল। পর্দা সরিয়ে কিছু দেখতে পেল না। জানলার শিকগুলো অনেক দিন হল মরচে পড়ে ভেঙে গেছে। একটু চাড় দিতেই সেই শিক হাতে উঠে এল। দু'হাতে চাপ দিয়ে পাঁচু কোনও শব্দ না করে ঢুকে পড়ল বাথরুমের ভেতরে। এই বাড়িতে ও বহুদিন আছে। সব কিছুই জানা। অন্ধকারের মধ্যেও ধীরে ধীরে ও এগিয়ে গেল শ্যামুর ঘরের দিকে। ওখান থেকেই ও গোখনার গলা শুনতে পেল, "এই মাগি, তোকে আজ ল্যাংটো করে নাচাব।"

গোখনার গলা আসছে শোয়ার ঘর থেকে। ওকে দেখার জন্য নিঃশব্দে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই পাঁচু এগোল সেদিকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল, সোফার উপর পা তুলে বসে আছে গোখনা। বাইরে, ছাদের দিকে দরজায় কালিয়া দাঁড়িয়ে। ওর একটা হাত প্যান্টের পকেটে। পাঁচু বুঝতে পারল, ওর পকেটে কী আছে। যমুনাকে দেখতে পেল না পাঁচু। ও উল্টোদিকে আছে।

গোখনা এ বার বলল, "শুয়োরের বাচ্চাটা যতক্ষণ না আসে, আজ এখানেই বসে থাকব। বোঝাপড়া করে তবে যাব।"

যমুনার গলা শোনা গেল, "ও আজ ফিরবে না। বাগনান গেছে।" স্পষ্টই ভয়ার্ত সেই গলা। শুনে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল কেলে পাঁচুর।

গোখনাকে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। সোফায় বসে পা দু'টো বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ও বলল, "তা হলে তো আরও ভাল হল। রাতটা এখানে কাটিয়ে যাব। তুই তৈরি হ। সারা রাত ধরে নাচ দেখব। তোর স্বামী একটা খাঁটি শুয়োরের বাচ্চা। ওকে মেরে লাভ নেই।"

গোখনার প্রতিটি কথায় ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে। পাঁচু বুঝতে পারছে না, কী করবে। ওদের সঙ্গে গায়ের জোর দেখাতে গেলে পারবে না। মাঝখান থেকে রক্তারক্তি হবে। লোক জানাজানি হবে। জানাজানির ভয়েই, নীচে নেমে গিয়ে ও লোক ডেকে আনার কথা ভাবতে পারল না। কালিয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয়ই খালি হাতে নয়। নিষ্ফল আক্রোশে পাঁচুর সারা শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলায় নিমাইয়ের সামনে হুমকি দিয়েছিল গোখনা। তখনই আন্দাজ করে নেওয়া উচিত ছিল। তবে গোখনা যে বাড়িতে এসে চড়াও হবে, পাঁচু তা ঘুণাক্ষরে ভাবেনি।

ওই ঘর থেকে ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেল পাঁচু। পেনসিলারের বউ হওয়ার অভিশাপ ছাড়া আর কী। এ রকম কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি কোনওদিন হয়নি ওর

যমুনা। গোখনা ওকে যা করতে বলছে, যমুনা সেটা করার কথা ভাবতেও পারে না। বিয়ের এত বছর পরেও, লাইট না নেভানো পর্যন্ত ও পাঁচুকে শরীরে হাত দিতে দেয় না। ছাদের দিকে দরজায় একটা গ্রিল লাগাবার কথা বহুদিন ধরে বলছিল যমুনা। ওর কথা আগে শুনলে আজ গোখনা ঘরে ঢোকার সুযোগ পেত না। এর আগে গোখনা মাত্র একবারই এ বাড়িতে এসেছে। শ্যামুর জন্মদিন, না পুজো উপলক্ষে মনে নেই। খুব দামি খেলনা বন্দুক নিয়ে এসেছিল ও। আজ ওর হাতে আসল রিভলভার।

যমুনাকে কাঁদতে দেখেই বোধহয় খিঁচিয়ে উঠল গোখনা, "যা, যা মাগি, অত বাওয়াল করিস না। এক জাগ জল নিয়ে আয়। আগে শালা খানিকটা মাল পেটে যাক। তারপর তোর দিকে মন দেব।" এ ঘর থেকে, টেবলে ঠক্ করে কিছু রাখার শব্দ শুনল পাঁচু। সাট্টার বুকিদের যে সব বদ অভ্যাস, সব কিছুই আছে গোখনার। এর একটাই কারণ, কাঁচা পয়সা। রাত বারোটায় বোম্বে থেকে ক্লোজ খেলার খবরটা, আসার পরই, গদিতে বসে যায় মচ্ছব। নিজেকে গরম করার জন্যই গোখনা আজ মালের বোতল সঙ্গে এনেছে।

পাঁচু দেখল, গোখনা গায়ের টি শার্টটা খুলে ফেলেছে। ফরসা, লোমশ ওর গা। টি শার্টটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলল। ওর ডান কাঁধে গোল একটা গর্ত। নকশাল আমলে পুলিশের গুলি খেয়েছিল। পেটে সামান্য চর্বি হয়েছে। সমৃদ্ধির লক্ষণ, হারামের পয়সা খেয়ে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওকে দেখতে দেখতে। দাঁতে দাঁত চেপে ও বলল, "শালা আমি শুয়োরের বাচ্চা? আমাদের মতো পেনসিলারদের রক্ত চুষে চুষে তুমি রোয়াবি মারছ। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব।"

যমুনার শাড়ির অংশ এ বার দেখতে পেল। জলের জাগ আনার জন্য ও এ ঘরের দিকে আসছে। দ্রুত দরজার পাশে সরে দাঁড়াল পাঁচু। ও জানে, এ ঘরে এসে প্রথমেই লাইট জ্বালাবে যমুনা। লাইট জ্বালালেই সর্বনাশ। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে। যমুনা ঘরে ঢুকতেই পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল পাঁচু। যমুনার শরীরটা একবার ভয়ানক কেঁপে উঠল। আতঙ্কে পাছে ও চিৎকার করে ফেলে, এই আশংকায় পাঁচু মুখটা চেপেই রইল। কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে কানে ফিস ফিস করে বলল, "চুউপ। আমি। আওয়াজ কোরো না।"

দু'তিন সেকেন্ড পর যমুনার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। বউয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। পাঁচু হাত ধরে টানল। বাথরুমের দিকে ইশারা করে যমুনাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বাথরুমের ছিটকিনিটা খোলার সময় যাতে কোনও শব্দ না হয়, সে জন্য একটু সময় নিয়ে, খুব সতর্কভাবে ছিটকিনিটা নামাল। বাইরে লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। প্রথম ধাপে পা দেওয়ার আগে ওরা দু'জন গোখনার গলা শুনল, "অ্যাই, ভেতরে কী করছিস? এত সময় লাগছে কেন জল আনতে?"

boiRboi.com

পাত্তি টু পাত্তি

গত কয়েক দিন ধরে, রাধি লক্ষ করছে, বৌদির মন-মেজাজ খুব খারাপ। কারও সঙ্গে খুব একটা কথা বলছে না। অন্য ফ্ল্যাট থেকে কেউ গল্প করতে এলেও এড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিন প্রায় শুয়ে বসেই কাটায়। সেদিন রাতে কামদেবপুর থেকে ফিরে আসার পরই বৌদির মধ্যে আশ্চর্য এই পরিবর্তন।

বাড়িতে অদ্ভুত রকমের গুমোট। দাদার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে বৌদির। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। এখন তো, রাধিই মাধ্যম। দাদা বলবে, "রাধি, ওকে বল আলমারির চাবিটা দিতে।" "রাধি, কর্পোরেশন থেকে কেউ ফোন করলে বলতে বলিস, অফিসে যেন চলে যায়।" অথবা, "দিলু ফোন করেছিল। ওর মা ওকে একবার ভবানীপুরে যেতে বলেছে।" বৌদির ট্যামোর খুব বেশি। যখন মুখে কুলুপ দেয়, দাদার উদ্দেশে একটা কথাও বলে না। আগে রাগারাগিটা এত হত না। হলেও বোঝা যেত না। ও বাড়িতে দাদার ভাইয়েরাও থাকত। এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে ঠোকাঠুকিটা বেড়েছে।

দাদার জন্য খুব মায়া হয় রাধির। আগে বয়স কম ছিল, সব বুঝত না। হঠাৎই যেন অভিজ্ঞতাটা বেড়ে গিয়েছে বিশেষ করে, নারী-পুরুষের গোপন সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পর। সন্তুদাই পাকিয়ে দিয়েছে। একেক সময় রাধিকে নিয়ে যা করে...। কানের কাছে, দাদার সম্পর্কে অসভ্য কথা বলে। সন্তুদা জানে, দাদাকে ও খুব শ্রদ্ধা করে, তাই রাগায়। মাঝে মাঝে দাদার ওপর রাগও হয়। দাদা কি জানে না, বৌদির কাছে প্রায় দিনই বিপ্লব দাদাবাবু আসে? বিপ্লব দাদাবাবু এলেই বৌদির মুখের ঢং পাল্টে যায়। শোয়ার ঘরে বসে দু'জনে কত কথা। সোহাগ যেন উথলে ওঠে বৌদির। ভদ্রলোকের বউ বলে আবার নিজেকে।

বিপ্লব দাদাবাবু ও বাড়িতে খুব কম আসত। এই ফ্ল্যাটে আসার পর যাতায়াত বেড়েছে। বৌদির সঙ্গে সম্পর্কটা কী, তা একদিন বিপ্লব দাদাবাবুর ফোন ধরে বুঝতে পারে। বৌদি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না চান করার সময়। রাধি কী যেন একটা কাজ করছিল। টেলিফোনের শব্দ শুনে বৌদি বলল, "এই, ফোনটা ধর। দাদাবাবু করলে বলবি বাথরুমে।"

ফোনটা তুলে কানে দিতেই, "কী করছিলে সোনা, এতক্ষণ?"

রাধি গলা শুনে বুঝতে পেরেছিল বিপ্লব দাদাবাবু। এমনি গাঁক গাঁক করে কথা বলে। ফ্ল্যাটে এলে সব ঘর থেকেই ওঁর গলা শোনা যায়। রাধি মিহি স্বরে বলেছিল, "হ্যালো।"

ওদিকে বিপ্লব দাদাবাবু বোধহয় শুনেছিলেন, 'বলো।' গাঁক গাঁক করে বললেন, "বলো মানেটা কী। বলবে তো তুমি। আজ খুব ইচ্ছে করছে। যাব? অনেকদিন হয়নি।"

রাধি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিছু বলার আগে ও প্রথমে বাথরুমের দিকে তাকিয়েছিল। না, জলের শব্দ আসছে। বৌদির বেরোবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফোনে ফের বিপ্লব দাদাবাবুর গলা শুনেছিল, "কী, চুপ করে আছ কেন? শরীর খারাপ

করে রেখেছ নাকি ? আমি কিন্তু ওসব মানব-টানব না। তোমার কাজের মেয়েটা সেলাই স্কুলে যাবে না ?"

রাধি ধরা পড়ার ভয়ে শুধু বলেছিল, "হুঁ।"

"তাহলে দুপুরের দিকে আমি যাচ্ছি।" বলেই ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। ওঁর কথা শুনে, সারা গা গরম হয়ে উঠেছিল রাধির। সেদিন খুব কৌতূহল হয়েছিল। দাদাবাবু না থাকলেই লোকটা বেশি আসে। একবার ভেবেছিল, সেলাই স্কুলে যাবে না। দেখবে দুপুরবেলায় দু'জনে মিলে কী করে। কিন্তু এতটা সাহস হয়নি। বিপ্লব দাদাবাবু যদি ফোনের কথা তোলে, বৌদি আস্ত খেয়ে ফেলবে তাহলে। ওই দিনই রাধি বুঝতে পেরেছিল, দাদা সেলাই স্কুলে ওকে ভর্তি করে দেওয়ার কথা তোলার পর, বৌদি কেন আর আপত্তি করেনি। ভালই হয়েছে। দুপুরে বাইরে বেরোতে না পারলে, সন্তুদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাধির এত বাড়তই না।

সন্তুদা একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল বিপ্লব দাদাবাবুর কথা। সেলাই স্কুলে না গিয়ে সেদিন ও গিয়েছিল সিঁথির মোড়ে সন্তুদার অফিসে। দু'জনে সোফা-কাম-বেডে শুয়েছিল। তার আগে অনেকক্ষণ ধরে আদর খেয়েছিল সন্তুদার। রাধির সারা শরীর অবশ হয়ে ছিল। চোখ বুজে ও আদরের রেশটা অনুভব করছিল। হঠাৎ পাশ ফিরে সন্তুদা বলেছিল, "তোমাদের বাড়িতে বিপ্লববাবু বলে কেউ আসে রাধি ?"

চোখ বুজেই ও উত্তর দিয়েছিল, "হুঁ।"

—কখন আসে ? রোজ আসে ?

—মাঝেমধ্যে। যখন দাদাবাবু থাকে না।

সন্তুদা বলেছিল, "হুঁ। যা শুনেছি, ঠিক তাহলে। বৌদির কাছে আসে, তাই না ?"

চোখ খুলে রাধি তাকিয়েছিল সন্তুদার দিকে। ঘাড় নেড়ে বলেছিল, "হ্যাঁ।"

—ওরা কী ধরনের কথাবার্তা বলে, শুনেছ কোনওদিন।"

—খুব অসভ্য সব কথা।" বলেই রাধি ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

—তুমি নিজের কানে শুনেছ ? তোমার সামনেই বলে ?

—আমি তো তখন আমার ঘরে থাকি। শুধু শুনিনি, অনেক কিছু দেখি।

—কী দেখেছ ?

—সে তোমাকে বলা যাবে না।

—লালি বৌদি তো বেশ খলিফা মহিলা ! তুমি আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে ?

রাধি এবার উঠে বসেছিল সোফাতে। ব্লাউজের হুক লাগাতে লাগাতে বলেছিল, "কী কাজ করতে হবে বলো ?"

—ওই বিপ্লব ব্যাটা আমাদের থানার ও সি। ওকে পকেটে নিয়ে আসতে হবে।

কথাটা রাধি ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই জিজ্ঞাসা করেছিল, থানার ও সি কী গো ?

—আরে, ও সি হচ্ছে দারোগা। তোমার ওই বিপ্লব দাদাবাবু এক নম্বরের মাল্লুখোর। সেই সঙ্গে মাগিবাজ। এর আগে সল্ট লেক থানায় ছিল। সেখানেও রোজ একটা বিধবা মেয়েছেলের বাড়িতে যেত। ও যে থানায় যায়.... যাক গে, তুমি আমার এই কাজটা করে দাও।

রাধি অবাক হয়ে সব শুনছিল। বিপ্লব দাদাবাবু পুলিশ ! কই, পুলিশের পোশাক

পরে তো আসে না। বিপ্লব দাদাবাবু বৌদির খুব ছোটবেলা থেকে চেনা, এক পাড়ার লোক। এ কথাটা রাধি জানতে পেরেছিল, একদিন দাদাবাবুর মুখ থেকে। সেদিন দাদাবাবু খুব রেগে গিয়েছিল। রাধির মনে পড়ল, রতার সঙ্গে যেদিন সন্তুদার মারপিট হল, সেদিন রাতে বৌদি কিন্তু একবার বলেছিল, বিপ্লবকে একবার ডেকে আনলে হয়। রাধি এইবার বুঝতে পারছে, বৌদি কেন ওই কথাটা সেদিন বলেছিল।

সন্তুদা বলেছিল, "তোমাকে আমি একটা মিনি টেপ রেকর্ডার দেব। এরপর যেদিন বিপ্লব ব্যাটা তোমাদের বাড়িতে ফস্টিনস্টি করতে যাবে, সেদিন ওদের কথাবার্তাগুলো তুমি টেপ করে নেবে।"

শুনে রাধি খুব চমকে উঠেছিল। এ কী বলছে সন্তুদা ? টেপ রেকর্ডার শুদ্ধু যদি ধরা পড়ে যায় ? ভয় মিশ্রিত গলায় ও বলেছিল, "না বাবা, আমার দ্বারা এ সব কাজ হবে-টবে না।"

সন্তুদার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। চোখে চোখ রেখে বলেছিল, "আমার জন্য এটুকুও করতে পারবে না ? তোমার ভয়টা কিসের ? বৌদি তাড়িয়ে দেবে ? তাড়িয়ে দিলে সটান আমার কাছে চলে আসবে।"

রাধি বিহ্বল হয়ে বলেছিল, "তুমি পুলিশের সঙ্গে লাগতে যাচ্ছ কেন সন্তুদা ?"

"আমার ব্যবসার জন্য দরকার।" সন্তু দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল, "আমাকে প্রচুর টাকা উপায় করতে হবে রাধি। ছোটবেলা থেকে অনেক ইচ্ছে আমি পূরণ করতে পারিনি। টাকা থাকলে সব কিছু পাওয়া যায়।"

....দু'তিনদিন পর, সন্তুদা একটা কাগজের মোড়কে টেপ রেকর্ডার ধরিয়ে দিয়েছিল। কাপড় কাচার সাবানের থেকে একটু বড় সাইজের। ওই দিন চালানো শিখে নিয়েছিল রাধি। এমন কিছু শক্ত নয়। শেষ দিকের দু'টো সুইচ একসঙ্গে টিপে দিলেই হল। ভেতরে ক্যাসেট ঘুরতে থাকবে। সন্তুদা বলেছে, টেপ শেষ হয়ে গেলে আপনা থেকেই সুইচ বন্ধ হয়ে যাবে। টেপ রেকর্ডারটা রাধি লুকিয়ে রেখেছে রান্না ঘরে মশলা রাখার তাকের কোণে। আজকাল বৌদি আর রান্নাঘরের দিকে যায়ই না।

এ ক'দিন বিপ্লব দাদাবাবু আসেনি। আজ দুপুরে আসবে বলল। রাধি ঠিক করেই রাখল, যে করেই হোক সন্তুদার কাজটা আজই করবে। উত্তেজনায় বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল রাধির। বসার ঘরে সোফার দিকে ও একবার তাকাল। যে দিন আসে, বিপ্লব দাদাবাবু ওখানেই প্রথমে বসে। সোফার সামনেই একটা টি টেবল। তলার তাকে খবরের কাগজ আর দু'একটা ফাইল। রাধি ভাবল, ওখানে যদি টেপ রেকর্ডারটা রেখে দেয়, তাহলে চট করে কারও নজরে পড়বে না। জায়গা নির্বাচন করে ও এবার নিশ্চিন্ত হল।

বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে রান্না সেরে ফেলেছে আজ রাধি। এখন ওর হাতে কোনও কাজ নেই। বৌদি চান করে বেরোলেই ও অন্য বাথরুমটায় ঢুকবে। বাড়িতে থাকার সময় আজকাল ও ম্যাক্সি পরে। বৌদিই পরে থাকতে বলে। কাজ করা বা চলাফেরায় এতে সুবিধে হয়। হাতে একটা ম্যাক্সি আর গামছা নিয়ে ও বৌদির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাথরুম থেকে বেরোলেই বৌদি জিজ্ঞাসা করবে, কে ফোন করেছিল। রাধি একটা বিশ্বাসযোগ্য উত্তর তৈরি করে রাখল। অনেক সময় ফোন ধরেই বৌদিকে ও বলতে শুনেছে 'রং নাম্বার।'

বাথরুমের ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না দেখে রাধি একবার টোকা দিল দরজায়। আগে আগে বৌদি অনেক সময় নিয়ে চান করত। সেই সময় কেউ বিরক্ত করলে চটে যেত। এমনকী, দাদার ওপরও। এখন কিছু বলে না। ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে, এ বার ও ভেতরে উঁকি দিল। দেখল, বড় আয়নাটার সামনে বৌদি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শায়া ছাড়া আর কিছু নেই। রাধি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, কোমরে মাদুলিগুলি বৌদির হাতের মুঠোয়। হাতের দিকে তাকিয়ে বৌদি কী যেন ভাবছে। আয়নায় রাধির মুখটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বৌদি বলল, "এগুলো পাশের নর্দমায় ফেলে দে।"

রাধি বিশ্বাস করতে পারছিল না বৌদির কথা। দীর্ঘদিন ধরে ও দেখেছে, বৌদি কত বিশ্বাস করত এই মাদুলি-তাবিজে। কত জায়গা থেকে এ সব এনেছে। যে যা বলেছে, করেছে। বাচ্চা যাতে হয়, তার জন্য কত চেষ্টা। আজ কী এমন হল, এগুলো ফেলে দিচ্ছে? রাধি একটু ইতস্তত করছিল; হাত বাড়িয়ে ওগুলো নেবে কি না। কিন্তু বৌদির মুখ দেখে একটু ভয়ই পেল। মাদুলিগুলো হাতে নিয়ে ও বলল, "চান করার পর, ফেলে দেব?"

বৌদি রেগে উঠে বলল, "কেন, এখন ফেলতে অসুবিধে আছে?"

রাধি বলল, "না, ম্যাক্সি পরে রয়েছি, বাইরে বেরোব?"

বৌদি খিঁচিয়ে উঠল, "ম্যাক্সি পরে রয়েছিস তো কী হয়েছে। তুই কী বিশ্বসুন্দরী যে, তোকে সবাই গিলে খাবে?"

বৌদির মেজাজ দেখে রাধি আর কথা বাড়াল না। সদর দরজার দিকে এগোল। অন্য সময় ম্যাক্সি পরা অবস্থায় বাইরে বেরোতে দেয় না। একবার, অনেকদিন আগে, ঘরের মধ্যেই ওই অবস্থায় সন্তুদার সামনে গিয়েছিল বলে বৌদি চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে মেরেছিল। আজ বাইরে যেতে বলছে। একটু আগে বৌদির জন্য হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠেছিল। দরজা খুলে বাইরে বেরোবার সময় সেই ভাবটা উবে গেল। রাধির মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। ভাবল, আর ক'দিনই বা এই বাড়িতে ও থাকবে। সন্তুদা একটু গুছিয়ে নিলেই, ও চলে যাবে। গামছাটা বুকের ওপর ফেলে রাধি বাইরে বেরোল। ইদানীং বুকটা ভারী ভারী লাগে। ম্যাক্সির তলায় কিছু নেই বলে ও সেটা আরও টের পাচ্ছে।

দরজা খুলতেই রাধি দেখল চার তলার বুড়ো নামছে সিড়ি দিয়ে। ওকে দেখে হাসল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ল্যান্ডিংয়ে একবার দাঁড়াল বুড়ো। রাধিকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাল আছিস? কয়েকদিন আগে সিঁথির মোড়ে একটা ছেলের সঙ্গে তোকে গল্প করতে দেখলাম কে রে?

রাধির বুকটা ধক করে উঠল একবার। পরক্ষণেই ও নিজেকে সামলে নিল। বৌদি এখন বাথরুমে। বুড়োর কথা বৌদির কানে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। খুব সহজ গলায় ও বলল, "ও, বোধহয় সন্তুদা। আমাদের বাড়িতে আসে। দাদার খুব চেনা।"

রাধি দেখল, বুড়োর চোখ ওর বুকের দিকে। ইচ্ছে করেই ও বুক থেকে গামছাটা সরিয়ে নিল। যত ইচ্ছে দেখুক বুড়ো। দেখুক, আর জ্বলে মরুক।

বুড়ো বলল, "একদিন আসিস না রাধি আমার ওখানে।"

নিরীহ মুখ করে রাধি বলল, "আজ দুপুরে যাব। বৌদি ঘরে থাকবে না।"

বুড়োর চোখটা চকচক করে উঠল, "আসবি ? সত্যি আসবি ?"

রাধি ঘাড় নাড়ল। মনে মনে ওর খুব হাসি পাচ্ছিল। সারা দুপুর বুড়ো আশায় আশায় থাকবে। থাকুকগে। কাজের মেয়ে বলে এই কিছুদিন আগেও ওর কোনও দাম ছিল না। কেউ চেয়েও দেখত না। এখন অনেক লোক ওর দিকে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। সেলাই স্কুলে যাতায়াতের পথে আজকাল সেটা বুঝতে পারে।

...নর্দমায় মাদুলিগুলো ফেলে, ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে রাধি দেখল, ফোনে বৌদি কথা বলছে কার সঙ্গে। বিপ্লব দাদাবাবুই কি আবার ফোন করল ? একটু থমকে দাঁড়িয়ে রাধি শুনতে চেষ্টা করল, ওর আন্দাজটা ঠিক কি না। বৌদি জিজ্ঞাসা করছে, "কার বাচ্চা আছে বললেন ?" "না, সামনের রোববার যেতে পারব না।" "ছেলে হলে ভাল হয়। পাঁচ-ছয় বছরের।" রাধি বুঝতে পারল, বৌদি কোনও অনাথ আশ্রমের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ও হাঁফ ছাড়ল। বাচ্চা নেওয়ার জন্য বৌদি ইদানীং খুব ক্ষেপে গিয়েছে। কয়েকটা জায়গায় দেখেও এসেছে। কিন্তু পছন্দ হয়নি।

টেলিফোনটা রেখে বৌদি ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো ফেলে দিয়েছিস।"

রাধি বলল, "হ্যাঁ এবার চান করতে যাব ?"

বৌদি কোনও উত্তর দিল না। রাধি কোনও কথা না বলে, এগোল বাথরুমের দিকে। কাজের মেয়েদের মহলে, বৌদির নাম বাঁজা বৌদি। রেবাদির দেওয়া নাম। এ রকম আরও অনেকের নাম দিয়েছিল রেবাদি। দাদা-র নাম ধজো। শ্যামলীদির নাম উটকপালি-ফুল্লরাদির ফুলটুসি। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত রাধির, দাদাকে যখন ধজো বলত। মানেটা একদিন জিজ্ঞাসা করে, ও খুব চটে গিয়েছিল। বড়দের নিয়ে এসব ইয়ার্কি ওর ভাল লাগত না। রেবাদি আরও বেশি করে বলত। বড়লোকদের ওপর রেবাদির খুব রাগ। ও এখন আর পাঁচ নম্বরে নেই। সেই ব্লু ফিলম দেখার পরদিন, ওই ফ্ল্যাটের দাদা-বৌদি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রেবাদি এই অঞ্চল থেকে অবশ্য যায়নি। শেঠ লেনের একটা বাড়িতে কাজ করে। ওই বাড়ির বাচ্চাকে নিয়ে এখনও পার্কের মাঠে আসে। তবে সেলাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে রাধি পার্কের মাঠে যাওয়ার সময় পায় খুব কম। কচ্চিৎ দেখাশোনা হয় রাস্তায়।

চান করার সময় ইদানীং সুখস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন হাঁটতে থাকে রাধি। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দেয়। সর্বাঙ্গ জলে ভেজায়। বৌদির বাথরুমে একটা বাথটব আছে। এই বাথরুমটায় নেই। থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকত সেখানে। সাবান ফেনা জলের মধ্যে। সন্তুদার যখন খুব পয়সা হবে, তখন ওই রকম একটা বাথটবের বাথরুম করে দিতে বলবে রাধি। ওই লোকটা যে রকম অসভ্য, হয়তো বাথটাবে শুয়ে শুয়েই...। এই শরীর থেকে এত আনন্দ, এত সুখ পাওয়া যায় ! চান করতে করতেই রাধি সন্তুদার কথা ভাবতে লাগল। এতদিন ধরে লোকটাকে তো দেখেছে। কই কখনও তো কিছু মনে হয়নি। লোকটাকে দেখে এত শিহরণ জাগেনি। ফাংশানের রাত্তির থেকেই সব বদলে গেল।

শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে রাধি ভাবল, সন্তুদা কি সত্যিই ওকে কোনওদিন এই বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে ? পালেরবাগানে নাকি সন্তুদাদের একটা বাড়ি আছে। তাহলে সেই বাড়িতে ও থাকে না কেন ? বাড়ির কথা বলতে চায় না সন্তুদা। রাধি কোনওদিন তেমনভাবে জিজ্ঞাসাও করেনি। ও শুধু জানে, সন্তুদার বাবা-মা কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজন বলতে আছে এক কাকা আর কাকিমা। সন্তুদার মুখে আর খুব শোনে শুভ্রদার কথা। শুভ্রদার জন্য জান দিয়ে দিতে পারে। রাধির মনে পড়ল, সন্তুদা একদিন ফুল্লরা দিদিমণির কথা জানতে চেয়েছিল। খুব প্রশংসা করে বলেছিল, 'শুভ্রর জন্য আমি ওই মেয়েটাকে বেছে রেখেছি।' সেদিন থেকে রাধিও ভেবেছে, শুভ্রদার সঙ্গে ফুল্লরা দিদিমণিকে সত্যিই খুব ভাল মানাবে।

শাওয়ারের তলা থেকে বেরিয়ে এসে রাধি সাবান খুঁজতে লাগল। বৌদি এখন মাসে দুটো করে সাবান দেয়। বৌদি নিজে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনই চায় সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক। সাবানদানি থেকে সাবানটা নিয়ে রাধি সারা গায়ে মাখতে লাগল। আগে বুক অবধি শায়া রেখে চান করত। অথবা গামছা জড়িয়ে নিত। বৌদির দেখাদেখি এমন পুরো শরীরে কিছু না রেখে শাওয়ারের তলায় দাঁড়ায়। বৌদি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না। রাধি ভাল করে ছিটকিনি দিয়ে তবে ম্যাক্সি বা শাড়ি ছাড়ে। একদিন চান করার আগে শুধু ব্লাউজ আর শায়া পরে ও দাঁড়িয়েছিল বাথরুমের দরজার কাছে। দু'নম্বরের বৌদি কী যেন একটা কাজে তখন এ ফ্ল্যাটে। রাধির দিকে চোখ পড়তেই ও ঘরের বৌদি বলেছিল, "বাঃ কী সুন্দর ফিগার হয়েছে তোর রাধি, তোর মতো পাতলা কোমর যদি পেতাম...।" তারপর এ ঘরের বৌদির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছিল। কথাটা শুনে বৌদির মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। খুব কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল রাধির দিকে।

সন্তুদা যখন কোমরে হাত রাখে, তখন সারা শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। সাবান মাখতে মাখতে রাধি ভাবে, সন্তুদার মধ্যে এক ধরনের জাদু আছে। শুধু বশ নয়, অবশ করেও ফেলে। সন্তুদার জন্য সব কিছুই করা যায়। দু'একদিন অন্তর না দেখলে মনটা উচাটন হয়ে পড়ে। সন্তুদা ব্যবসা করছে। কথাবার্তায় বুঝতে পারে না, ব্যবসাটা ঠিক কী ধরনের। অকশন থেকে একদিন ও প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা কামিয়েছিল। সেদিন প্রচণ্ড খুশির দিন। ডানলপ ব্রিজের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওরা দু'জন চিনে খাবার খেয়েছিল।

চান করার ফাঁকেই রাধি ঠিক করে নিল, সন্তুদা যে কাজের ভার দিয়েছে, সেটা আজই করে দেবে। ভয় পেলে চলবে না। সন্তুদার সঙ্গে থাকতে গেলে ওকে সাহসী হতে হবে। কাজটা এমনভাবে করবে যাতে, কেউ টের না পায়। বিপ্লব দাদাবাবু নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে না। সন্তুদার সঙ্গে যে ওর একটা আলাদা সম্পর্ক আছে সেটা এ বাড়ির কেউ এখনও জানে না। ফাংশানের রাতে সেই ঘটনার পর থেকে তো সন্তুদা আর এ বাড়িতে আসেই না। রাধি ভাবল, কাজ যদি হয়ে যায়, আজ বিকালেই ও টেপ রেকর্ডারটা পৌঁছে দিয়ে আসবে সিঁথির মোড়ে। এ সব জিনিস বেশি বাড়িতে রাখা ঠিক না। বৌদির যা সন্দেহবাতিক, তাতে যে কোনও সময় চোখে পড়ে যেতে পারে।

...দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর রাধি ইচ্ছে করেই বাসন মাজতে শুরু

করল। অন্যদিন সেলাই স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। বৌদি কেবল টিভিতে সিনেমা দেখতে বসে। যেদিন ভাল সিনেমা থাকে না, সেদিন খবরের কাগজে চোখ বেলায়। অথবা সিনেমার বই পড়ে। তারপর ঘুমোয়। দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বৌদিটা মোটা হয়ে গেল। করবেটা কী, কোনও কাজকর্ম নেই। বেশি পয়সা হলে মানুষের এই অবস্থাই হয়। দাদাবাবু খালি খেটে মরে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত। ঘরে শান্তি নেই। বাইরে বাইরেই দিন কাটিয়ে দেয়। দাদাবাবুর মাথায় অনেক চুল পেকে গেছে।

বাসন ধোয়ার ফাঁকেই রাধি কলিং বেলের আওয়াজ শুনল। নিশ্চয়ই বিপ্লব দাদাবাবু এসেছে। ও রান্নাঘর থেকেই কান পেতে রাখল। বৌদি দরজা খুলে দিয়েছে। বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। তারপরই বৌদির বিরক্তিভরা গলা, "আঃ ছাড়ো, কী হচ্ছে কী, রাধি আছে।"

—ও সেলাই স্কুলে যায়নি ?

—না। রান্নাঘরে।

তারপর খানিকটা চুপচাপ। রাধি বুঝতে পারল, দু'জনে এখন বসার ঘরে। বৌদি নিশ্চয়ই একবার রান্নাঘরের দিকে আসবে, দেখে যাওয়ার জন্য ও কী করছে। হলও ঠিক তাই। নিঃশব্দে একবার উঁকি দিয়েই বৌদি ফিরে গেল বসার ঘরে। রাধি মনে মনে হাসল। দিদিমা বলত, পাপ কখনও চাপা থাকে না। যাত্রাদলে বাবার সঙ্গে অন্য একটা মেয়েলোকের সম্পর্কের সূত্র ধরেই দিদিমা ওই কথাটা বলত। দেশের বাড়িতে আর কারও জন্য মন খারাপ করে না, শুধু ওই বুড়িটা ছাড়া। আচ্ছা, সন্তুদার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা জানলে বুড়ি কী বলত ? আর যারা বিয়ের পরও অন্য লোকের সঙ্গে শোয়, তারা পাপ করছে না ? এই যেমন, ওর নিজের মাই তো এখন থাকে মেসোর সঙ্গে। এই যেমন, এই বৌদি...।

বাসনগুলো মুছে, সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে এল রাধি। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দেখল, বিপ্লব দাদাবাবু আর বৌদি মুখোমুখি দুই সোফায় বসে। মাঝে টি টেবল। ওই টেবলের নীচের তাকে খবরের কাগজের ফাঁকে ও টেপ রেকর্ডারটা আগেই রেখে দিয়েছে। এখন শুধু সুইচ দুটো টিপতে হবে। মুহূর্তেই মনস্থির করে নিল রাধি। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল, বাড়িতে এখন থাকলে এরা কিছুই করবে না। বেরিয়ে যাওয়া দরকার। বৌদির দিকে তাকিয়ে ও বলল, "সেলাই স্কুলে যাব বৌদি ? যাওয়া খুব দরকার।"

বৌদি জিজ্ঞাসা করল, "কখন ফিরবি ?"

রাধি বলল, "পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে।"

—তাড়াতাড়ি ফিরিস।

ঘাড় নেড়ে রাধি নিজের ঘরে ঢুকে দ্রুত শাড়ি পাল্টাতে লাগল। শিফনের কচি কলাপাতা রঙের শাড়িটা পরলে ওকে বেশ মানায়। রাধি বুঝতে পারে। শাড়ি পরে, মুখে হালকা পাউডার লাগিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ও ফের বসার ঘরে এল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বিপ্লব দাদাবাবুকে বলল, "আপনাকে একটু কফি করে দেব।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বিপ্লব দাদাবাবু। চারতলার বুড়ো যে চোখে তাকায়, সেভাবে রাধিকে দেখছে। দু'এক সেকেণ্ড পর বলল, "কফি, হ্যাঁ করে দাও।"

কাজ হচ্ছে, রাধি ভাবল, যেমনটা ও করতে চেয়েছিল, সেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে। কান ওর পাতা বসার ঘরে। "তোমার কাজের মেয়েটা দারুণ সেক্সি।" ধমকে উঠল বৌদি, "বাজে কথা বলো না। পুলিশে কাজ করে জানোয়ার হয়ে গেছ।" বিপ্লব দাদাবাবু, "বা রে, আমি অন্যায় কী বললাম।" বৌদি, "ঝি-চাকরের দিকেও তোমাদের নজর। পুরুষ জাতটাই ঘেন্নার।" বৌদির রাগ দেখে বিপ্লব দাদাবাবু হাসছে,"মেয়েটা বেরিয়ে যাক, দেখাচ্ছি কতটা ঘেন্নার।"

মাস চারেক আগেও এসব কথার মানে বুঝত না রাধি। এখন বোঝে। সন্তুদাও মাঝে মাঝে এ ধরনের কথা বলে কানে কানে। তখন শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করে। বৌদিরও কি করে? এটা ভেবেই রাধি সাবধান হয়ে গেল। নিজের ওপর হঠাৎই রাগ হল ওর। কী হয়েছে, সারাদিন ঘুরেফিরে এক ধরনের কথা মনে আসে। ঠিক রেবাদির মতো। খুব বাজে। রাধি কফি করায় মন দিল। এখন অন্য কিছু ভাবলে চলে? আগে সন্তুদার কাজ।

কফি নিয়ে এ ঘরে ঢুকে ও দেখল, বিপ্লব দাদাবাবু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। বৌদিও সোফায় নেই। টি টেবলে কফির কাপটা রেখে রাধি একটু উবু হয়ে নীচে কাগজ খোজার ভান করল। তারপর দ্রুত হাতে সুইচ টিপে দিল টেপ রেকর্ডারের। সন্তুদা বলেছে, ৪৫ মিনিট ধরে টেপ ঘুরে যাবে। তারপর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। শরীর সোজা করার আগে রাধি একবার বিপ্লব দাদাবাবুর দিকে তাকিয়ে নিল। না, দেখেনি। নিশ্চিন্ত মনে ও একবার শোয়ার ঘরে গিয়ে দেঁখল, বৌদি কী যেন বের করছে আলমারি থেকে। অনুচ্চ স্বরে ও বলল, "আমি যাচ্ছি।"

বৌদি ঘুরেই খুব কড়াচোখে তাকাল। তারপর বলল, "এই শাড়িটা পরেছিস কেন? অন্য শাড়ি নেই?"

রাধি বলল, "হাতের কাছে ছিল, তাই।"

বৌদি রাগত স্বরে বলল, "অর কখনও শিফনের শাড়ি পরবি না।"

ঘাড় নাড়ল রাধি। বৌদির স্বর এবার নরম হয়ে এল। বলল, "যা, তাড়াতাড়ি আসিস।"

বসার ঘর দিয়ে সদরের দিকে যাওয়ার সময় রাধি দেখল, বিপ্লব দাদাবাবু হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, ওর দিকে। ও বলল, "আপনাকে কফি দিয়েছি।"

—ও; হ্যাঁ। সোফায় এসে বসল বিপ্লব দাদাবাবু। রাধি জানে, এক সোফায় দু'জনে বসে এখন ফস্টিনস্টি করবে। দরজার বাইরে বেরোবার সময় ও আড়চোখে দেখল, বৌদি এ ঘরে ঢুকছে। বাইরে বেরিয়েই রাধির বুকটা ধক্ করে উঠল একবার।

সিঙ্গল

পরামর্শটা দিয়েছিল সুরজ চাচাই, "বেটা সাট্টা চালাতে গেলে বহুত মেহনত করতে হবে। দিমাক সে কাম করতে হবে। সিরিফ লড়াই-ঝগড়া করলে চলবে না।"

মার্কাস স্কোয়ার থেকে সুরজ চাচাকে তুলে এনেছে সন্তু। পেট ভরে এখন মদ

খাওয়াচ্ছে। খুব খুশি লোকটা। বলছে, "তোদের ইদিগে আগে কারবার চালাত বাবুলাল। এক সময় আমার কাছে বহুত যাতায়াত করত। ও শালা, থানাকে একদম হাত করে ফেলেছিল। ওর এক চাচাতো ভাই ছিল থানায়। তাই ওফিসার লোগ জান পহেচান হয়ে গেছিল। বাবুলাল খিদমত খাটত, ওদের চা সিগ্রেট এনে দিত। তারপর সাট্টার কারবার শুরু করল। শালা, বহুত রুপিয়া কামিয়ে নিয়েছে।"

সুরজ চাচার কথা মন দিয়ে শুনছে সন্তু। ঘরে আর আছে পাঁচু ও চিতা। আগরওয়াল লেনে এটা চিতার অফিস। বাড়িটা একতলা, তিনটে ঘরের। নকশাল আমলে দখল করা। বাড়ির মালিক ও তার দুই ছেলে খুন হয় সেই সময়। ঘর-টর ভাল করে সাজিয়ে নিয়েছে চিতা। সামনের ঘরে অফিস, পিছনের দুটো ঘরে এতদিন ও নিজে থাকত। এখন কুটিঘাটের দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। সেখানে উঠে গিয়েছে। পিছনের ঘর দুটো এখন সন্তুর।

বোতলে চুমুক দিয়ে মাল খাচ্ছে সুরজ চাচা। বুড়ো হলে কী হবে। ভাল টানতে পারে। সন্তু অবাক হয়েই ওর মাল খাওয়া দেখছে। চাচা বলছে, "গোখনা শালাকে হাতে না পারলে ভাতে মার বেটা। শোন সাট্টা চালবার জন্য তিনটে জিনিস খুব দরকার। লোকাল থানাকে হাতে রাখবি। লালবাজারে ভি কানেকশন রাখবি। আর রাইটার্স বিল্ডিংসের লোকেদের খুশ রাখার চেষ্টা করবি। না হলে, বেটা মার খেয়ে বিল্লি হয়ে যাবি।"

রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। আর একটু পরেই খবরটা এসে যাবে। সেই খবরের প্রতীক্ষাতেই সন্তুরা বসে। বিল্লা রাজাবাগানে গেছে। গোখনা আজকেই বরবাদ হয়ে যাবে কি না, সেই খবরটা নিয়ে আসবে। বরবাদ করার প্ল্যানটা আসলে সুরজ চাচার। বাইরে কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে। পাঁচু আর সন্তুই এ সব ছেলেকে রিক্রুট করেছে। সন্তু সবাইকে অবশ্য খুব ভাল চেনে না। বিশেষ করে বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, আড়িয়াদহের ছেলেদের। কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক না। গোখনা নিজের লোক ঢুকিয়ে রাখতে পারে।

বোতলে চুমুক দিয়ে সুরজ চাচা বলল, "মুম্বাই সে জিন আদমি আয়া, ও হারামি এক সময় রতন ছেত্রীর খুব দোস্ত ছিল। আমারও পুরানা ইয়ার, ভাটিয়া বেটা রতন ছেত্রী কে জানিস? মটকার রাজা। নাম শুনেছিস? এখন রিটায়ার করে গেছে। উহ্ আদমি ইতনা রুপিয়া কামায় কি, এক দফে ইংল্যান্ডসে বি বি সি-কা রিপোর্টার আয়া থা উসকা ইন্টারভিউ লেনে কা লিয়ে। লেকিন উহ রিফিউজ কর দিয়া।

মাল যত পেটে পড়ছে, সুরজ চাচার ভাষা তত বদলে যাচ্ছে। ভাটিয়া বলে লোকটা এসে উঠেছে তাজ বেঙ্গলে। সকালে চাচা ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সন্তু লোকটাকে অবশ্য দেখেনি। বোম্বাই থেকে লোকটাকে প্লেনে নিয়ে আসা, হোটেলে রাখার সব খরচা অবশ্য দিচ্ছে সন্তু। দিন সাতেক হল, ও সাট্টা শুরু করে দিয়েছে। লোকে জানে, পাঁচুর সাট্টা, গোখনা ওর বউয়ের ওপর হামলা করেছিল বলে, পাঁচু দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজে সাট্টা খুলেছে। আপাতত এই গল্পটাই বাজারে চালু। সকালে তাজ বেঙ্গল থেকে বেরোবার সময় সন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাটিয়া লোকটার সঙ্গে তোমার কী কথা হল চাচা?"

—আজই দাওয়াই দিতে নামবে। মুম্বাই থেকেই ওরা আরও খোঁজখবর নিয়েছে।

গোখনা গদ্দারি করছে। ওদের লোককে টাকা দিচ্ছে না। শোন বেটা,, ফুলবাগানে গিরধারী যখন পরথম কারবারে নামল, তখন শালে সব রুপিয়া নিজেই গিলে নিত। এই ভাটিয়া জানতে পেরে কলকাত্তায় এল। ওদের বহুত লোক আছে কলকাত্তায়। হর রোজ খবর দেয়। শালে, দু'দিনেই গিরধারীকে টাইট দিয়ে দিয়েছিল।

সন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী রকম ?"

—শোন তা'লে। ধর, ভাটিয়া এল সোমবারে। ওইদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখে নিল। মুম্বাইয়ে কথা বলল। মঙ্গল, বুধ আর গুরুবার কী নাম্বর উঠবে, জেনে নিল। গিরধারী তো এ সব কিছুই জানে না। মুম্বাইয়ের লোক ওর পেন্সিলারের কাছ গিয়েই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার স্টেক খেলল আগে থেকে ঠিক করা নাম্বারে। ব্যস, খেল খতম। পান্তি সে পান্তি মিলিয়ে দিলে এক রুপিয়ার জন্য তোকে দিতে হবে আট হাজার টাকা। ভাটিয়া দশ জায়গায় খেলল এক হাজার টাকা করে। মানে আশি লাখ টাকা। গিরধারী দেঙ্গে কাঁহাসে ? ভাটিয়া হাঙ্গামা করে দিল দশ জায়গায়। শেষকালে গিরধারী বুঝতে পারল, জরুর কিছু বাত আছে। খুঁজে খুঁজে ভাটিয়ার পায়ে এসে পড়ল। আজ শালা, গোখনাকেও ও বরবাদ করে দেবে।

এই বরবাদ করার খবরটা শোনার জন্যই সন্তুরা এখন অপেক্ষা করছে। সূরজ চাচা না থাকলে এ সব কোনও কিছুই ও জানতে পারত না। অকশনেও ইদানীং দু'পয়সা কামিয়েছে সন্তু। ওতে স্রেফ মাস্‌ল পাওয়ার দেখালেই চলে। কিন্তু সাট্টা অন্য ব্যাপার। এর জন্য হাই কানেকশন দরকার। তবে চালাতে পারলে, দারুণ। সাত-আটদিনের মধ্যেই ও লাখ টাকার উপর কামিয়ে নিয়েছে। এর জন্য অবশ্য পুরো কৃতিত্ব কেলে পাঁচুর। লোকটার অর্গানাইজিং ক্ষমতা আছে। গোখনার ওপর ওর জাত-ক্রোধ হয়ে গেছে। যমুনা বৌদিকে নিয়ে সেদিন রাতে পালিয়ে আসার পর সন্তু ওদের আশ্রয় দিয়েছিল। পরদিনই বনহুগলিতে ও বাসা ঠিক করে দেয়। পাঁচুদা এখন জানপ্রাণ দিয়ে খাটছে।

মাল খেতে খেতে সূরজ চাচা বলল, "সান্তু, বেটা, তুই শুধু পুলিশটা দেখ। বাকিটা আমরা চাচা-ভাতিজা সামলে নেব। অ্যান্টি রাউডিতে তোর কোনও জান-পহেচান আছে ?"

সন্তু বলল, "আছে তবে, শুনলাম ওখানে একজন নতুন ডি সি এসেছে। খুব অনেস্ট। একদম পয়সাকড়ি খায় না।"

হো হো করে হেসে উঠল চাচা, "আরে বেটা, অ্যান্টি রাউডিতে তোর নিজের লোকজন না থাকলে তুই সাট্টা চালাবি কী করে। অনেস্ট... হা হা। আরে এই লোকটা অনেস্ট হলে কি হবে, আশপাশের লোকেরা তো ভাল না। শোন তা'লে। কাঞ্জিলালের নাম শুনেছিস বেটা। বড় অফিসার। হাম লোগ বহুত ডরতা থা। উহ্ সাব, কুছ দিন কা লিয়ে অ্যান্টি রাউডি মে আয়া থা। লেকিন, দু'মাসের বেশি থাকতেই পারল না।"

—কেন চাচা ?

—আরে বেটা, কলকাতায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা থানা আছে। হর রোজ একঠো করে থানায় রেইড করে অ্যান্টি রাউডির লোকেরা। মতলব... পেনসিলারদের কাছ থেকে ছিনতাই করতে যাবে। কোন থানা এলাকায় যাবে, সেটা ঠিক করা থাকে।

সাট্টাওয়ালাদের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। হর মাহিনামে এক একবার রেইড। অ্যান্টি রাউডির লোকেদের ওটাই রোজগার। বন্ধ হোনে সে উহ লোগ কুত্তার মতো এসে কাটবে।

সন্তু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল, "যেদিন রেইড হয়, সেদিন পেনসিলাররা পান্টারদের পয়সা দেয় ?"

চাচা দাড়ি চুমড়ে বলল, "কী করে দেবে ? পুলিশ রেইড করেছে, ওর কী করার আছে ?"

সন্তু বলল, "আশ্চর্য তো ! ধরো, একদিন হেভি লোডিং হয়েছে। কিন্তু বহুত নাম্বার মিলে গেছে। আমি তো ইচ্ছে করেই, নিজের লোক পুলিশ সাজিয়ে রেইড করিয়ে দিতে পারি। ব্যস, তাহলে পেমেন্ট করতে হবে না।"

বিস্ময়ে সূরজ চাচা বলে উঠল, "বাঃ। বহুত খুব। আল্লা নে কিতনা ইন্টেলিজেন্স তুসকো দিয়া। তুই পারবি বেটা। তোর দিমাগ আছে। আরে, এটাই তো করে বুকিরা। তোর মাথা খুব সাফ বেটা।"

কেলে পাঁচুর দিকে তাকিয়ে সন্তু হাসতে লাগল। তারপর বলল, "অ্যান্টি রাউডিতে তোমার জানাশোনা আছে ?"

—আগে বহুত ছিল। ওফিসাররা সব বদলে গেছে। তবে তলার লোকজন আমার কাছে আখুনও আসে। সান্তু বেটা, তোকে অনেক খবর দিচ্ছি। আরেকটা বোতল আনা।

চুমুক দিয়ে ম্যাকডাওয়েলের বোতলটা শেষ করে ফেলল চাচা। তারপর বলল, "দুনিয়া মে হর ইনশান কো কুছ না কুছ উইকনেস হোতা হ্যায়। জরুর হোগা। উহ্ উইকনেস তোকে জানতে হবে। কেউ রুপিয়া পেলে খুশি হয়, কেউ স্যুট, লেংথ, কেউ র‍্যান্ডি মাগি পেলে। এক ওফিসার এসেছিল অ্যান্টি রাউডিতে, শুনলাম, সাচ্চা আদমি। কিছুতেই শালাকে লাইনে আনতে পারি না। পাত্তা লাগালাম, শালা কবিতা লেখে, স্টোরি লেখে। লেকিন কেউ ছাপে না। আমি আদমি পাঠালাম। কিতাব ছেপে দেব। কেয়া বোলেগা সান্তু, শালা একদম হাতে এসে গেল।"

সন্তু খুব মজা পাচ্ছিল এসব শুনে। সূরজ চাচা এ লাইনে খুব অভিজ্ঞ লোক। যা বলছে, খাঁটি কথা। ও নিজেও এই লাইনেই এগোচ্ছে। লোকাল থানার ও সি-টাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। বেশি বচরামি করলে একদম ব্ল্যাকমেল করবে। রাধি যেদিন ক্যাসেট আর টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এল, সেদিন চালিয়ে... সব কথাবার্তা শুনে সন্তু অবাক হয়ে গেছিল। এই ক্যাসেটই ওর তুরুপের তাস। বিপ্লব শালা আজ মিটিং ডেকেছে রাত বারোটার সময় কাঁটাকলে একজনের বাড়িতে। গোখনাও আসবে। বিপ্লব এরিয়া ভাগ করে দেবে দু'জনের মধ্যে। গোখনা কি আসতে পারবে ? মনে হয় না। বোম্বাইয়ের লোক ওকে কতটা বরবাদ করল, একটু পরেই সন্তু জানতে পরবে।

মিটিমিটি হাসছিল সূরজ চাচা। চিতা এতক্ষণ চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। গ্লাস শেষ করেই ও উঠে দাঁড়াল, "আজ উঠি রে। এখনি গিয়ে আবার একটা বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ঝামেলা মেটাতে হবে।" সুইং ডোর খুলে ও বেরিয়ে গেল। সূরজ চাচা বলল, "আমাকে বেটা, একটু পৌঁছে দেওয়ার ইন্তেজাম করিস। আজকাল একটু বেশি খেলেই কন্ট্রোল থাকে না।"

সুইং দরজা খুলে চিতা ফের উঁকি দিল এই সময়। বলল, "সন্তু, তোর কাকা এসেছে। তোর খোঁজ করছে। কী বলব।"

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। মাস কয়েক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর, ও আর কোনও খোঁজখবর নেয়নি। কাকা জানল কী করে, ও এখানে আছে? চায়ের দোকানে এসে বোধহয় খোঁজ করেছিল। কাকা একটু দুর্বল বলে, সফট কর্নার আছে সন্তুর। কিন্তু কাকার বউয়ের মুখটা ভেসে উঠতেই ওর মন ফের কঠিন হয়ে ওঠে। যে অবস্থায় ও শেষবার কাকার বউকে দেখেছিল, সেটা আর ও মনে করতে চায় না। চিতাকে বলল, "ভেতরে আনিস না। আমি বাইরে যাচ্ছি।"

বাইরে বেরিয়ে কাকাকে দেখেই সন্তুর খুব খারাপ লাগল। আরও বুড়োটে দেখাচ্ছে। জামা-কাপড়ের অবস্থাও বলার মতো নয়। দীর্ঘদিন বোধহয় স্নান-টানও করেনি। কাকার কাছে গিয়ে ও বলল, কী ব্যাপার, তুমি হঠাৎ এখানে?"

"সন্তু, আমাকে তুই বাঁচা।" কাকা বলল, "তোর কাকিমা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

খবরটা নতুন বলে মনে হল না সন্তুর। নীলু হাজরার কীর্তি বোধহয়। ও ভাবল, একবার বলে, নীলু হাজরার কাছে গিয়ে খোঁজখবর করো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। তারপর বলল, "কবে থেকে?"

কাকা বলল, "দু-তিনদিন আগে।"

"তুমি বাড়ি ফিরলে কবে?"

"এই কিছুদিন আগে। অনেক ধার দেনা হয়ে গিয়েছিল। তোর কাকিমা গয়না বিক্রি করে কিছু টাকা শোধ করে দেয়। আমি শেষ হয়ে গেলাম রে সন্তু। আর বোধহয় দাঁড়াতে পারব না।"

কাকার কথা শুনে সন্তু মনে মনে হাসল। যাকগে, বাড়ি সম্পর্কে ওর এখন কোনও আগ্রহ নেই। নতুন একটা লাইন পেয়েছে। জীবনটাকে অন্যভাবে গড়ার লাইন। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা দিয়ে কোনও লাভ নেই। শুধু শুধু কষ্ট। কাকার মুখের দিকে ও একবার তাকাল। ভাবল, কড়া কথা বলে তাড়িয়ে দেবে। আজ, একটু পরেই বড় একটা ডিল করতে যাচ্ছে। তাই অতটা কঠিন হতে পারল না। আসলে, কাকা কী জন্য এসেছে, তাই বুঝতে পারল না।

ওকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাকা এ বার বলল, "আমি আসানসোলের দিকে চলে যাচ্ছি। ওখানে বিজনেস-টিজনেস করব। তোর কাছে এলাম, বাড়িটার কী হবে জানতে। তুইও তো আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাইছিস না। বিক্রি করে দেওয়া যাক।"

কথাগুলো তীরের মতো এসে বিঁধল সন্তুর বুকে। পালেরবাগানের বাড়িটা কাকা বিক্রি করে দিতে চাইছে? যে বাড়িতে ও মানুষ হয়েছে, যে বাড়ির প্রতিটা ইটকাঠ ওর চেনা, সেই বাড়িতে ওর অধিকার আর থাকবে না? উঠোনের চাঁপা গাছটার কথা ওর মনে পড়ল। মায়ের হাতে পোঁতা গাছ। একমাত্র চিহ্ন। কতদিন ওই গাছটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করেনি।

সন্তু বলল, "বাড়ি বিক্রি করবে, কারও সঙ্গে কথা বলেছ?"

কাকা উত্তর দিল, "সে রকম চেষ্টা করিনি। তবে নীলুটা কিনতে চাইছে। দু'লাখ

টাকার মতো দিতে চাইছে। তুই অর্ধেক পাবি।"

সন্তু বলল, "এক লাখ পেলে তুমি খুশি!"

ঘাড় নাড়ল কাকা। 'বাড়িটার তো কিছু নেই। জায়গার দামটাই। এর বেশি উঠবেও না। কাঠা পাঁচেক জায়গা তো হবেই।"

মুহূর্তেই মন ঠিক করে নিল সন্তু। বলল, "সামনের মাসে ঠিক এই সময়টায় এসো। একলাখ তুমি পাবে। কাগজপত্রে সই করে দিয়ে যেও। নীলু হাজরাকে বিক্রি করে লাভ নেই। আমি ঠিক করব।"

কাকা একটু অবাক হল শুনে। বলল, "তুই এখন কী করছিস?"

সন্তু সরাসরি উত্তর দিল না। পাল্টা প্রশ্ন করল, "আসানসোলে তুমি একলা চলে যাবে?"

"কী করব বল। অনেক খোঁজ করলাম। তোর কাকিমার কোনও খবরই পেলাম না।"

"থানায় জানিয়েছ?"

"না।" কাকা বলল, "সুইসাইড করবে, কদ্দিন ধরেই ভয় দেখাচ্ছিল। নীলু ছাড়া আর কাউকে কিচ্ছু জানাইনি।"

কথাটা শুনে সন্তুর ইচ্ছা করল কাকার পাছায় একটা লাথি মারে। ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে ও মনে মনে বলল, "শালা কাল সকালেই নীলু হাজরাটাকে একবার তুলে আনতে হবে।" মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ও কাকাকে বলল, "থানায় একবার জানিয়ে রাখলে পারতে।"

"নীলুটা বারণ করল।"

সন্তু আর কথা বাড়াতে চাইল না। মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরিয়ে যেতে পারে। কাকাকে ও বলল, "মাসখানেক পর তুমি একবার আমার এখানে এসো। আমি কাগজপত্র রেডি করে রাখব। নীলু হাজরা না, অন্য পার্টিকে আমি দেখছি, যাতে আরও বেশি টাকা পাওয়া যায়।"

কাকার উৎসাহ যেন হঠাৎ কমে গেল। নিরাসক্ত গলায় বলল, "দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস কর।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তু দেখল প্রায় দশটা বেজে গিয়েছে। আর দেরি করা যায় না। ও বলল, "ঠিক আছে। এসো তা হলে। আমার একটা মিটিং আছে। এখুনি বেরোতে না পারলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না।"

কাকা চলে যেতেই সন্তু ফিরে এল ভেতরের ঘরটায়। দেখল, সুরজ চাচা নিচু গলায় কী যেন কথা বলছে পাঁচুদার সঙ্গে। এ যেন একটা অন্য জগৎ। অনিবার্য আকর্ষণে ও ছুটে যাচ্ছে এই জগতের দিকে। নিজের চেয়ারে এসে বসতেই ওর হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। শুভ্রদের বাড়ি থেকে ফিরে একটা সময় ওর মন যখন খুব খারাপ হয়ে যেত, সেই সময় বাবা বলতেন, "চেষ্টা করলে তুইও পারবি সন্তু আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে। আমি তো জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। আর তোদেরও কষ্টের মধ্যে মানুষ করলাম। এখন বুঝি সততার কোনও মূল্য নেই।"

বাবার কথা ভাবলেই সন্তুর মনটা শক্ত হয়ে যায়। ফিলজফি নিয়ে পাস করার পর থেকে এই ক'দিন আগে পর্যন্তও— চাকরির জন্য কম অ্যাপ্লিকেশন করেনি ও। দু'চার

জায়গায় ইন্টারভিউও দিয়েছিল। কিন্তু চাকরি হয়নি। শুভ্ররা এই সব কথা জানে না। ওরা ভাবত, বরানগরে স্রেফ আড্ডা মারতে যেত সন্তু। মোটেই তা নয়। ওখানে টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখতে আসত। টাইপ স্কুলে যাতায়াতের সময়ই চিতার সঙ্গে দেখা এবং ক্রমশ বন্ধুত্ব বেড়ে ওঠা।

—জিতেনকে একটু ডাকো তো পাঁচুদা। কী একটা মনে পড়ায় সন্তু বলল।

পাঁচু উঠে গিয়ে ডেকে আনল জিতেনকে। তাঁতিপাড়ার এই ছেলেটাকে সন্তু কিছুদিন আগে নিজেই উকিল দিয়ে কোর্ট থেকে ছাড়িয়ে এনেছে। একসময়ে গোখনার হয়ে কাজ করত। বোধহয় কোনও ঝামেলা হয়। ওকে টাইট দেওয়ার জন্যই, গোখনা পুলিশ দিয়ে তোলায় জিতেনকে। কয়েকটা ফলস চার্জ দিয়েছিল। সন্তু ভাল উকিল দেওয়ায় কোর্ট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। জিতেন ডেঞ্জারাস ছেলে, তবে বিশ্বস্ত। ওর হিট লিস্টে এক নম্বরে আছে গোখনা। সন্তু ওকে দিয়ে আরও একটা কাজ করাচ্ছে। এগুলো এ লাইনে করাতেই হয়। ওকে কেলে পাঁচুর ওপর নজর রাখতে বলেছে। এ গদ্দার, ইজ এ গদ্দার, অলওয়েজ এ গদ্দার। অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও এটা জানে না।

—সন্তুদা কিছু বলবেন? জিতেন জিজ্ঞাসা করল। ও খুব কম কথা বলে।

—কাল সোনাপট্টি গিয়ে নীলু হাজরা বলে একজনকে তুলে আনবি আমার কাছে।

—কখন আনব?

—দুপুরের দিকে।

—ঠিক আছে। রগড়ানো দরকার?

—খুব বেশি না। আমার কাকার বউটাকে ফুঁসলে কোথাও নিয়ে গিয়ে রেখেছে। পেট থেকে সেটা বের করাবি।

—ঠিক আছে।

সূরজ চাচা একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য উসখুস করছে। সন্তুকে বলল, "এত দেরি হচ্ছে কেন রে বেটা? তোর লোকটা ফিরল না?"

বলতে বলতেই ফোন। সন্তু রিসিভার তুলে বিল্লার গলা পেল, "ওস্তাদ, গোখনার এখানে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। পাল্টাররা এসে চেল্লাচ্ছে।"

—কী হল, পুরোটা বল।

—গোখনা আজ সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ডাউন। ভাটিয়া ভাই আমার সঙ্গেই আছে। একটা বুথ থেকে ফোন করছি। সূরজ চাচার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সূরজ চাচা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়েছিল। সন্তু রিসিভারটা ওর হাতে তুলে দিতেই একটু অবাক হল। ইশারায় সন্তু বলে দিল, ভাটিয়া কথা বলতে চায়।

—হা হা। ফোনে কথা বলতে লাগল সূরজ চাচা। ঠিক হ্যায়... কুছ আদমি ভেজুঙ্গা ক্য। উহু শালে আভি কাঁহা... ছোড়না মাত... রেন্ডি কা আওলাদ... উসকো কুত্তা কো মৌত হোনা চাহিয়ে... হা হা হা হা.. কাল সুভে হোটেল মে মিলুঙ্গা... সুক্রিয়া...।

ফোনটা রেখে দিল চাচা।

—কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ল সন্তু, "কী খবর চাচা?"

—গোখনা শালে ভাগ গিয়া। সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার পেমেন্ট দিতে হবে ওকে

আখুন। পান্টাররা রাজাবাগানে হুজ্জত করছে। ইট-পাথর ভি মেরেছে ওর গদ্দিতে। হা হা হা...শালার দিমাগে ভি আসবে না, কোথা থেকে কী হোলো ?

—ভাটিয়া ভাই দু'তিন দিন আরও থাকবে তো ?

—হা হা, ওকে বলেছি। শালে, বেশরম...বলে কি না, এত কাজ করে দিল...রেন্ডি পাঠাতে।

সন্তু আর পাঁচু চোখাচোখি করল। একটু অস্বস্তি নিয়েই সন্তু বলল, "এত রাতে, অ্যারেঞ্জ করা যাবে ?"

—তোরা বেটা কোনও খবর রাখিস না। কলকাত্তা শহরে এটা রাত হল ? দে, ফোনটা দে। আমি অ্যারেঞ্জ করছি।

পকেট থেকে পুরনো একটা টেলিফোন গাইড বের করে নম্বর খুঁজতে লাগল সূরজ চাচা। তারপর উৎসাহের সঙ্গে বলল, ডায়াল কর...।

সন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডায়াল করল। ও প্রান্তে এক মহিলার গলা, "হ্যালো।" রিসিভারটা সঙ্গে সঙ্গে চাচার হাতে ধরিয়ে দিল সন্তু।

—বানু বাই। সূরজ। হোটেল তাজ বেঙ্গল। রুম নাম্বার হাজার চৌদ্দা। স্বপ্না কো ভেজ দেনা। মুম্বাই সে দোস্ত আয়া। পেমেন্ট মেরে পাস লেনা। সুক্রিয়া। আদাব। ফোন রেখে দিল সূরজ। তারপর বলল, "মেরা কাম খতম। বেটা, দু হাজার টাকা দে। রেন্ডির পেমেন্ট দিতে হবে।" এত সহজভাবে কথাটা বলল যে সন্তু চমকে, বেশ চমকেই উঠল।

....রাত প্রায় এগারোটার সময় সন্তু একটু ফাঁকা হয়ে গেল। সূরজ চাচাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে পাঁচুদা। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সন্তু সোফায় একটু গা এলিয়ে দিল। আর ঘণ্টাখানেক পরেই থানার ও সি বিপ্লবের সঙ্গে মিটিং। পাঁচুদা টাকা দিতে গিয়েছিল এ মাসে, ও সি নেয়নি। আরও বেশি চায়। লোকে জানে, সাট্টা চালাচ্ছে পাঁচু। কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। হয়তো গোখনার লোকেরাই খবর দিয়ে দিয়েছে। গোখনাও মাঝে একবার লোক পাঠিয়েছিল সন্তুর কাছে। সাট্টা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। লোকটাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দেয় জিতেন।

আজ দুপুরে একবার রাধি এসেছিল ঘণ্টা খানেকের জন্য। রাধি এলেই জিতেন অফিস ঘরের বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। ফালতু কোনও লোককে তখন ঢুকতে দেয় না। সন্তু ওকে এটা করতে কখনও বলেনি। তবুও, ও জানে কখন কী করতে হবে। রাধিকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গিয়েছিল সন্তু। ওকে কাছে পেলেই যেন রক্তে আগুন লেগে যায় এখন। নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন প্রথম রাধির শরীরের স্বাদ নিতে নিতে সন্তু ভেবেছিল, ও কোনও পাপ করছে না। তীব্র মিলনেচ্ছার নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে মাত্র। এবং তাও রাধির অনিচ্ছায় নয়। ওর শরীরের প্রতিটি কোষও যেন উন্মুখ হয়ে সাড়া দিচ্ছিল সেই রিপুর তাড়নায়। ওই একটা দিনেই জীবন সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল সন্তু। সোফায় বসে থাকতে থাকতে, দুপুরে রাধির কামনা-তাড়িত মুখটা মনে করে সন্তু একটু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। সুখের একটা গরম হাওয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে। ও সোফার পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে মনে করতে লাগল রাধির প্রতিটি কথা। বিছানায় ওকে জড়িয়ে ধরে রাধি চোখ বন্ধ

করে শুয়েছিল স্খলিত দেহে। সন্তুর ডান হাত ওর পিঠের তলায়। সুন্দর শ্যামপুর গন্ধ ওর চুলে। অনেকক্ষণ পর রাধি বলেছিল, "রোজ রোজ এ সব করছ, যদি কিছু হয়ে যায়।"

সন্তু বলেছিল, "হোক না। তারপর দেখা যাবে।"

—আহা, বৌদি তা হলে চুলের মুঠি ধরে বের করে দেবে। দাদাবাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

—দাদাবাবু আগে নিজে পয়দা করুক তো।

ফিক করে হেসে ফেলেছিল রাধি, "আচ্ছা, ওদের বাচ্চা হয় না কেন বলো তো?"

সন্তু ফাজলামি করে যা বলেছিল, তা শুনে রাধি কানে আঙুল দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "রক্ষে করো। আর না। সত্যি বলছি, বৌদিটা যা করছে, দাদাবাবুর মুখের দিকে আর তাকানো যায় না।"

—বিপ্লবের কথা জানে?

—নিশ্চয়ই জানে। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞাসাও করে।

—তুমি কী বলো?

—আগে বলতাম, না। এখন বলে দিই। বৌদি অবশ্য জানে না।

—যদি জেনে যায়।

—কী আর হবে। তুমি তো আছ।

—আমি যদি তোমাকে না নিই।

—না নিলে গঙ্গার ঘাট তো খোলাই আছে।

—ওখানে কী করবে গিয়ে?

—জ্বালা জুড়োব।

—পারবে না। কাশীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বর, সব জায়গায় আমার লোক আছে। ধরে তুলে আনবে।

—দমদম স্টেশন তো আছে। ট্রেনে মাথা দেব।

—পারবে না। ওই সময় কারেন্ট অফ হয়ে যাবে। ঠিক তোমার গলার কাছে এসে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, তা হলে গোখনার কাছে চলে যাব।

—কী বললে? রাধিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল সন্তু। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল রাধির মুখ। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

—আর একবার যদি ওই নামটা মুখে আনো, তা হলে তোমার সঙ্গে আর সম্পর্কই রাখব না।

অসহ্য রাগে সন্তু উঠে পড়েছিল বিছানা ছেড়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোখনার নামটা ও সহ্য করতে পারে না। হারানদা মার্ডার হওয়ার পর থেকে বদলা নেওয়ার জন্য ওর শরীরে আগুন জ্বলছে। রতা এখন জেল হাজতে। ছাড়া পাবে বলে মনে হয় না। ধৌতারাসের যতীনদা আর নাগরিক কমিটির লোকেরা ওর বিরুদ্ধে ডায়েরি লিখিয়ে এসেছেন। দল বেঁধে পুলিশ কমিশনারের কাছেও গিয়েছিলেন। খবরের কাগজে রানার বাবা খুব লিখেছিলেন সেই ক'দিন। গোখনা সবাইকে বলছে বটে রতার জন্য কিছু করবে না। কিন্তু সন্তু জানে,

উকিল লাগিয়েছে জামিনের জন্য। গোখনার লেজে ও পা দিয়েছে সাট্টার কারবার খুলে। গোখনা সহজে ছাড়বে না। ওর সঙ্গে একদিন টক্কর লাগবেই। এক জঙ্গলে দুই সিংহ থাকতে পারে না।

ফোঁপানোর শব্দ শুনে সন্তু ফিরে তাকিয়েছিল বিছানার দিকে। বালিশে মুখ গুঁজে রাধিকে কাঁদতে দেখে মুহূর্তেই ও গোখনার কথা ভুলে গিয়েছিল। খুকুমণিদার একটা কথা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়— একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে...। সিগারেটটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও ফের এসে বসেছিল বিছানায়। জোর করে রাধিকে বুকের কাছে তুলে নিয়েছিল।

নিরালা থেকে রাধিকে ডেকে নিয়ে আসতেই হবে, আজ না হোক কাল তো বটেই। ওকে বিয়েও করবে। তবে লোক দেখিয়ে নয়। শুভ্রকে ডাকবে। বিউটিফুলকে ? ও কি আসবে ? বোধহয় লজ্জা পাবে, ওদের বাড়িরই একটা কাজের মেয়েকে বিয়ে করছি বলে। শুভ্রটা সত্যিই ম্যাদামার্কা। একদিন ঘাড় ধরে ওকে বিউটিফুলের সামনে বসিয়ে দিতে হবে। মাঝে একদিন রানা আর মলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সিঁথির মোড়ে। দু'জনে মিনি বাসে কোথাও যাচ্ছিল। বিউটিফুলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই রানা বলেছিল, "এই তো এখুনি আমাদের সঙ্গে ছিল। রিক্সায় বাড়ি চলে গেল।" সন্তুর খুব আফসোস হয়েছিল। হারানদার মার্ডারের খবর শুনে বিউটিফুল সে দিন কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। সন্তু আর রানা, শুভ্রর সঙ্গে ছুটে গিয়েছিল থানায়। বিপ্লবকে সন্তু সে দিনই প্রথম দেখে।

....বিপ্লবের কথা মনে হতেই সন্তু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজায় নক করার শব্দ। জিতেনের মুখটা উঁকি দিল, সাড়ে এগারো বাজে। কাঁটাকলে যাবেন তো ?

—হ্যাঁ, চল। এই বেরোচ্ছি।

—কিছু নিয়ে যেতে হবে ?

—চেম্বারটা সঙ্গে নিস। গোখনা রেডি হয়ে আসতে পারে। আমরা খালি হাতে যাব না।

—কিসে যাবেন ?

—রিক্সায়। বি টি রোড দিয়ে নয়। পলিটেকনিক স্কুলের পিছন দিয়ে, সাবধান থাকা ভাল।

—ঠিক আছে। দরজা বন্ধ করে জিতেন সরে গেল। ড্রয়ার খুলে চেম্বারটা কোমরে গুঁজে নিল সন্তু। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বড় কাজে আজ যাচ্ছে। ওকে জিততেই হবে। টেবল থেকে টেপ রেকর্ডার আর ক্যাসেটটা তুলে নিতে ও ভোলেনি। পকেটে ঢুকিয়ে ও নিশ্চিন্তবোধ করল। এই ক্যাসেটটাই আজ ওকে জেতাবে। হঠাৎ ওর মেজাজটা হালকা হয়ে গেল।

সিঁথির মোড়ে এসে সন্তু দেখল, মোড়ে মালের দোকানটা এখনও খোলা রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে দোকানে গিয়ে ও দু'বোতল সিব্যাসরিগাল কিনল। একটা কিট্ ব্যাগ সঙ্গেই এনেছে জিতেন। ব্যাগে বোতল দু'টো ভরে, সেটা ও জিতেনের হাতে দিল। বিপ্লব শালাকে ভেট দিতে হবে। সাদা পোশাকটার কল্যাণে এই সব লোক এখন সমাজের রক্ষক। কিছু করার নেই। দু'জনে মিলে ওরা একটা রিক্সায় চেপে বসল। ঘুর পথে কাঁটাকলে যাবে। রিক্সাওয়ালাটা একটু অবাক হলেও কোনও প্রশ্ন করল

না। রাত পৌনে বারোটায় এ সব অঞ্চলে লোকজন খুবই কম। আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে রিক্সাটা যাচ্ছে। ছোটবেলায় দলবেঁধে ওরা এই জায়গাগুলোতে দুগ্গা ঠাকুর দেখতে আসত। কোনও কোনওবার পিসিমণি একা ছাড়ত না শুভ্রকে। হারানদার রিক্সায় পাঠাত। জীবনটা অনেক সহজ ছিল তখন। ক্লাস এইট-নাইনে একটা ফুচকাওয়ালাকে বেদম মার মেরেছিল সন্তু। এখানেই কোনও প্যাণ্ডেলের কাছে। ব্যাটা গুনতিতে ভুল করে বেশি পয়সা চেয়েছিল শুভ্রর কাছে। সে কথা মনে হতেই সন্তুর খুব হাসি পেল। স্কুলে একবার অতুল স্যার মারতে মারতে ওকে বলেছিলেন, বড় হলে তুই পাক্কা ক্রিমিনাল হবি। সন্তু মনে মনে বলল, আপনার আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে স্যার। দরকার হলে আমায় ডাকবেন।

কিছুক্ষণ পরেই রিক্সাটা গড়িয়ে এসে নিঃশব্দে থামল কাঁটাকলের সামনে। সন্তু আশপাশ দেখে নিয়ে নামল। ডানদিকে কোণের বাড়িতে বিপ্লব থাকবে। মাঝেমধ্যে ওই বাড়িতে রাতের দিকে মাল টানতে আসে। বাড়িটা বোধহয় কোনও পার্টির, কালোয়ারেরও হতে পারে। কে জানে শালা, বিপ্লবের সঙ্গে কী সম্পর্ক। বাড়ির সামনে গোখনার বাইকটা নেই। তার মানে এখনও আসেনি। আসবে কী করে? সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার ধাক্কাটা আগে সামলাক। কাল আরও সাড়ে পাঁচ লাখ, পরশু হয় আরও কিছু বেশি। কত টাকা আছে ওর?

বাড়ির বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সন্তু সতর্ক হয়ে গেল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, কী দরকার?

—ও সির সঙ্গে মিটিং আছে। সন্তু যথাসম্ভব ভদ্রভাবে বলল।

—দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করে আসি। লোকটা পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "আসুন।"

ঘরের ভিতরে ঢুকে সন্তু দেখল, হাফ হাতা গেঞ্জি পরে বিপ্লব দাঁড়িয়ে। হাতে মালের গ্লাস। উল্টোদিকে আর একজন বসে। লোকটাকে কখনও দেখেছে বলে সন্তু মনে করতে পারল না।

বিপ্লব লোকটার হাইট ভাল। সন্তু মেপে নিল, ওরই সমান হবে। তবে পেটে চর্বি। সে দিন থানায় বিপ্লব বসেছিল বলে বুঝতে পারেনি, একসময় লোকটা সত্যিই হ্যান্ডসাম ছিল। এই লোকটার সঙ্গে কত দিনকার প্রেম খুকুমণিদার বউয়ের? রাধি বলেছিল, ছোটবেলায় নাকি ওরা ভবানীপুরে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। গাঁক গাঁক করে বিপ্লব জিজ্ঞাসা করল, "তোর নামই সন্তু?"

—সনৎ রায়চৌধুরী।

—ক'দ্দিন শুরু করেছিস সাট্টা?

—বেশি দিন না। সন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল। ওকে এখনও বসতে বলা হয়নি। ঠিক বুঝতে পারছিল না, সোফায় বসবে কি না।

—গোখনার সঙ্গে লড়ে পারবি?

বসে থাকা লোকটা হাসল। সে দিকে তাকিয়ে উত্তর দিতে গিয়েও সন্তু চুপ করে গেল।

বিপ্লব বলল, "তোর ক'টা ঠেক?"

—গোটা কুড়ি হবে।

—বাঃ বাঃ, এই ক'দিনেই এত লোক জোগাড় করেছিস। তোর এলেম আছে। বোর্ডে কত হয় ?

—বেশি না। ষাট সত্তর হাজার।

—থাম। ধমকে উঠল বিপ্লব, সত্যি কথা বল। লাখ দুয়েক হওয়ার কথা।

—ডাল যাচ্ছে বিপ্লববাবু। পুজোর সময় হলে হয়তো ওই অ্যামাউন্ট হবে।

বিপ্লব একটু থমকে, সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "শালা তুই লেখাপড়া জানা ছেলে, এ লাইনে কেন এলি ?"

—এটাও তো এক ধরনের বিজনেস।

—বিজনেস, না তোর বিচি।

—বিপ্লববাবু, আপনি অযথা মুখ খারাপ করছেন। আবার থমকে সন্তুর দিকে তাকাল ও সি। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে দিয়ে বলল, "চুপ। একদম তুলে নিয়ে যাব, বেশি কথা বললে।"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। ও চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রয়েছে ও সি-র দিকে। উপযুক্ত সময়ে পাল্টা ঝাড়বে। নিরীহ গলায় ও বলল, "গোখনা তা হলে এল না।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিপ্লব বলল, "আসবে। আসবে। তোর মতো চুনোপুঁটিকে ও ভয় পায় নাকি ?"

সন্তু কথাটা উপেক্ষা করেই বলল, "সোফায় বসব ?"

বসে থাকা লোকটা বলল, "বসুন, বসুন।"

সন্তু বসল, পায়ের ওপর পা তুলে। ইচ্ছা করেই ওভাবে বসল। ও সি-কে চটাবার জন্য। সেদিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকিয়ে বিপ্লব বলল, "তুই থাকিস কোথায় ? পালের বাগানে না কোথায় থাকতি, না ?"

সন্তু বলল, "হুঁ।"

বিপ্লব বলল, "তোর কাকিমা না কে, তাকে তো গোখনা নিয়ে গিয়ে তুলেছে জ পুরে। জানিস ?"

সন্তু নিরাসক্ত গলায় উত্তর দিল, "না। এই শুনলাম আপনার কাছে।"

পায়ের নখ থেকে একটা রাগ চড়াৎ করে উঠে গেল মাথায়। কিন্তু তা প্রকাশ করল না।

—কাকিটাকেও লাইনে নামিয়েছিস। খলিফা ছেলে। তোর কাছেও তো একটা মেয়ে যায় শুনেছি। কে ?

সন্তু বলল, "এগুলো আমার পার্সোনাল ব্যাপার বিপ্লববাবু। কাজের কথা বলুন।"

—উ উ, পার্সোনাল ব্যাপার। ঠিক, ঠিক। তা, তোর আর কী পার্সোনাল ব্যাপার আছে ?

—খবর নিন।

বিপ্লব ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। বোতল থেকে মাল ঢেলে আবার চুমুক দিল। ক'পেগ টেনেছে বিপ্লব ? সন্তু লক্ষ করতে লাগল ও সি-কে।

—আমাকে টেন পার্সেন্ট দিবি। ঘোষণা করার ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে উঠল বিপ্লব।

—না, বিপ্লববাবু। পার্সেন্টেজ নিয়ে ঝামেলা হয়। তার চেয়ে মান্থলি টাকার কথা

বলুন।

—হাজার দশেক দিবি।

—তা হলে, গোখনার এরিয়ায় আমাকে ঢুকতে দিতে হবে। এ দিকে ডি গুপ্ত লেন, আটাপাড়া থেকে শুরু করে ওদিকে রায়পাড়া পর্যন্ত।

খিঁচিয়ে উঠল বিপ্লব, "গোখনা তোকে ছেড়ে দেবে?"

সন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "সে আমি লড়ে নেব। আপনারা নাক গলাবেন না।"

বিপ্লব বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "গোখনাকে তুই হিসাবের মধ্যেই আনছিস না? তুই ওর স্ট্রেংথ জানিস?"

—ম্যাচ করে যাব। সন্তু মিথ্যে কথা বলল, আর কয়েকটা তো দিন মাত্র। ওকে তুলে নিচ্ছে লালবাজার। সি পি স্টেপ নিচ্ছে।

—তুই এত খবর পেলি কোথায়?

—লোক আছে। গোখনা আজ আসবে না। দেখে নেবেন। ও বুঝে গেছে, দিন ঘনিয়ে এসেছে।

বিপ্লব হঠাৎ আগ্রহ প্রকাশ করল, "কী ব্যাপার?"

—নাগরিক কমিটির লোকেরা ওকে টিকতে দেবে না। ওরা একটা মেলা করবে পেয়ারাবাগানে। গোখনার কাছে ডোনেশন চেয়েছিল, দেয়নি। সন্তু এখন মিথ্যের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ও তাকিয়ে দেখল, বিপ্লবের ঘাড় কাত হয়ে গেছে। কী যেন ভাবছে। কিটব্যাগ থেকে সিবাসরিগালের বোতল দু'টো বের করে ও টেবলের ওপর রাখল। মনে মনে বলল, "এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না।"

স্বগতোক্তি করল ও সি, "শুয়োরের বাচ্চাটা কথা দিয়েও এল না কেন? সাড়ে বারোটা বাজে।"

—বললাম, ও আসবে না।

বিপ্লব বলল, "ঠিক আছে। তুই যা। পরে ডেকে নেব। আগে খোঁজ নিই, যা বললি সত্যি কি না।"

—না বিপ্লববাবু, যা করার এখনই ঠিক করে দিন। তা হলে দশ হাজারই দেব। ওই এরিয়া আমার।

—ধাপ শালা। গোখনা তোর এরিয়ার জন্য তো আমাকে পনেরোও দিতে পারে।

—যা পাচ্ছেন নিয়ে নিন বিপ্লববাবু। পরে হয়তো দশও পাবেন না।

—মানে? কী বলতে চাস?

—আপনার পার্সোনাল ব্যাপার। বলতে ঠিক মন চাইছে না। বলেই সন্তু ঘরে বসেথাকা অন্য লোকটার দিকে তাকাল।

—বল, বল শালা।

—সল্ট লেকে যখন আপনি ছিলেন, একজন বিধবা মহিলার বাড়ি রোজ আপনি যেতেন। নাগরিক কমিটির লোকেরা সব জানে। এখানেও নিরালা অ্যাপার্টমেন্টে রোজ আপনি যান। ওরা জানে।

—হোয়াট? চিৎকার করে উঠল বিপ্লব, ওই বাড়িতে যাই, কারণ লালি আমার ছোটবেলার বন্ধু।

—সে জানি না। ওদের হাতে একটা ক্যাসেট গেছে। লালি বৌদি আর আপনার

বেডরুম কনভারশেসন। আপনি জানেন ?

বিপ্লব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে। ঠোঁট ঝুলে গেছে। মুখটা যেন রক্তশূন্য। কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করল, লালিকে তুই চিনিস ?

—আমি না। নাগরিক কমিটির লোকজন চেনে। খুকুমণিদা খুব পপুলার এ অঞ্চলে। যাক্‌গে, তা হলে ডিল দশ হাজারের। তাই তো ?

—শালা, ক্যাসেট না কী বলছিলি ?

—আমার কাছেও একটা আছে। দরকার হলে দিতে পারি। আমার অফারটা তাহলে অ্যাকসেপ্ট...।

খিস্তি মারল বিপ্লব। তারপর মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "তুই কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিস ?"

—ছি ছি। বিজনেস ইজ বিজনেস। গিভ অ্যান্ড টেক। আমার অফারটা না নিলে, কাল থেকে থানার সামনেই ক্যাসেট বাজবে মাইকে। শুনবেন ?

পকেট থেকে মিনি টেপ রেকর্ডার বের করল সন্তু। সেটা টেবলের ওপর রেখে সুইচ টিপে দিল।

সিঙ্গল টু পাত্তি

পিসিমণির জন্য মনটা ভাল নেই শুভ্রর। দিন চারেক হল, উনি বিছানায় শোয়া। লো ব্লাড প্রেশার, ভরত ডাক্তার হাঁটতে-চলতেও মানা করেছেন। ছোটবেলা থেকে কোনওদিন পিসিমণিকে অসুস্থ হতে দেখেনি শুভ্র। তাই খুব উতলা হয়ে পড়েছে। রান্নাঘরের সামনে যেদিন পিসিমণি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান, ও খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল সেদিন। এ বাড়িতে পিসিমণি ছাড়া মাথার ওপর আর কেউ নেই। প্রচণ্ড ভয়ে, শুভ্র বুঝতে পারছিল না, কী করবে ? ঝড়ের গতিতে বাইক চালিয়ে ভরত ডাক্তারকে ও ডেকে এনেছিল।

পিসিমণির জন্য এই কয়েকদিন নেহাত দরকার না হলে ও বাড়ি থেকেই বেরোয়নি। একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় থাকেন পিসিমণি। ওখানেই সোফা-কাম-বেড পেতে এখন রাতে শুচ্ছে শুভ্র। সর্বক্ষণ হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বই পড়ার খুব নেশা পিসিমণির। আজ সকালে চেক-আপ করতে এসে ভরত ডাক্তার বলে গিয়েছেন, পিসিমণি এখন বই পড়তে পারেন। শুভ্র ঠিক করেছে, সন্ধ্যাবেলায় লাইব্রেরি খুললেই বই পাল্টাতে যাবে। পিসিমণির জন্য বই এনে দেবে।

বিকালে বাগানে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল শুভ্র। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। পিসিমণি নিজের হাতে কয়েকটা ফুলের গাছ লাগিয়েছেন বাগানে। কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বটানির প্রফেসর পিসিমণির দূর সম্পর্কের এক দেওর। উনিই গাছ লাগানোর নেশাটা ধরিয়েছেন। বিদঘুটে সব নাম গাছের। ফুলও অদ্ভুত ধরনের। শুভ্র আগে খুব উৎসাহ দেখাত পিসিমণিকে। ইদানীং ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এ দিকে সময় দিতে পারে না।

মনার মা এসে বলল, "একটা মেয়ি তোমার সনে দেখা করতি এয়েচে দাদাবাবু।"

শুভ্র বলল, "কে গো মনার মা ?"

—কে বাপু চিনি না।

—ডাকো এখেনে। হ্যাঁ, পিসিমণি কী করছে গো।

—ঘুমুচ্ছে। বলেই মনার মা চলে গেল।

একটু পরেই একটা মেয়েকে বাগানের দিকে আসতে দেখে শুভ্র অবাক হয়ে গেল। মুখটা অল্প চেনা, কিন্তু ও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে। কম দামের একটা তাঁতের শাড়ি পরা, মুখে প্রসাধনের কোনও চিহ্ন নেই। তা সত্ত্বেও মেয়েটা লাবণ্যময়ী। খুব সপ্রতিভভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

—শুভ্রদা, আমার নাম রাধি। আমাকে চিনতে পারছেন ?

নামটা শুনেই শুভ্র উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আরে চিনি না মানে ? এসো, এসো। বাড়ির ভেতরে চলো।"

—না শুভ্রদা। এখানেই বসুন।

—সন্তু পাঠিয়েছে ?

লজ্জায় মাথা নিচু করে রাধি ঘাড় নাড়ল। তারপর একটা চিঠি বাড়িয়ে দিল শুভ্রর দিকে, "আজ ওর ওখানে গেছিলাম। এটা পাঠিয়েছে। আপনাদের টেলিফোনটা কি খারাপ ?"

শুভ্র বলল, "আর বোলো না। একদিন একটু ঝড় জল হলেই টেলিফোন বিগড়ে যায়। ওভারহেড লাইন তো। কোথাও গাছ ভেঙে পড়েছে হয়তো। তুমি বোসো।"

রাধি খুব সংকোচের সঙ্গেই বসল চেয়ারে। শুভ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠি পড়তে লাগল, "কেমন আছিস। আমি ভাল। গত কয়েকদিন তোকে চেষ্টা করেও টেলিফোনে পাচ্ছি না। এ দিকে এমন ব্যস্ত, তোদের ওখানে যাওয়ারও সময় নেই। একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি কিনেছি। রবিবার লোকজন খাওয়াব। তুই আসবি কিন্তু। যার হাত দিয়ে এই চিঠি পাঠালাম, তুই চিনিস। — ইতি সন্তু।"

রাধি ফুল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। শুভ্র চিঠি পড়া শেষ করেই চেয়ারে বসল। তারপর হেসে বলল, "সন্তুটা তো মানুষ হয়ে গেল। কী বলো, রাধি ?"

রাধি হাসল। তারপর বলল, "আপনাকে কিন্তু খুব ভালবাসে। সব সময় আপনার কথা বলে।"

শুভ্র পিছনে লাগল, "তোমার থেকেও আমাকে ভালবাসে ? যাঃ এটা হয় না।"

রাধি লজ্জিত মুখে বলল, "শুভ্রদা আপনি সব জানেন ?"

—জানব না ? ও আমাকে সব কথা বলে। সন্তু, আমি, রানা আর দিব্য আমরা চার বন্ধু।

—জানি, ও কিন্তু দিব্যদাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

—হ্যাঁ, ওদের ঝগড়া থামাতে আমাদের জান বেরিয়ে যায়।

—আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে, পিসিমণি কেমন আছেন ?

—ভাল না। ওকে বোলো, লো প্রেশার। একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। এখন বেড রেস্ট। যাবে তুমি দেখতে ?

—না, শুভ্রদা। আমার কী পরিচয় দেবেন ?

—একবার চলোই না আমার সঙ্গে। পিসিমণি সেকেলে মহিলা নন। তবে পিসিমণি এখন ঘুমোচ্ছে।

—পিসিমণির অসুখ শুনলে কিন্তু ও ছুটে আসবে।

—হ্যাঁ, আমার চেয়েও ও বেশি ভালবাসে পিসিমণিকে। ছোটবেলায় ওর মা মারা যায়। তারপর কারও স্নেহ-ভালবাসা তেমন কিছু পায়নি। পিসিমণি বলে, ও খুব দুঃখী ছেলে।

ছলছল করে উঠল রাধির মুখ। ও বলল, "ওর জন্য মাঝে মাঝে আমার খুব ভয় করে শুভ্রদা। এমন সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে.... এমন রগচটা...।"

প্রসঙ্গ পাল্টাল শুভ্র, "তুমি চা খাবে?"

—না, শুভ্রদা। আমি চা খাই না।

—সন্তুটাও খায় না। তোমার সঙ্গে ওর কবে দেখা হবে?

—কাল দুপুরে।

—রোজ দেখা হয় বুঝি?

—আমি যাই। সিঁথির মোড়ে সেলাইস্কুলে আমি সেলাই শিখতে যাই। ফেরার পথে রোজ ওর সঙ্গে দেখা করে আসি।

—কয়েকটা বদ অভ্যাস ধরেছিল। সেগুলো ছাড়াও।

—ছাড়িয়েছি। অনেক কষ্টে ছাড়িয়েছি।

—কী করে ছাড়ালে?

—চার পাঁচ দিন দেখা করিনি। বলেছিলাম, পাতা-টাতা খাওয়া না ছাড়লে আর কোনওদিন দেখাই করব না।

—তারপর কী হল?

—একদিন ছটফট করতে করতে নিরালায় এসে হাজির।

—খুকুমণিদার বাড়িতে তোমাদের এই ব্যাপারটা জানে?

—না।

—তোমার আর কে আছে রাধি?

মুখ নিচু করে রইল রাধি। তারপর ভারী গলায় বলল, "আপনার কাছে কিছু লুকোব না শুভ্রদা। আমার থেকেও কেউ নেই। বাবা-মা... বাবা নিরুদ্দেশ। মা মেসোর সঙ্গে থাকে। সে রকম কেউ থাকলে কি আর আমাকে পরের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হল শুভ্রর। পড়ন্ত বিকালের আলোয় ওকে দেখে অদ্ভুত ভাল লাগছিল। সন্তুর মুখে রাধি নামটা শুনে এবং পরে ওর পরিচয় জেনে যে কৌতূহল হয়েছিল, সেটা আজ একেবারে মিটে গেল। না, সন্তুটার কপাল ভাল।

—আজ উঠি শুভ্রদা। রাধি আবার স্বাভাবিক। আপনি আসবেন তো রোববার? টবিন রোডে ওর দোকান। বি টি রোড থেকে ঢোকার মুখেই।

—আরে, বোসো বোসো। সন্তু বেটা এত টাকা পেল কোথায় ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি কেনার?

—ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে।

রাধি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। পুকুর পাড় থেকে একটা পাখি ডাকছে। বাগানের এ দিকটায় বসলে মনে হয় জগৎটা বিচ্ছিন্ন। রাধির মুখোমুখি বসে, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল শুভ্রর। মনে মনে ও ভাবতে লাগল, ঠিক এখন যদি দিব্য এসে হাজির হয়, তাহলে কী বলতে পারে ? রাধিকে কি ও চেনে ? নিশ্চয়ই চেনে। হয়তো ওর সামনেই বলে বসবে, "এই তুই খুকুমণিদার বাড়িতে কাজ করিস না ? এখানে কী করছিস ?" আর সন্তুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা জানলে হয়তো হাসতে হাসতে এও বলে বসবে, "সন্তুটার কী টেস্ট মাইরি। কাজের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে !"

রাধি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের বাড়িতে কোথায় থাকত হারানদা ?"

শুভ্র বলল, "ওই যে, বাগানের ওই দিকে। মালিদের ঘর দেখছ, তার পাশেই।"

রাধি বেশ সংকোচের সঙ্গে বলল, "জানেন শুভ্রদা, আগে যখন আপনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতাম, খুব ইচ্ছে হত ভেতরে কী আছে দেখার।"

শুনে সন্তু হাসল। বলল, "বাবা খুব শখ করে বানিয়েছিলেন বাড়িটা। ওই যে সাদা পাথরের স্ট্যাচুগুলো দেখছ, এইরকম অনেকগুলো ছিল। এখন ভেতরে নিয়ে রেখেছি। ফলতায় গঙ্গার ধারে আমাদের আরও একটা বাড়ি আছে। সেটা আরও সুন্দর। সন্তু গিয়েছে অনেকবার। তোমরা হনিমুন করতে পারো।"

রাধি লজ্জায় মাথা নিচু করল। তারপর বলল, "আমার ভাগ্যটা এত খারাপ শুভ্রদা, ভাল কিছু আর ভাবিই না।"

শুভ্র বলল, "চিরদিন কারও সমান যায় না।"

এ বার রাধি উঠল। সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশের রং এখন ঘষা কাঁচের মতো। সাইড ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাধি বলল, "আসি শুভ্রদা, আপনি ছাড়া ওর আপনজন আর কেউ নেই। ওর খোঁজ কিন্তু রাখবেন।"

শুভ্রও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "প্রথম দিন আমার বাড়িতে এলে। ভেতরে ঢুকলে না। কিছু মুখেও দিলে না। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

—না, না। অন্য একদিন হবে। যেদিন দু'জনে আসব। শুঁড়িপথ ধরে কয়েক পা হেঁটে রাধি একবার দাঁড়াল। পাশেই সুপারি গাছ। সম্ভবত টাল সামলাল একহাতে গাছ ধরে। শুভ্র ওকে লক্ষ করছিল। দ্রুত কাছে এসে বলল, "কী হল রাধি ?"

—না, মাথাটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। ঠিক আছি। আমি যেতে পারব শুভ্রদা।

গেটের দিকে রাধি হেঁটে যাচ্ছে। ওই দিকে তাকিয়ে থেকে শুভ্র এসে ফের বসল চেয়ারে। একলা বসে থাকতে ওর খুবই ভাল লাগে। বিশেষ করে, বৃষ্টির পর এই সব মেঘলাদিনগুলোতে। রাধি আসার আগে, সত্যিই এই নির্জনতা, একাকিত্ব খুব উপভোগ করছিল। আচ্ছা, রাধি না হয়ে যদি উল্টো দিকে হঠাৎ ফুল্লরা এসে বসত, তা হলে কী কথা হত ওদের মধ্যে ? অবশ্যই শুভ্র কোনও কথা বলতে যেত না আগ বাড়িয়ে। ফুল্লরা হয়তো ভাববাচ্যেই জিজ্ঞাসা করত, "তরুমাসিকে আর একজন বড় ডাক্তার দেখানো দরকার।"

শুভ্র হয়তো বলত, "হ্যাঁ, তা হলে খুব ভাল হত।"

—আমার পিসেমশাই বড় হার্টস্পেশালিস্ট। ভাবছি, ওঁকে একবার দেখে যেতে বলি।

—তেমন হলে আমি গিয়েও নিয়ে আসতে পারি।

—হারানদার ব্যাপারে পুলিশ কিছু জানাল ?

—না, এখনও চার্জশিট দেয়নি।

—মাঝেমধ্যে একটু খবর নিলে ভাল হয়।

—নিচ্ছি। মাঝে পিসিমণির এই অবস্থা....।

—এখন কি ঘুমোচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—মা বলছিল, একবার আমাদের বাড়ি গেলে ভাল হয়।

—উনি আজ আসবেন না ?

—সম্ভবত না। দিল্লি ফ্লাইটে দাদু-দিদা আমাদের কাছে আসছেন। বাপি আর মা এয়ারপোর্ট গেছেন।

—ওরা দিল্লি থাকেন কেন ?

—আমার কাকুর কাছে থাকেন।

এরপর হয়তো আর কোনও কথা খুঁজে পেত না দু'জনে। ফুল্লরা উঠে পড়ত, যাই তরুমাসিকে দেখে আসি।

বাগানে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে শুভ্র ভাবল, ফুল্লরা কেন ওর সামনে সহজ হতে পারে না। অন্যদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা তো এত শীতল নয়! শ্যামলী একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, "শুভ্রদা, ফুল কিন্তু খুব চালাক মেয়ে। যখনই তোমার কথা ওঠে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জানতে চায়। এমন কায়দা করে জানতে চায়, আমি মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি।"

রানাও সঙ্গে ছিল সেদিন। ও বলেছিল, "শুভ্র সম্পর্কে একদম ইনফর্মেশন দেবে না তুমি।"

—ওরে বাবা, পেট থেকে কথা বের করে নেয়।

শুভ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী জানতে চায় রে মলি।"

—এই স্বাতী মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করবে কি না। কবেকার আলাপ। তুমি ভবিষ্যতে কী করতে চাও।

রানা বলেছিল, "শালা, মেয়েদের এই জিনিসটাই আমি পছন্দ করি না। প্রথমেই জানতে চাইবে, তুই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবি কি না। তা হলে এগোবে।"

শ্যামলী প্রতিবাদ করেছিল, "ওরকম বোলো না। ওর দিদির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চের এক স্কলারের। ওর নিজস্ব একটা পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে।"

রানা চটে উঠেছিল, "আমাদের শুভ্র কি খারাপ ? আর ক'দিন পর ন্যাশনাল টিমে ঢুকবে। প্লাস এম এ পরীক্ষা দিয়েছে। ওর মতো ছেলে ক'টা পাওয়া যায়।"

শুভ্র হেসেছিল ওদের তর্ক শুনে। দু'জনের একটাই দোষ। নিজেদের ব্যাপার নিয়ে নয়, সব সময় ওদের তর্ক বাধে, তৃতীয় কোনও লোককে নিয়ে। ও বলেছিল, "এই তোরা থাম তো। কথায় কথায় তক্ক করলে, তোরা পরে ঘর-সংসার করবি কী করে ?"

শ্যামলী বলেছিল, "বয়ে গেছে আমার ওর সঙ্গে সংসার করতে। বাবা-মার অবর্তমানে ফ্ল্যাটটার মালিক আমি। তুমি আমাকে একটা চাকরি দেবে। পায়ের ওপর

পা তুলে আমি জীবন কাটাব।"

—তুই ঠিক করেই রেখেছিস, আমি চাকরি দেব ?

—দেবে না মানে ? আর ক'দিন পর তুমি হবে দ্য ফুটবলার মোস্ট সট আফটার। তোমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে না কোম্পানির চেয়ারম্যানরা !

শুভ্র খুব হেসেছিল শ্যামলীর কথা শুনে। ওর মধ্যে এখনও এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে শুভ্র ভাবল, ফুল্লরা কি শ্যামলীর মতো হতে পারে না ? সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে, গেটের দিকে তাকিয়ে শুভ্র ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। গেটের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে বনমালি। ও হেঁটে যাচ্ছে পুকুরের পাড়ে মালিদের ঘরের দিকে। হারানদার ঘরে এখন আর আলো জ্বলে না।

হারানদার কথা ভাবলেই শুভ্রর মন অসম্ভব খারাপ হয়ে যায়। লোকটা কী দোষ করেছিল, এখনও ওর মাথায় ঢোকেনি। এত তুচ্ছ কারণে, একটা লোক এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতে, মার্ডার হয়ে যেতে পারে ! সেদিন এস আই বাড়িতে এসে খবরটা দেওয়ার পর সন্তু, রানা আর ও ছুটে গিয়েছিল দীপ্তি ধৌতাবাসের কাছে। কয়েক শো মিটার দূরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ পাড়ার কেউ এসে একবার খবর দিতে পারল না।

ওরা গিয়ে দেখেছিল, ধৌতাবাসের লাল রকে সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহের পায়ের কাছে বসে যতীনদা। স্ট্যান্ডে প্রচণ্ড ভিড়। কাছেই একটা পুলিশ ভ্যান। পাড়ার লোকেরা ডেডবডি আটকে রেখেছিল। লালবাজার থেকে সি পি না এলে ছাড়বে না। শুভ্রকে দেখেই যতীনদা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, "তোমাদের লোকটাকে বাঁচাতে পারলাম না ভাইয়া।"

গানের মাস্টারমশাই আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন শুভ্রদের। ওঁর মুখে সব শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সন্তু। রানা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। পুলিশের সামনেই পাড়ার লোকেরা ভাঙচুর করেছিল পচাদার চায়ের দোকান। এস আই বিমল শুভ্রর হাত ধরে বলেছিল, "শুভ্রবাবু, আপনারা প্লিজ, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আমাদের যা করার অবশ্যই করব।"

...সে দিনের কথা আর ভাবতে চায় না শুভ্র। সাদা চাদরে ঢাকা হারানদার দেহটার কথা ভাবলেই ওর ভীষণ কষ্ট হয়। চেয়ার ছেড়ে তাই ও উঠে পড়ল। বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে একবার চোখ বেলাল লেটার বক্সটার দিকে। একটা চিঠি দেখতে পেল ফাঁক দিয়ে। বক্স খুলে চিঠি বের করে আনতেই দেখল, বিয়ের চিঠি। কার বিয়ে ? কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ও খামটা ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল। আগামী ১৪ই শ্রাবণ আমার কন্যা স্বাতীর বিবাহ আমেরিকা প্রবাসী.... এই অবধি পড়েই শুভ্র কার্ডটা ভাঁজ করে ফেলল। আর কোনও আগ্রহই নেই ওর।

পিসিমণির ঘরে ঢুকেই শুভ্রর মন খুশিতে ভরে গেল। বিছানায় উঠে বসেছেন পিসিমণি। ওকে দেখে বললেন, "বাগানে কী করছিলি এতক্ষণ ?"

—বসে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম।

—কী ভাবছিলি রে, পিসিমণিটা যদি মরে-টরে যায়...বিছানার এক পাশে এসে বসল শুভ্র। তারপর বলল, "তুমি কেন এ কথাগুলো বলছ পিসিমণি। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো ?"

পিসিমণি হেসে বলল, "বা রে, আমার বয়স হচ্ছে না। একদিন না একদিন তো মরবই।"

শুভ্র কোনও কথা বলল না। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। পিসিমণির না থাকার কথা ও ভাবতেই পারে না। চোখ ছলছল করে ওঠে। ছোটবেলা থেকে চোখের সামনে একমাত্র ও পিসিমণিকেই দেখছে। মায়ের স্নেহ দিয়ে ওকে আগলে রেখেছেন। হারানদার মৃত্যু এ বাড়িতে অনেক কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে। না হলে সামান্য অসুখে পিসিমণিই বা কেন মৃত্যুর কথা ভাববেন ? চোখের জল লুকোবার জন্যই ও পিসিমণির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। টের পেল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পিসিমণি বলছেন, "বোকা ছেলে।"

—তোর কাছে একটা মেয়ে এসেছিল, কে রে ?

কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থেকেই শুভ্র বলল, "রাধি।"

—রাধি কে রে ?

—সন্তু ওকে বিয়ে করবে পিসিমণি।

—তাই নাকি ? মেয়েটাকে আমাকে একবার দেখালি না ?

—বললাম। তুমি ঘুমোচ্ছ শুনে... এল না।

—কোথাকার মেয়ে ?

—এই পাড়ারই। খুকুমণিদার বাড়িতে আশ্রিতা। শুভ্র ইচ্ছে করেই কাজের লোক কথাটা আর বলল না।

—ভাল মেয়ে ?

—আমার তো খুব ভাল লাগল।

—এই প্রথম দেখলি ?

—হ্যাঁ পিসিমণি।

—তোর কোন মেয়েকে ভাল লাগে রে শুভু ?

—কাউকে না।

—আমাকে লুকোস না।

—না, পিসিমণি, কাউকে না।

—হ্যাঁরে, তোর হাতে ওটা কার বিয়ের চিঠি ?

—স্বাতীর, পিসিমণি।

—তাই ! আমাকে বলিসনি তো ?

—এটা কি বলার মতো কথা ?

—তুই যাবি না।

—না, আমার কোনও আগ্রহই নেই।

—চিঠি পাঠিয়ে ও নেমন্তন্নটা সেরে দিল। কেমন মেয়ে রে, শুভু ?

শুভ্র কোনও জবাব দিল না। স্বাতী চুলোয় যাক। এই মুহূর্তের আনন্দটা ও নষ্ট করতে চায় না। ছোটবেলায় যখন এইভাবে শুয়ে ও পিসিমণির কাছে গল্প শুনত, তখন পৃথিবীটাকে খুব অলীক মনে হত। জানলার ধারে বসে রয়েছে রাজকন্যা। দৈত্যের হাতে বন্দিনী। রাজকুমার প্রাসাদে ঢুকতে পারছে না। রাজকন্যা চুল খুলে জানলা দিয়ে নামিয়ে দিল। রাজকুমার ওপরে উঠে এল চুল বেয়ে....। কত গল্প ?

ক্লাসে টিফিনের সময় সন্তুকে একবার এই গল্পটা বলতেই ও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল, "দূর, এটা সম্ভবই না। রাজকন্যা যদি একটা মোটা দড়ি ঝুলিয়ে দিত, তা হলেও বিশ্বাস করতাম। চুল ধরে... না, না।"

বাইরে মনার মায়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে। কেউ এসেছে? আসার আর সময় পেল না? শুভ্র খুব বিরক্ত বোধ করল। চারদিন পর এই প্রথম পিসিমণিকে একটু সুস্থ দেখাচ্ছে। মন খুলে কথা বলছে। এর মধ্যেই জ্বালাতন!

—কী রে তরু, কেমন আছিস?

গলা শুনেই শুভ্র উঠে বসল। ফুল্লরার মা!

—লাবু, আয়। বিব্রত মুখে পিসিমণি বললেন। একবার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, "পাজি ছেলেটা এত বড় হয়ে গেছে। তবু আমার কোল ছাড়ে না।"

লাবণ্যপিসি হেসে বললেন, "আহা রে, আমার যদি তোর মতন একটা ছেলে থাকত....।"

পিসিমণি খুব খুশি হয়ে বললেন, "আমার এই পাজিটাকে নিয়ে দিন কয়েক তোর কাছে রাখ না।"

—শুভু তো আমার ওখানে একদিনও গেল না।

—ও একটু লাজুক। ঠিক আছে, আগে আমি সেরে উঠি, খোকাবাবুকে একদিন তোর বাড়িতে নিয়ে যাব।

শুভ্র বলল, "কী হচ্ছে পিসিমণি।"

লাবণ্যপিসি বললেন, "তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে শুভ্র।"

—এই মাস খানেকের মধ্যেই।

—তারপর কী করবে?

—বাবার ব্রিক ফিল্ড আছে। ওখানেই বসব।

পিসিমণি ধমক দিলেন, "বসাচ্ছি। নারে লাবু, ওকে এখন ব্যবসায় ঢোকাবই না। ও খেলবে।"

লাবণ্যপিসি বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি ও খুব ভাল খেলে। ফুল একদিন ওর ছবি দেখালও কাগজে। ফুল তো সব সময় ওর বাপিকে শুভ্রর কথা বলে।"

পিসিমণি বললেন, "তোর মেয়েটা শুনেছি পড়াশুনায় খুব ভাল।"

—আরও ভাল করতে পারে, জানিস। ভীষণ মুডি। ছোট মেয়ে তো। বাপির খুব আদরের। আমার কথা শোনে না।

—মা...। ফের আমার নিন্দে করছ? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল ফুল্লরা।

ওকে দেখেই পিসিমণি বললেন, "আয় মা, আমার কাছে একটু বোস। কাল কেন এলি না?"

—আসব কী। তোমার বাড়িতে সব কিছুই তো ফুটবল। দেয়ালে ফুটবল, বইয়ের শেলফে ফুটবল, টিভিতে ক্যাসেটে ফুটবল। ছাদে গিয়ে দেখি, সেখানেও ফুটবল। জানো তরু মাসি, রান্নাঘরে গিয়ে যে একটু কথা বলব, তার উপায় নেই। মনার মাও ফুটবলের কথা বলে আজকাল।"

পিসিমণি খুব জোরে হেসে উঠলেন ফুল্লরার কথা শুনে। শুভ্রর খুব ভাল লাগল দেখে। হারানদা মারা যাওয়ার পর থেকে পিসিমণিকে ও আর হাসতে দেখেনি।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই ও পিসিমণিকে বলল, "আমি একটু লাইব্রেরি থেকে ঘুরে আসি।"

—পালাচ্ছিস যে। যা না, ফুলকে নিয়ে একটু গল্প কর বসে। পিসিমণি বললেন।

অপ্রস্তুত হয়ে শুভ্র বলল, "বা রে। তোমার জন্য বই আনতে হবে না?"

—সে পরে আনবি। মেয়েটা এ বাড়িতে আসে। কথা বলার লোক পায় না।

শুভ্র পা চালিয়ে উঠে এল দোতলায়। এসে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। পুকুরের দিকটায় ঘন অন্ধকার। পাশের ঝোপে দু'একটা করে জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এই মিষ্টি গন্ধটা শুভ্রর খুব ভাল লাগে। দু'হাতে রেলিংয়ে ভর দিয়ে ও একবার শরীরটাকে এদিক-ওদিক করল। অনেকদিন প্র্যাকটিসে যায়নি। দিন চারেক তো বটেই। মাঝে লিগের একটা ম্যাচও বোধহয় হয়ে গেছে। কোচ— ভাস্করদা চটে যাবেন। কিন্তু শুভ্রর কিছু করার নেই। পিসিমণিকে ফেলে ম্যাচ খেলতে যাওয়া সম্ভব নয়। লিগে দশটা গোল ওর ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ওর চেয়ে একটা বেশি গোল রয়েছে বিজয়নের। মোহনবাগান ম্যাচ এখনও দেরি আছে। শুভ্র সে দিন তৈরি থাকবে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে শুভ্র ফিরে তাকাল। চায়ের কাপ হাতে ফুল্লরা। কাপটা হাতে নিতেই ও দেখল, ফুল্লরা দ্রুত পায়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে গেল। ওর চলে যাওয়ার ব্যস্ততা দেখে শুভ্রর একটু খারাপই লাগল। কী হত, যদি ও দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলত। চায়ে আর মুখই দিতে ইচ্ছে করল না শুভ্রর। কাপটা উপুড় করে চা ও ফেলে দিল বাগানে।

পাত্তি

—রাধি, এই রাধি, ওঠ। বেলা পড়ে গেছে।

বৌদির ডাক শুনে রাধি চোখ খুলল। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল, সবে অন্ধকার হচ্ছে।

—ওঠ মা, আমাকে আবার এখুনি মহিলা সমিতির মিটিংয়ে যেতে হবে।

বৌদি তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না রাধির। ও আবার চোখ বন্ধ করল। দুপুরে খাওয়ার পরই আজকাল রাজ্যের আলিস্যি ভেঙে পড়ে শরীরে। ভীষণ ঘুম পায়। ডাক্তারবাবু ওকে বলেছেন, সব সময় বাঁ-দিকে কাত হয়ে শুতে। রাধি বাঁ-দিকে কাত হয়ে শুয়ে খুব আরাম পায়। কোলবালিশ আঁকড়ে ধরে ও আদুরে গলায় বৌদিকে বলল, "শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বৌদি, আরেকটু শুই?"

বৌদি ঝুঁকে পড়লেন বিছানায়। রাধির মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, "কেন রে? ব্যথা করছে বুঝি?"

—না গো, তল পেটটা কেমন যেন কষে ধরেছে।

—তা হলে আর উঠিস না মা। আমি মিটিং সেরে আসি। তুই বরং শুয়ে থাক।

উল্টো দিকে বালিশে মুখ গুঁজে ফিক করে রাধি একবার হেসে ফেলল। মাস খানেক আগে এই আরাম ও ভাবতেই পারত না। এই বেলাবেলি শুয়ে থাকা, বৌদির কাকুতি-মিনতি...এ তো ওর কাছে স্বপ্নই। সারা দিন রাধিকে এখন আর কোনও কাজই করতে হয় না। স্রেফ শুয়ে-বসে দিন কাটায়। ওকে যত্ন-আত্তি করতে গিয়ে খেটে মরে বৌদি। ভাবা যায়? বিছানায় শুয়ে-বসেই রাধির মনে পড়ে আগেকার দিনগুলোর কথা। আগের বাড়িতে একদিন ওর ঘুম ভাঙতে সামান্য দেরি হয়েছিল বলে, বৌদি চুলের গোছা ধরে ওকে টেনে তুলেছিল। সারা দিন জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি। রাতে বাড়ি ফিরে দাদাবাবু খুব বকাবকি করেছিল বৌদিকে। সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে একেক সময় রাধির খুব রাগ হয়।

রাধি মাঝে মাঝে মনে মনে হাসেও। আগে গেস্ট রুমের মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে নিয়ে শুতে হত ওকে। এখন শোয় খাটে। বৌদি রাত্তির বেলায় নিজের হাতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে যায়। স্প্রে করে মশা তাড়াবার জন্য। সব শেষে সাবধান করে দিয়ে যায়, "রাতে বাথরুমে গেলে একা একা যাস না। আমাকে ডাকিস। পড়ে টড়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

যত্নের কোনও ত্রুটি নেই বৌদির। ডাক্তারবাবু নানা রকম ওষুধ দিয়ে গেছেন। সময় করে সেই সব খাওয়ায়।

প্রায় এক মাস ফ্ল্যাটের বাইরে পা দেয়নি রাধি। বৌদিই দিতে দেয়নি। সে দিন শুভ্রদার বাড়ি থেকে ফেরার সময়ই, মাথাটা একবার ঘুরে উঠেছিল। ও তখনকার মতো সামলে নেয়। রাতে আর পারেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে সাবানের গন্ধ নাকে যেতেই গা পাক দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হড়হড় করে বমি। ওয়াক ওয়াক শব্দ শুনেই দাদাবাবু ছুটে এসেছিল। বমির তোড়ে রাধি তখন মেঝেতে বসে পড়েছে। সারা শরীরে যেন আর কোনও শক্তি নেই।

অনেক রাতে গেস্ট রুমের খাটে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ওর মনে হয়েছিল, দাদাবাবু আর বৌদি তখনও ঘুমোয়নি। ড্রয়িংরুমে বসে আছে। জিরো পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বলা রয়েছে। বৌদির চাপা হিসহিসে গলা ও শুনতে পেয়েছিল, "এই পাপ আমি কাল সকালেই বিদেয় করব।"

দাদাবাবুর গলা, "আগে ওর সঙ্গে কথা বলো। জেনে নাও। তারপর বিদায় করার কথা ভাবো।"

—তোমার কাণ্ড নয় তো?

—কী বলছ কী তুমি?

—তোমরা পুরুষ মানুষেরা সব কিছু পারো।

—লালি, তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ।

—বাড়াবাড়ি, তাই না? আমাকে না হয় বুঝিয়ে দিলে, লোকের মুখ চাপা দেবে কী করে তুমি? এ বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কোনও পুরুষ মানুষ আছে?

—দেখো লালি, এই ধরনের নোংরা কথা যদি তুমি আর একবার বলো, তা হলে জোর করে চুপ করাব।

—কী করবে তুমি, আমাকে মারবে? ওইটাই শুধু বাকি।

—দরকার হলে তা করতেই হবে।

—মারো, মারো তা হলে। লজ্জা করে না...একটা বাচ্চা মেয়েকে.... ছিঃ।

রাধির তন্দ্রা কেটে গিয়েছিল এই সব কথা শুনে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। দাদাবাবু আর বৌদির মধ্যে বহুবার ঝগড়া হতে ও দেখেছে। বৌদিই শুধু বলে যায়। দাদাবাবু চুপ করে থাকে। কদাচিৎ একটা দু'টো উত্তর দেয়। অসম্ভব সহ্যশক্তি দাদাবাবুর। ঝগড়ার সময় বৌদি এমন সব কথা বলে রাধিরই রাগ হয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে ও ঠিক বুঝতে পারছিল না, ঝগড়ার কারণটা কী। ও শিউরে উঠেছিল চড় মারার শব্দ শুনে। দাদাবাবুর গলায় যেন চণ্ডাল রাগ, "এক লাথি মেরে বের করে দেব তোমাকে। নোংরা মেয়েছেলে কোথাকার।"

বৌদি কেঁদে উঠেছিল, "মারো, আরও মারো। আমাকে বের করে দাও। আমি চিৎকার করে বলি, আপনারা দেখে যান— ভদ্দরলোকের বাচ্চা— খুকুমণিবাবু তার বাড়ির কাজের মেয়েকে কী করেছেন। ...ছিঃ, থু। ঘেন্না।"

রাধি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিছানায় উঠে বসেছিল। তারপর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল নিজের তলপেটের দিকে। এ সব কী বলছে বৌদি! দাদাবাবুর মতো একটা ভালমানুষের নামে? শাড়ির ওপর দিয়েই ও একবার হাত বুলিয়ে টের পেতে চাইল.... বাচ্চা এসেছে। মাস খানেক আগেই ও বুঝতে পেরেছিল, আটকে গিয়েছে। সন্তুদাকে একবার দুর্ভাবনার কথা জানিয়েও ছিল। ওরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই। বলেছিল, আরেকটা মাস দেখতে। কিন্তু দাদাবাবু বা বৌদি কথাটা জানল কী করে? পাশের ঘর থেকে দাদাবাবুর গলা ও শুনতে পেল, "যাও, রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করে সব বলো। আমারও কিছু বলার আছে। এ বাড়িতে, আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর বিপ্লব কেন আসে... আমিও বলব তা হলে।"

রাধি এই সময়টাতেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। শরীরটা ভীষণ দুর্বল। দেয়াল ধরে ধরে কোনও রকমে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, "দাদাবাবু, আমার জন্য তোমরা ঝগড়া কোরো না। সকালটা হতে দাও। আমি নিজেই চলে যাব।"

দাদাবাবু উঠে এসে ওকে শক্ত করে ধরেছিল। তারপর কঠিন গলায় বলেছিল, "না মা, তুই কোথাও যাবি না। তুই আমার এখানেই থাকবি।"

রাধি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। মেঝেতে বসে পড়েছিল। তীক্ষ্ণ গলায় বৌদি জিজ্ঞাসা করেছিল, "কে তোর এই সর্বনাশটা করেছে?"

বুকে হাঁফ সামলাতে সামলাতে রাধি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব উত্তেজনায় ওর সারা শরীর কাঁপছিল। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য মুখটা হাঁ করে ও একবার সন্তুদার মুখটা মনে করতে চাইল। এই নির্মম প্রশ্নটার মুখোমুখি একদিন না একদিন ওকে হতেই হত। চোখ বন্ধ করে ও বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল। কোনও রকমে টেনে টেনে ও বলল, "তোমাদের আমি বিপদে ফেলব না বৌদি। আমি কাল সকালেই চলে যাব।"

ওকে কোলে তুলে নিয়েছিল দাদাবাবু। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেছিল, "তুই ঘুমিয়ে পড়, মা। ডাক্তারবাবু তোকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছে।"

নিশ্চিন্তে রাধি সে দিন চোখ বুজেছিল।

...মহিলা সমিতির মিটিংয়ে বৌদি যাওয়ার আগে পর্যন্ত রাধি শুয়েই রইল। এই

বিকেলবেলায় ঘরে বসে থাকতে ওর ভাল লাগে না। আগে সিঁথির মোড়ে সেলাই স্কুল ফেরত সন্তুদার ওখানে ঘুরে বাড়ি আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। তারও আগে, এই বিকেলেই ও যেত পার্কের মাঠে রেবাদিদের আড্ডায়। বিভা, ইরা, মেনকা— সবাই যেত। সেই ক্যাসেট দেখা, লুকিয়ে কিছু করার একটা আলাদা উত্তেজনা রাধি এখন প্রায় ভুলতে বসেছে। বিভা, ইরাদের সঙ্গে এখন আর দেখাও হয় না। ওরা কেউ ভাবতেও পারবে না, রাধির পেটে একটা বাচ্চা তিল তিল করে বড় হচ্ছে। শুনলে হয়তো রেবাদি বলবে, "বাব্বাঃ, মাগী এত শয়তান। এখেনে তো এমন ভাব দেকাত, যেন ব্যাটাছেলের ঠ্যাং পর্যন্ত কখনও চোখে দেকেনি।"

রেবাদির কথা ভাবতে ভাবতেই রাধি বিছানায় উঠে বসল। একবার হাই তুলে আড় ভাঙল। চুলের গোছা কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। দু'হাত পিছনে দিয়ে ও আলটপকা একটা খোপা বেঁধে নিল। বৌদি এখন মাঝেমধ্যেই ওর চুল আঁচড়ে দেয়। মাথায় তেল ঠেসে বেণী বেঁধে দেয়। চুল বাঁধতে বসে বৌদি নানা গল্প করে। অনেক দিন ধরেই বৌদি প্রকারান্তরে জানতে চাইছে— লোকটা কে? রাধি কোনও উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে।

সে দিন সেই রাত্তিরে... ভোর হওয়ার আগে আরও একবার ঘুম চটকে গিয়েছিল রাধির। দাদাবাবু-বৌদি সে কথা জানে না। ওদের কথাবার্তা সব শুনেছিল ও মড়ার মতো শুয়ে থেকে। প্রতিটি কথা এখনও মনে করতে পারে রাধি। ড্রয়িং রুমে তখনও নীল আলো জ্বলা। সারা রাত্রি তর্কাতর্কি করতে করতে সম্ভবত দু'জনেই খুব হাঁপিয়ে গিয়েছিল। বৌদির নরম গলা শুনতে পেয়েছিল রাধি, "ওকে তুমি বাড়িতে রাখবে? লোকে কী বলবে?"

—লালি, তোমার নিজের মেয়ে যদি এই কাজ করত, তাকে বাড়ি থেকে তুমি বের করে দিতে পারতে?

—কে ওর এই অবস্থা করল বলো তো?

—যে-ই হোক। এখন জানতে চেয়ো না। জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। দেখবে ও-ই একদিন বলে দেবে।

—আমি তোমাকে খুব বাজে সন্দেহ করেছিলাম গো।

—আমার খুব খারাপ লেগেছে।

—আচ্ছা, অ্যাবোরশন করানো যায় না?

—সে জন্য ওর পারমিশন নেওয়া দরকার।

—ও কি লুকিয়ে কাউকে বিয়ে করেছে?

—এখন জিজ্ঞাসা কোরো না। এখন যদি ও কিছু করে ফেলে, পাড়ায় আর থাকা যাবে না।

দাদাবাবু আর বৌদি কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বৌদির গলা, "ওকে কেউ রেপ করেনি তো? যা চাপা মেয়ে। হয়তো আমাদের বলেনি।"

—হতে পারে।

—বাচ্চা যদি হয়, ও এখন কী করবে?

—এখনও ভাববার অনেক সময় আছে। তেমন হলে আমরাই নিয়ে নিতে পারি।

—যাঃ তাই হয় নাকি?

—কেন হবে না লালি, তোমার একটা বাচ্চা দরকার। তুমি অনাথ আশ্রমে ঘুরছ একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য। রাধি তো এখন আমাদের ফ্যামিলিরই একজন। ওর বাচ্চাটা আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি।

—কথাটা অবশ্য খারাপ বলোনি। কিন্তু বাচ্চা ও দেবে কেন?

—দেবে, দেবে। আমি যদি বলি, ও দেবেই। তার আগে ওকে অন্য কোথাও রাখার কথা ভাবতে হবে। অ্যাডভান্স স্টেজে এখানে রাখাটা ঠিক হবে না।

—বরানগরে গিয়ে রাখলে হয় না। আমাদের ওই ফ্ল্যাটটা তো তুমি এখনও বিক্রি করোনি।

—গুড আইডিয়া। কিন্তু তা হলে তোমাকেও গিয়ে থাকতে হবে। একা তো ও থাকতে পারবে না।

—সে না হয় থাকব। মেয়েটাকে যত্ন করতে হবে। এখন শুনি নানারকম প্রবলেম হয়।

—যা-ই করো, বাচ্চা যদি পেতে চাও, ওকে এ ক'দিন অন্তত মানসিক কষ্ট দিও না।

এ সব কথাবার্তা শুনে রাধি চোখ বুজেছিল। কী সহজেই না এরা সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সন্তুদা যদি ওর এই অবস্থার কথা জানে, তা হলে কখনওই এখানে ফেলে রাখবে না। সন্তুদাকে কীভাবে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যায়, এটা চিন্তা করতে করতেই রাধি ফের ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বিকাল বেলায়, এই সময়টায় রাধির খুব টক খেতে ইচ্ছে করে। বৌদিকে বলায়, কয়েক শিশি আচার এনে দিয়েছে। দাদাবাবু রোজ রাতে ফেরার সময় একগাদা ফল নিয়ে আসে। আপেল খেলে পেটে অ্যাসিড হয়— রাধি তাই খায় না। আসলে হয় কিনা, তা ও জানে না। পাঁচ-ছয় বছর আগে বৌদিকে ও একবার কথাটা বলতে শুনেছিল। বৌদি তখন দু'মাস আটকে গিয়েছিল। সে কী আনন্দ! দাদাবাবু বলত, "ভগবান বোধহয় এবার সত্যিই মুখ তুলে তাকালেন, লালি। ইউরিন টেস্ট যদি পজিটিভ হয়, মঙ্গল।" ওই ক'টা দিন বাড়িতে সবাই খুশি। বৌদির ব্যবহারও পাল্টে গিয়েছিল। রাধিকে বকতই না। দাদাবাবুর কোনও কাজ রাধিকে করতে দিত না। হঠাৎ দাদাবাবুর ওপর টান খুব বেড়ে গিয়েছিল। দিনে দশবার করে বৌদি তখন বাথরুমে যেত। রাধিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করত, "দেখ তো তলপেটটা একটু ভারী মনে হচ্ছে কি না।" রাধি তখন এ সবের মানে বুঝত না। পার্কের মাঠে রেবাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল। ঠোঁট বেঁকিয়ে ও বলেছিল, "বাঁজা বৌদির বাচ্চা হবে বোধহয়।" বৌদির ওপর তখন রেবাদির খুব রাগ।

বয়াম খুলে আচার খেতে খেতে রাধি একবার টেলিফোনটার দিকে তাকাল। সন্তুদা এখন ফোন করবে। বৌদি এখন এই সময়টায় বাড়ি থাকে না। মাস খানেক হল, নাগরিক কমিটির মহিলা সমিতিতে ঢুকেছে। পেয়ারাবাগানে ওরা একটা মেলা করবে। সব টাকা পয়সা তুলছে। বিপ্লব দাদাবাবু এখন আর এ বাড়িতে আসে না। কী হয়েছে, কে জানে। সময় কাটাতে বৌদি মহিলা সমিতি করছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে যায়। আসে আটটা-সাড়ে আটটায়। এই সময়টা রাধি একা থাকে। সন্তুদার সঙ্গে ফোনে কথা বলে অনেকক্ষণ ধরে।

জীবন থাকতে সন্তুদার নাম দাদাবাবু আর বৌদিকে কখনই বলবে না রাধি। সন্তুদা খুব খারাপ ছেলে হয়ে যাবে ওদের চোখে। মাস ছয়েকের মধ্যেই ও অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছে। সবটাই অকশন আর সাট্টার পয়সা নয়। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকেও ভাল পাচ্ছে। ফোনে সেদিন সন্তুদা বলেছে, একটা নীল রঙের মারুতি কিনেছে। বাব্বাঃ, এই অল্প সময়ের মধ্যে সন্তুদা কত কী করে ফেলল। পালের বাগানের বাড়িটাও কিনে নিয়েছে। দাদাবাবুকে ভার দিয়েছে, দোতলা বাড়ি করে দেওয়ার। দাদাবাবু সাট্টার কথাটা জানে না। দিন কয়েক আগে বৌদিকে বলছিল, "সন্তু ছেলেটা সত্যিই আমাকে অবাক করে দিল, লালি।"

—এই ক'দিনে প্রচুর চেনাশুনো করে ফেলেছে। কী বুদ্ধিমান ছেলেটা দেখো, সিঁথির মোড়ে আজ ওর কাছে গিয়ে দেখি শ'দুয়েক প্যাকেট তৈরি করছে। সব গিফট আইটেম। আমি বললাম, এ সব কোথায় পাঠাবে ? ও যে সব নাম বলল, শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে। বললাম, এদের সবাইকে তুমি চেনো। ও বলল, চিনি। পুজোর আগে সব দামি দামি ভেট পাঠাচ্ছে। এক ধরনের পি আর, আর কী। বলা তো যায় না, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কী কাজে কখন লাগে। অ্যাদ্দিন ধরে বিজনেস করছি, এ সব মাথায়ও আসেনি।

বৌদি বলেছিল, "যা-ই বলো, ছেলেটা খুব চোয়াড়ে ধরনের। ওদের ব্যাচে শুভ্র ছেলেটাই সব থেকে ভাল। ওর কথাবার্তা আচার ব্যবহারের কোনও তুলনা হয় না"

—হ্যাঁ শুভ্র ছেলেটা ভাল। তবে সন্তুর মতো না। দেখো, সন্তু ছেলেটা বিরাট কিছু হবেই।

রাধি কান খাড়া করে দাদাবাবু আর বৌদির এই সব কথা শোনে। আর মনে মনে হাসে। সন্তুদাটার যে কী সাহস, বৌদি জানবে কী করে। বিপ্লব দাদাবাবুকে পর্যন্ত টাইট দিয়ে ছেড়েছে। রাধির একটাই শুধু ভয়, গোখনার লোক না কোনওদিন সন্তুদাকে একা পেয়ে বসে। গোখনার খুব রাগ সন্তুদার ওপর। পেলেই লাশ ফেলে দেবে বলেছে। হারানদা মরে যাওয়ার পর থেকে সন্তুদাও প্রচণ্ড খেপে আছে। তবে রাধি নিশ্চিন্ত, গোখনা অন্তত বুদ্ধিতে সন্তুদাকে হারাতে পারবে না।

সোফায় বসে আচার খেতে খেতে রাধির মনে হল, ও নিজেই একবার সন্তুদাকে ফোন করে। জীবনে প্রথমবার ও সন্তুদাকে ফোন করেছিল, শুভ্রদাকে চিঠি দিয়ে আসার পরদিন। দুপুরের দিকে বৌদি ওপরের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়েছিল। ডায়াল করেই সন্তুদার গলা শুনেই ও চমকে উঠেছিল। বাপ রে, কী গম্ভীর গলাটা। এমনি সময় তো মনে হয় না। আস্তে আস্তে ও বলেছিল, "আমি। রাধি।"

—বলো, শুভ্রকে চিঠিটা দিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কী বলল ?

—যাবে।

—পিসিমণির সঙ্গে দেখা হল ?

—না। উনি অসুস্থ।

—কী হয়েছে ?

—মাঝে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

boiRboi.net

SCANNED BY
PRAWAY
BOIRBOI.NET

—তুমি এলে না কেন ?

—আমারও শরীর খারাপ।

—তোমার আবার কী হল ?

—যা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই।

—কী বলছ কী ?

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু কাল রাতে বলে গেছেন। সব জানাজানি হয়ে গেছে। বৌদি তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। দাদাবাবু চায়নি।

দু'জনের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছে।

—তারপর ?

—ওরা জানতে চেয়েছিল, লোকটা কে। আমিও বলিনি।

—ছাড়ো তো। আমরা কোনও অন্যায় করিনি।

—আমার ভীষণ ভয় করছে।

—কিসের ভয় ! আমি যাচ্ছি। গিয়ে তোমায় নিয়ে আসছি।

—না, এখন না।

—কিসের না। খুকুমণিদা আটকাবে ?

—না গো না।

—তবে ? আজই আমি তোমাকে আনতে যাচ্ছি। ওরা বাড়িতে কেউ আছে ?

—না। প্লিজ, তুমি এসো না।

—রাধি, তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। এটা আমার রেসপনসিবিলিটি। আমি এড়াতে পারি না। তোমার এখন খুব যত্ন দরকার। কেন ও বাড়িতে তুমি থাকবে। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া কী ?

—আমাদের রেজিস্ট্রিটাও করে ফেলা দরকার।

—রেজিস্ট্রি কী গো ?

—কাগজপত্রে বিয়ে। আমি শুভ্রকেও ডেকে নিচ্ছি। তুমি এ বোকামি কোরো না।

—না, এখন আমি যাব না। বৌদি তা হলে ভেঙে পড়বে।

—বৌদির জন্য তুমি আমার কথা শুনবে না !

—সে কথা তো আমি বলিনি।

—বৌদি কেন ভেঙে পড়বে ?

—তুমি পুরুষ মানুষ। বুঝবে না।

দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ হতেই রাধি তাড়াতাড়ি বলেছিল, "প্লিজ তুমি এসো না। কাল দুপুরে তোমার ওখানে যাব। শুভ্রদাকেও ডেকে নিও। আমি ছাড়ছি।" রাধি নিজেই লাইন কেটে দিয়েছিল।

সোফায় বসে আচার খেতে খেতে রাধি টেলিফোনে রিং হওয়ার শব্দ শুনল। নিশ্চয়ই সন্তুদা। আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে বাড়িতে কেউ আছে কি না। তারপর শুরু করবে অসভ্য অসভ্য সব কথা। ইস্, পারেও বটে সন্তুদা। কোত্থেকে এসব কথা শিখেছে, কে জানে ? আগরওয়াল লেনে যা করত ওকে নিয়ে, রাধি মনে করতেও

এখন লজ্জা পায়। তবে কোনও কোনও সময় ভালও লাগে ভাবতে। বিছানায় শুয়ে আলস্যে সময় কাটাবার সময়, ওর সারা শরীর যখন সন্তুদাকে মনেপ্রাণে চায়, তখন হঠাৎ আফসোস করে, রেবাদিদের বাড়িতে পুরো ক্যাসেট সেদিন না দেখে ও খুব ভুল করেছে।

রাধি রিসিভার তুলেই বলল, "বলো।" বিপ্লব দাদাবাবুর ফোন এলে বৌদি এইভাবেই শুরু করত।

—রাধি, শোন, বৌদি বলছি। মেলার কাজে আমরা একটু গড়িয়াহাট যাচ্ছি। দাদাবাবু দশটার আগে আসবে না। যদি আসে বলে দিস, চিন্তা করার কিছু নেই। তুই ঠিকভাবে থাকিস মা। দেখিস পড়ে টড়ে যাস না। দাদাবাবুকে বলে দিস তা'লে। ছাড়ি ?

রাধি খুব হতাশ হল বৌদির ফোন পেয়ে। লেবুর আচার মুখে পুরে রেখেছিল। সেটা চুষতে চুষতে ও এবার ডায়াল করতে লাগল। সন্তুদাকে ওর এখন চাই।

—হ্যালো।

—সনৎ রায়চৌধুরী বলছি।

—আমি রাধি।

—তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

—মিথ্যে কথা। কখন থেকে তোমার ফোনের জন্য বসে আছি। আসছেই না।

—রাধি সোনা, রাগ কোরো না। একটু আগে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এসেছিল। বরানগরে কানুনগোদার ফ্যাক্টরিটা আমি কিনে নিচ্ছি। সে ব্যাপারেই একটু ব্যস্ত ছিলাম।

—তুমি খালি টাকার পিছনেই ছোটো। আর আমি যে মানুষটা একলা ঘরে পড়ে আছি...তার কথা তুমি ভাবো না। বৌদিকে ফোনে বহুবার এই কথাগুলো বলতে শুনেছে রাধি।

—কী বাজে কথা বলছ ?

—এখন তো বলবেই বাজে কথা। আমার সব কথাই এখন তোমার বাজে লাগবে।

—রাধি, স্টপ ইট। ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না।

—তোমার তো ভাল লাগবেই না। এ দিকে আমি আরেকজনকে বয়ে বেড়াচ্ছি...সে কথা কখনও ভেবেছ ?

—কে তোমাকে বয়ে বেড়াতে বলেছে ? তোমার এই অবস্থার জন্য কি শুধু আমিই দায়ী ?

—তবে কি আমি দায়ী ?

—সে কথা কখনও আমি বলেছি ? এখন কী কারণে ফোন করেছ বলো ? আমার সময় এখন কম।

—আমার জন্য তোমার সময় এখন থাকবে না, জানি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

সন্তুদার গলায় এখন সত্যিকারের রাগ, "এভাবে যদি কথা বলো, তা হলে আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।"

—ইচ্ছা হলে দাও।

এরপরই কট্ করে একটা শব্দ শুনল রাধি। ও খুব মজা পাচ্ছিল, সন্তুদাকে রাগিয়ে। জিভ দিয়ে টাকরায় একটা শব্দ করল ও। হিসাবে যদি কোনও ভুল না হয়, তা হলে সন্তুদা এখন আসবেই।

নিশ্চিন্ত মনে বয়াম থেকে আরেকটা আচার ও তুলে নিল। বৌদির আসতে দেরি হবে। দাদাবাবুরও। এই সময়টা নষ্ট করা যায় না। কতদিন ও সন্তুদার বুকে মাথা রেখে শোয়নি। তিরিশ-বত্রিশ দিন তো হবেই। মাঝে একদিন সন্তুদা নিজের কাজে এ বাড়িতে এসেছিল। লজ্জায় ও গেস্টরুম থেকেই বেরোয়নি। পাছে বৌদি হাবভাবে বুঝে ফেলে—লোকটা কে? পর্দার ফাঁক দিয়ে ও কিন্তু লক্ষ করে গিয়েছিল সন্তুদাকে। নীল একটা শার্ট পরে এসেছিল। কবে কিনল ওই শার্ট? আগে কখনও রাধির চোখে পড়েনি। টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদাবাবু একটা কাগজে কী যেন বোঝাচ্ছিল ওকে। শেষে সন্তুদা বলেছিল, "ও সব কিছু জানি না খুকুমণিদা। আপনার ওপর ভার দিলাম। আমাকে করে দিতে হবে।" কথা বলার ফাঁকে সারাক্ষণ সন্তুদার চোখ খুঁজে ফিরেছিল ওকে, রাধি জানে। চটে গেলে সন্তুদা একেবারে অন্য মানুষ। গোখনার কাছে চলে যাবে বলে রাধি আরও একবার খুব রাগিয়ে দিয়েছিল ওকে। লোকটার রাগ চট করে আবার পড়েও যায়। আর পড়ে গেলে, একেবারে উলটো মানুষ। এই যে রাধি আজ ফোনে ওকে চটিয়ে দিয়েছে, রাগ পড়ে গেলে, ভালবাসার অত্যাচারে রাধিকে তখন অতিষ্ঠ করে দেবে।

সোফায় বসে রাধি ভাবল, সন্তুদা ওকে আদর করছে, এই সময় যদি দাদাবাবু এসে পড়ে তখন কী হবে? সন্তুদার যা মান জ্ঞান, এক মুহূর্তও আর ওকে এখানে রাখবে না। নিরালা বাড়ি ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল রাধির। পরক্ষণেই নিজেকে একবার প্রশ্ন করল, কেনই বা ও সন্তুদার কাছে গিয়ে থাকবে না। ওটাই তো ওর জায়গা। সন্তুদার হাতে এখন প্রচুর টাকা। নিজের চোখে রাধি তা দেখেছে। সাট্টায় এত টাকা, না দেখলে বিশ্বাস করত না ও। কোনও অভাবই আর থাকবে না তা হলে রাধির। যখন ইচ্ছা শাড়ি কিনবে, সোনার গয়না গড়াবে, রেস্তোরাঁয় খাবে—সব সুখ ও কিনে নেবে।

তেমন হলে মাকেও ছাড়িয়ে আনতে পারে মেসোর কাছ থেকে।

মায়ের কথা মনে পড়লে আগে খুব ঘেন্না হত। এখন হয় না। বাবা লোকটাই খারাপ। যাত্রা দলে ঘুরে ঘুরে উনি ফূর্তি করবে...মা সহ্য করবে কেন? বেশ করেছে মা মেসোর ঘরে গিয়ে উঠে। মায়ের চরিত্র নিয়ে বৌদি আগে খুব খোঁটা দিত। রাধির খুব কষ্ট হত শুনে, তুই কোথায় আর যাবি? মাটা একটা নষ্ট মেয়েছেলে, মেয়েও সেরকম। খোঁটা দেওয়ার কারণ ঘটত, রাধি কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বললে। বিশেষ করে, শংকরের সঙ্গে। ওই ছেলেটা পাশের মিত্তির বাড়িতে কাজ করত। ওই সব কথা মনে পড়লেই রাধির এখনও রাগ হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৌদি ওকে দিয়ে পা টিপিয়েছে একটা সময়। চোখ ঘুমে ঢুলে আসত। হাতে জোর থাকত না। তাতেও কোনও রেহাই নেই। একদিন লাথিও মেরেছিল বৌদি। রাধি ঠিক করল, শরীর খারাপের অজুহাত করে বৌদিকে দিয়ে একদিন পা টেপাবে। সন্তুদাটা কেন আসছে না? রাধি একবার ঘড়ির দিকে

তাকাল। সিঁথির মোড় থেকে এখানে আসতে বড় জোর মিনিট দশেক। কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেছে। সন্তুদা কি সত্যিই রাগ করেছে? আরেকবার ফোন করে দেখলে হয়। মাথাটা সোফার পিছনে হেলিয়ে দিল রাধি। চুলটা খসে পড়ল কাঁধের ওপর। খোলা চুল খুব পছন্দ করে সন্তুদা। ওকে নাকি তাতে আরও বেশি সেক্সি লাগে। সেক্সি কথাটা রাধি প্রথম শোনে বিপ্লব দাদাবাবুর মুখে। পরে সন্তুদার কাছে, মানেটা শুনে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। মেয়ে মানুষের শরীরটার খুব দাম।

শরীরটা চকচকে রাখার জন্য বৌদি কত কী করে, দেখে রাধি অবাক হয়ে যায়। ড্রেসিং টেবল ভর্তি ক্রিম আর ক্রিম। সবগুলোর নামও ও জানে না। বাইরে কোথাও বেরোতে হলে বৌদির সাজের ধুম পড়ে যায়। তবে বৌদির চেহারায় চটক আছে। সাজলে সত্যিই খুব ভাল দেখায়। মনে হয় বয়স খুব কম। নাভির নীচে কাপড় পরে বৌদি। ওই জায়গার চামড়া খুব টান টান। লাইট নিভিয়ে রাধি ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে সাউথ সিঁথি রোডটা দেখা যায়। নাহ্, সন্তুদার আসার কোনও নামগন্ধই নেই। একটু একটু করে ভয় হতে লাগল ওর। সন্তুদা যদি সত্যিই না আসে? সেই দাদা-বৌদির দয়ায় ওকে সারা জীবনটা কাটাতে হবে। ওরা তো পেটের বাচ্চাটাকে শুধু চায়। রাধি সব শুনে ফেলেছে। বাচ্চা হাতে পেয়ে গেলে রাধিকে আর কোনও দরকার নেই। আচ্ছা, বাচ্চা হওয়ার সময় ও তো মরেও যেতে পারে। কত মেয়েই তো এইভাবে মরে। এমনও তো হতে পারে, ডাক্তারবাবুকে বৌদি শিখিয়ে দিতে পারে, বাচ্চাটাকেই শুধু আমরা চাই। রাধিকে আর বাঁচিয়ে তুলবেন না। ও বেঁচে থাকলে যে-কোনও দিন বাচ্চা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদের কোল থেকে। "মাগো", বলে রাধি শিউরে উঠল এই কথা ভেবে।

সন্তুদা নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন চলে গেলেই ভাল হত। সন্তুদাকে ও আঁকড়ে ধরে থাকত। এখন ওর হাতে অনেক টাকা। অনেক ভাল ভাল মেয়ে পেতে পারে। রাধিকে আর কেন চাইবে? ওর মধ্যে কী আর আছে। শরীরের রস তো নেওয়া হয়ে গেছে। এই আকর্ষণ একবার চলে গেলে, পুরুষ মানুষকে ধরে রাখা, বেঁধে রাখা কঠিন। রাধি ক্রমশই মনের জোর হারাতে লাগল। স্খলিত পায়ে ফের টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়াল ও। ডায়াল করতেই অপরিচিত একজনের গলা পেল, "সনৎবাবু এখন খুব ব্যস্ত। কথা বলতে পারবেন না।" খুট করে লাইন কেটে গেল। রাধির এখন কান্না পাচ্ছে। কেন সন্তুদাকে চটাতে গেল? অস্থির পায়ে ও ফের এসে বসে পড়ল সোফায়। নিজের ওপরই এখন ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। বৌদির মুখ চেয়েই ও ওইদিন সন্তুদাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কী, না বৌদি কষ্ট পাবে। বেচারি খুব আশা করে আছে, বাচ্চা হলে রাধি ওর কোলে তুলে দেবে। আশা ভঙ্গের নমুনা একবার ও দেখেছে এ বাড়িতে। সেবার প্রস্রাব পরীক্ষার পর বৌদি যখন জানতে পারল বাচ্চা হওয়ার জন্য নয়, আটকে গেছে ছোট টিউমার হয়েছে বলে, সেদিন অঝোরে কেঁদেছিল। দু'দিনেই চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছিল বৌদির। দাদাবাবু ভয়ই পেয়েছিল, কোনও কিছু না আবার করে বসে। এ বারও ঠিক তাই। সন্তুদার কথা যদি এরা শোনে, দু'জনেই বিরাট আঘাত পাবে।

এই ক'দিনে বৌদি নামটা জানার অনেক চেষ্টা করেছে, অনেকভাবে প্রশ্ন করেছে। রাধি কোনও উত্তর দেয়নি। এই সেদিন, চুল বেঁধে দিতে দিতে বৌদি প্রশ্ন করেছিল,

"তোর মা আর বাবা যদি তোর এই কথা শোনে, আমাদের দোষ দেবে, না রে ?"

—তোমাদের দোষ দেবে কেন ?

—বিয়ের আগে বাচ্চা হওয়া, ভাল ?

—বাবার কথা আমি ভাবি না। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বাকি আছে। মা অবশ্য দুঃখ পাবে।

—তোর দাদাবাবু বলছিল, যে লোকটা তোকে...তোর সঙ্গে ভালবাসা করেছে, সে কি তোকে বিয়ে করবে ?

—বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে বৌদি।

—তার কি কোনও প্রমাণ আছে ?

—না।

—সে কি জানে, তোর পেটে বাচ্চা এসেছে।

রাধি মিথ্যে কথা বলেছিল, "না। সে এখন এখানেই নেই। বোম্বাই চলে গেছে।"

—এখন আসবে না ?

—জানি না বৌদি।

—না আসুক। তুই আমার কাছে থাকবি মা। তোর ছেলেকে আমিই মানুষ করে দেব।

রাধি এখন এমন অনেক মিথ্যে কথা বলে বৌদিকে। শুনে বৌদি নিশ্চিন্ত হয়। রাধি বাচ্চা হওয়ার আগেই পালিয়ে যাবে না এ বাড়ি ছেড়ে। সন্তুদা অবশ্য রোজ রোজ বলে, ওখানে তোমার থাকার আর দরকার নেই। বনহুগলির কাছে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি। একটা কাজের মেয়ে রেখে দেব। কোনও অসুবিধাই হবে না। রাধি রোজ রোজই অস্বীকার করে যায়।

...সন্তুদাটা আর এল না। রাত দশটা বেজে গেল। প্রথমে এসে পড়ল দাদাবাবু। তার একটু পরেই বৌদি। রাতের খাওয়া দাওয়াও হয়ে গেল। বৌদি মশারি টাঙিয়ে দিয়েছে বিছানায়। মন খারাপ বলেই রাধি ঢুকে পড়ল বিছানায়। দাদাবাবু টিভি দেখছে। বৌদি রান্নাঘরে। রাস্তায় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেল রাধি। এত রাতে...বোধহয় তিন তলার ফ্ল্যাটের দাদাবাবু-বৌদি এল। অনেকদিন ওরা বেশ রাত করে ফেরে।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ। এত রাতে কে এল আবার ? দাদাবাবু উঠে গেল দরজার দিকে। বৌদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাধি বাঁ দিকে কাত হয়ে সবে শুয়েছে। তবে কান খাড়া করে আছে।

—আরে সন্তু ! এত রাতে ?

রাধি শুনল সেই পরিচিত গলা, "ভেতরে একটু আসব খুকুমণিদা ? সঙ্গে শুভ্রও আছে।"

—আরে, এসো এসো। কী ব্যাপার ?

—রাধি আছে ?

—হ্যাঁ, ও তো শুয়ে পড়েছে।

—খুকুমণিদা, ওকে নিয়ে যেতে এসেছি।

পাত্তি টু সিঙ্গল

সিঁথির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু। হঠাৎ দেখল, মোটরবাইকে চেপে গোখনা আসছে ডানলপের দিক থেকে। মাঝ দুপুরের বি টি রোড, যান-বাহন কম। অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার সব কিছু দেখা যায়। গোখনাকে দেখেই স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে উঠল সন্তুর। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত চলে গেল। ইদানীং চেম্বার সঙ্গে না নিয়ে ও বেরোয় না। চিতাই এই অভ্যাসটা করে দিয়েছে। গোখনার কথা ভেবে সব সময় তৈরি থাকতে হয়। সন্তু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল মোটরবাইকটাকে। হর্ন দিতে দিতে আসছে। গোখনার পিছনে একজন মহিলা। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে রেখেছে। মহিলাটি খিল খিল করে হাসছে। বাতাসে আঁচল উড়ছে। ভট ভট শব্দ তুলে বাইকটা এসে দাঁড়াল সন্তুর সামনে। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে গোখনা বলল, "এই সন্তু, পিছনে কে বসে আছে, চিনতে পারছিস ?" সন্তু তাকাল, তাকিয়েই দেখতে পেল, কাকার বউকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গোখনার পিঠে মাথা ঠেকিয়ে আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করল কাকার বউ, "ভাল আছিস, সন্তু ?"

গোখনা বলল, "দ্যাখ, তোর কাকার বউকে কেমন তুলে নিয়েছি।"

...ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও গোখনার কথাগুলো সন্তুর কানে বাজছিল, কেমন তুলে নিয়েছি। কেমন তুলে নিয়েছি। উফ্, এমন বিশ্রী স্বপ্ন কেউ দেখে ? সন্তু বিছানায় উঠে বসল। বহুদিন পর কাকার বউকে ওর মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে, ওর কাছ থেকে বাড়ি বিক্রির টাকা নিয়ে গিয়েছিল কাকা। তারপর আর এ মুখোও হয়নি। কে জানে, সত্যিই আসানসোল চলে গেছে কি না ? টাকা নেওয়ার দিন, একবারও বউয়ের কথা তোলেনি। সন্তুও আগ বাড়িয়ে বলতে যায়নি, তোমার বউ কার কাছে গিয়ে উঠেছে। গাণ্ডু কাকাটা বোধহয় জানেও না, পালের বাগানের বাড়িটা সন্তুই কিনে নিয়েছে। যার নামে কিনেছে, সেই অনুরাধা রায়চৌধুরী, আর কেউ নয়—রাধি। সন্তু কাকাকে অবশ্য বলেছে, ভদ্রমহিলার স্বামী জাহাজে চাকরি করে। বছরে দশ মাস বাইরেই থাকে।

স্বপ্নটার কথা বিছানায় বসে সন্তু যতই ভাবতে লাগল, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাকার বউয়ের সঙ্গে গোখনার আলাপ হল কী করে, এই প্রশ্নটার উত্তর এখনও ও পায়নি। এক হতে পারে, সাট্টায় ঢুকে পড়ার পর গোখনা হয়তো ওর বাড়িতে লোক লাগিয়েছিল। বাড়িতে কোনও পুরুষ মানুষ নেই। গোখনার ঢোকা সহজ হয়েছে। তার ওপর কাকার বউটার তো চরিত্তের ঠিক নেই। পয়সা দেখে পটে গেছে। নীলু হাজরাকে মেরে তাড়াতে গোখনার এক মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। ও সামনে এসে দাঁড়ালেই নীলুর প্রসাব হয়ে যাবে। কাকার বউটা শালা, কারণে অকারণে স্টেশনের কাছে রোজ সন্ধ্যায় ঘুরঘুর করতে যেত। বলত, জিনিসপত্তর কিনতে যায়। কে জানে, নীলুর সঙ্গে যা চালাচ্ছিল, গোখনার সঙ্গেও চালাত কি না। এই ধরনের মহিলারা শরীরের সুখের জন্য পারে না হেন কাজ নেই।

রাধি বাঁ-পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর ঘুমন্ত মুখটা কী নিষ্পাপ। দিন কে দিন যেন আরও রূপ খুলে যাচ্ছে রাধির। ওর

দিকে তাকালেই সন্তু একটু দুর্বল হয়ে যায়। একই ছাদের তলায় রাধির সঙ্গে থাকা, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সেদিন রাতে, শুভ্রকে ডেকে নিয়ে যখন ও খুকুমণিদার ফ্ল্যাটে পা দিয়েছিল, তখন অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবেনি। রাধিকে নিয়ে যেতে এসেছি, এই কথাটা খুব দৃঢ়ভাবেই বলেছিল। মুহূর্তেই মুখের রং পাল্টে গিয়েছিল খুকুমণিদার। মুখ থেকে একটা কথাই ছিটকে বেরিয়েছিল "তুমি ?"

ধপ করে সোফায় বসে পড়েছিল খুকুমণিদা। সন্তু বলেছিল, "হ্যাঁ। আমি। ওকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনও উপায় আমার নেই।

রান্নাঘরের সামনে থেকে একটু অস্ফুট আর্তনাদ শুনে সন্তু সেদিকে তাকিয়েছিল। মুখে আঁচল চাপা দেওয়া একটা মূর্তি—বৌদি। সন্তু একটু কড়া গলাতেই বলেছিল "খুকুমণিদা, আপনার কোনও আপত্তি আছে ?"

—আপত্তি ? না, আপত্তি কিসের ?

—তাহলে ওকে ডেকে দিন।

ডাকতে হয়নি। রাধি নিজেই বেরিয়ে এসেছিল গেস্টরুম থেকে। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু বলেছিল, "চলো, যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

রাধি এগিয়ে গিয়েছিল বৌদির দিকে। অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে বৌদি বলেছিল, "তুই কেন সন্তুর নামটা আমায় বলিসনি মা এতদিন ?"

রাধি কেঁদে উঠেছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, "বৌদি, তুমি আমায় মাপ করো।"

খুকুমণিদা ওই সময়ই উঠে দাঁড়িয়েছিল, "লালি, ওকে বাধা দিও না। সন্তু ওকে আরও ভালভাবে রাখবে।"

খুকুমণিদার পায়ের সামনে বসে পড়েছিল রাধি। বলেছিল, "না দাদাবাবু, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

—তা হয় না মা। সন্তুর মতো ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তুই যা।

—দাদাবাবু, তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

—পাগলি, এটা তোরই বাড়ি মা। যখন-ইচ্ছে আসবি-যাবি। আমরা তো কাছেই আছি।

বৌদি বলেছিল, "এমন করে দুঃখ দিলি, রাধি ?"

খুকুমণিদা শুভ্রকে বলেছিল, "তোমরা গাড়িতে গিয়ে বসো। আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

...সেদিনকার কথা নিয়ে পরে রাধিকে খুব খেপায় সন্তু, "আচ্ছা, তুমি বলেছিলে কেন, আমি কোথাও যাব না ?

দাদাবাবুর ইয়ে খুব ভাল, না ?"

রাধি সত্যিই রেগে যায়, "কোনও কথা তোমার মুখে আটকায় না, না ?"

সন্তু বলে, "সেদিন বেরিয়ে না এলে ফ্ল্যাটের দরজায় আমি পোস্টার মেরে আসতাম।"

—কী লিখতে ?

—এই, আমার পোয়াতি বউকে খুকুমণি আটকে রেখেছে। ইতি, সন্তু।

—ইস্, কী বিচ্ছিরি তোমার মুখ গো।

—কেন, মিথ্যেটা কী বললাম।

—ওখানে থাকলেই ভাল হত। এখানে আমার খুব ভয় ভয় করে।

—কিসের ভয় রাধি ?

—তুমি বাড়ি থাকো না। সারাদিন ঘুরতে ফিরতে একটা কথাই মনে হয়...বাচ্চা হতে গিয়ে যদি মরে যাই। আর ফিরে না আসি।

—ধুৎ। এত মেয়ের বাচ্চা হয়ে ফিরে আসছে। তোমার কিচ্ছু হবে না। নার্সিংহোমে ওরা খুব যত্ন নিয়ে ডেলিভারি করে।

—না গো। রেবাদি একবার বলেছিল, কার যেন বাচ্চা উল্টে গিয়েছিল। হওয়ার সময় মেয়েটা মারা যায়।

—তোমার রেবাদি একটা হারামি।

—আবার মুখ খারাপ করছ। শুভ্রদা তো কই একটা খারাপ কথা বলে না।

—শুভ্রদা হচ্ছে দেবতুল্য মানুষ। শালা, আসলে ভিতুর ডিম। একটা মেয়েকে তুই ভাল বাসিস...অথচ মুখ ফুটে বলবি না ?

—কে গো, ফুল দিদিমণি ?

—আবার দিদিমণি। বলো, ফুলদি।

—মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। সত্যি গো, শুভ্রদার সঙ্গে ফুলদির খুব মানাবে।

—মানিয়ে আর কী হবে। গাণ্ডুটা মুখ ফুটে বলতেই পারল না। এরপর আমি ঠিক করেছি, দু'জনকে এখানে ডেকে এনে এই ঘরে ঢুকিয়ে...বাইরে থেকে দু'দিন তালা দিয়ে রাখব। দেখি শালা, দু'জনে কথা বলিস কি না।

—সবাই কি তোমার মতো অসভ্য। প্রথম দিনেই...।

—প্রথম দিনেই কী গো ?

—আহা, যেন কিছু জানে না।

—সত্যিই জানি না। প্রথম দিনেই কী গো ?

—মনে করে দেখো।

—সত্যিই মনে পড়ছে না। ও হো...মনে পড়েছে...প্রথম দিনেই তুমি দরজা বন্ধ করে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিলে, আর আমি বাইরে থেকে কথা বলছিলাম।

—বাজে কথা। তুমি আমাকে কোলে করে নিয়ে সোফায়...জানি না, যাও।

—বলো না গো, সোফায় কী করেছিলাম।

—কিছু করোনি। ভাল ছেলের মতো বসে ছিলে। রাগ করে রাধি উঠে চলে যায় এই সময়।

...এই মিষ্টি মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়লেই সন্তুর মন আনন্দে ভরে যায়। মাস তিনেক হল ওরা সংসার করছে। কালীঘাটের মন্দিরে ও যেদিন রাধির সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়, সেদিন পিসিমণি, শুভ্র, রানা আর শ্যামলীও সঙ্গে ছিল। পিসিমণি ওকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "মেয়েটাকে একদিনও দুঃখ দিস না।" সন্তু ঘাড় নেড়েছিল। রাধিকে সুখী রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও। একটা কাজের মেয়ে রেখেছে সর্বক্ষণের জন্য। আগরওয়াল লেনের ওই বাড়িটা ছেড়ে ওরা উঠে এসেছে বনহুগলিতে অনন্যা সিনেমার কাছে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে। একেবারে বিটি রোডের ধারে, চারতলায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। সন্তু

ওর কোনও অভাব রাখেনি। ওর ভালবাসায় রাধি এখন আকণ্ঠ ডুবে আছে।

...ঘুমন্ত রাধির দিকে তাকিয়ে সন্তুর কামেচ্ছা জাগছিল। ও তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ভোরের আকাশ দেখার সৌভাগ্য এখন আর হয় না। শুতে যেতে এখন বেশ দেরি হয়ে যায়। রাতে রাধির সঙ্গে বসে টিভি দেখে। ভি সি আরে ক্যাসেট চালায়। দশ বছর আগে, এই বিটি রোড ধরেই ও আর শুভ্র রোজ ভোর বেলায় দৌড়তে দৌড়তে যেত ডানলপ ব্রিজ পর্যন্ত। হরলিক্স ফ্ল্যাক্সে নিয়ে আসত শুভ্র। দৌড় শুরু করার আগে ফ্ল্যাক্সটা লুকিয়ে রাখত পার্কের মাঠে। ফিরে গিয়ে ব্যায়াম করার পর হরলিক্স খেত। সেসব দিন সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। জাগৃতির পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ে প্রতিবার ওরা দু'জন প্রথম দুটো প্রাইজ ভাগাভাগি করে নিত। এখন, কোনও কোনওদিন লিফট্ বন্ধ থাকলে, চারতলায় উঠতে সন্তুর হাঁফ ধরে যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সন্তু ঠিক করল, কাল থেকে রেনবোর মাঠে গিয়ে জগিং করবে।

পুব আকাশে লালচে ভাবটা কেটে গিয়েছে। নীচে বি টি রোডে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। স্বপ্নের কথা আর এখন মনে নেই সন্তুর। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে খাটাল। সেদিকে চোখ গেল ওর। খাটালের এক কোণে কলের সামনে চান করছে একটা হিন্দুস্তানী বউ। উর্ধাংগে শুধু শাড়ির আঁচল। মগ দিয়ে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে সেই আঁচল সরে যাচ্ছে। অনাবৃত স্তন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সন্তু। এ অঞ্চলে চারতলা বাড়ি কম। বউটি হয়তো ভাবতেই পারেনি, খোলা আকাশের নীচে তার চান করা কারও চোখে পড়তে পারে। সন্তু চোখ ফিরিয়ে ডানলপ ব্রিজের দিকে তাকাল। মেয়েদের গোপন অঙ্গ দেখার কৌতূহল ওর নেই। সেটা এক সময় ছিল দিব্যর। ও মাঝে মাঝে এসে বলত, পাশের বাড়ির বৌদির স্নান করার গল্প। স্কুল ছেড়ে সবে ওরা তখন কলেজে উঠেছে।

—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু, চা করে দেব?

প্রশ্নটা শুনে সন্তু এবার ফিরে তাকাল। ব্যালকনির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ছোটন। ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, "শোন, আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যা তো।"

—দিই, দাদাবাবু।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ছোটন জল এনে দিল। একটা প্লেটে ঢাকা দিয়ে এনেছে কাঁচের গ্লাসটা। সন্তুর খুব হাসি পেল। এটা দিন কয়েক আগে ওকে শিখিয়েছে রাধি। কে যেন এসেছিল সেদিন দেখা করতে। জল খেতে চেয়েছিল। ছোটন স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে এসেছিল। তা দেখে রাধি পরে ওকে প্রচণ্ড বকুনি দেয়। মাস খানেক হল, মেয়েটা ওদের কাছে রয়েছে। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স। এখনও ফ্রক পরে। তাঁতি পাড়ায় ওর বাবা আনাজ বেচে। জিতেনই ওকে এনে দিয়েছে পাড়া থেকে। এমনিতে শান্ত শিষ্ট, একটু বোকাও। রাধি দু'বেলা মেজাজ খারাপ করে। মাঝে মধ্যে চড় চাপাটিও লাগায়। সন্তু বুঝতে পারে না, কেন রাধির মেজাজ এত বিগড়ে যায়।

ব্যালকনিতে বসে সন্তু ভাবছে, রাধিও তো এই জীবনটাই এক সময় কাটিয়েছে। এইভাবে অবহেলায়, লাঞ্ছনার মধ্যে। ছোটনের প্রতি ও একটুও মমতা বোধ করে

না ? খুকুমণিদার বাড়িতে যেদিন ওরা দু'জন মিলে প্রথম গিয়েছিল, সেদিন পাড়ায় লোকদের চোখ-মুখ দেখে ওর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেটা ওর প্রতি করুণা, না রাধির প্রতি ঈর্ষা—এখনও বুঝতে পারে না। মারুতি থেকে নামার পরই রাধির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিন তলার দিকে মুখ তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল ও। গাড়ির কাঁচ বন্ধ করে সন্তু নামতেই বেরিয়ে এসেছিল খুকুমণিদা আর বৌদি।

লাল সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়িতে রাধিকে মারাত্মক রকমের সুন্দরী মনে হয়েছিল সেদিন। ফ্ল্যাট বাড়ির অনেকেই চলে এসেছিল এক নম্বরে। বাব্বা : কপাল করে জন্মেছিলি রে রাধি। তোর এত ভাল বিয়ে হবে, আমরা ভাবতেও পারিনি। ...আমাদের বিভাটাও যদি এ রকম জোগাড় করে নিতে পারত...। তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি ? বাব্বাঃ কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। ...কি দিয়ে সন্তুকে পটালি রে রাধি। ...মারুতিটা কি তোদের ?...ইস্ তোর কী ভাগ্য রে !...আমাদের ভুলে যাস না। ...দু'চারটে বছর এখন বরের সঙ্গে ঘুরিস-ফিরিস...এখনই যেন বিয়োতে যাস না...বিয়ের পর কোথাও গিয়েছিলিস...সন্তুটা তোকে কী গয়না দিল রে...। চার পাশ থেকে প্রশ্নগুলো শুনে রাধি হাসছিল। দাঁতের সারি ঝকঝক করছিল।

উপর থেকে নেমে এসেছিল শ্যামলী আর বিউটিফুল। ওরা রাধিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আলাদা ঘরে। তিনজনের সম্মিলিত হাসিতে ফ্ল্যাট বাড়িতে যেন উৎসবের মেজাজ। বিউটিফুল ডেকেছিল, "সন্তুদা এ ঘরে আসুন। আপনি এখন এ বাড়ির জামাই। যা বলব, শুনতে হবে।"

শ্যামলী বলেছিল, "আমাদের মেয়েটাকে এই কদিন ধরে কী করেছ, সব বলতে হবে।"

—সব বলতে হবে ?

—হ্যাঁ, ডিটেল।

—কানে আঙুল দিবি না তো ?

—না, মশাই।

—তা হলে শোন। বিয়ে করার পর বিকেলের দিকে তো বাড়ি ফিরলাম। সেদিনটা খুব গরম ছিল, মলি তুইও জানিস। রাধি স্নান করতে ঢুকল। প্রথমে শাড়ি খুলল, তারপর ব্লাউজ...।

এই পর্যন্ত শুনেই বিউটিফুল বলেছিল, "ধুত, রাধি কী করল, কে জানতে চেয়েছে ?"

—ওহ্। আমি কী করলাম, জানতে চাইছ ? আমি ওর পরই বাথরুমে ঢুকলাম। চান করার সময়, আগে আমি আর শুভ্র দু'জনে একই জিনিস করতাম। প্রথমে শাওয়ার খুলে ব্রহ্মতালুতে থাবড়াতাম। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য। বলতাম, হে ভগবান কোনও মেয়ের কুদৃষ্টি যেন আমার ওপর না পড়ে। আমাকে পবিত্র থাকতে দাও, সারা জীবন কৌমার্য রক্ষা করতে দাও। কোনও মেয়ের ঘিনঘিনে শরীর যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। অনেক সময় শুভ্র আমার মাথায় থাবড়াত। আর আমি ওর মাথা। তারপর শুভ্র কী করত শোনো...

বিউটিফুল বিব্রত মুখে বলেছিল, " এ মা, আমি শুভ্রদার কথা শুনতে চেয়েছি, না আপনার ?"

—আরে, আমি আর শুভ্র কি আলাদা ?

—দেখুন, সন্তুদা, পাশ কাটাবেন না।

খিলখিল করে হেসেছিল রাধি আর শ্যামলী। সন্তু ফের বলতে শুরু করেছিল, "তা, শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে তো স্নান করছি। এমন সময় শুভ্রর কথা মনে হল। আমার তো একটা গতি হল। রানারও হয়েছে। শুভ্র বেচারির কী হবে ? স্বাতী বলে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটা খুব চাইত শুভ্রকে। আর ধৈর্য ধরতে পারল না। যাও একটা হাতের পাঁচ ছিল, সেটাও গেল। বিশ্বাস করো বিউটিফুল। রাধি সাজগোজ করছে তখন ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে। বাথরুমের দরজা খোলা বলে সব দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস করো এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, আমি ভাবছি মেয়েটা কে রে ? এই অবস্থায় কখনও তো দেখিনি। সব মেয়েই কি এই রকম। এই অবস্থায় এক রকম দেখতে, আর শাড়ি-ব্লাউজে অন্য রকম ? সব পরিচিত মেয়ের মুখ মনে পড়তে লাগল। এই যেমন...।"

—কী হচ্ছে কী সন্তুদা। বিউটিফুল এগিয়ে এসে কান ধরেছিল। "ফাজলামি হচ্ছে ? জিজ্ঞাসা করলাম এক কথা, বলা হচ্ছে অন্য।"

—বারে, এই যে বললে আমি এ বাড়ির জামাই। শালি-দের সঙ্গে ফাজলামিও মারব না ?

ওই সময়ই চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিল বৌদি, "এই ফুল, তোর সাহস তো কম না। কান ধরেছিস।"

—দেখো না। খালি অসভ্য কথা বলছে।

—স্টেটমেন্ট ডিসটর্ট করো না বিউটিফুল। আমি অসভ্য কথা বলিনি। যা জানতে চেয়েছিলে, গুছিয়ে বলেছি।

বৌদি ডেকে নিয়েছিলেন রাধিকে, "আয় মা তোর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলি।"

ঘরে তখন একা বিউটিফুল। শ্যামলী বোধহয় রান্নাঘরে। চায়ের খালি কাপটা নীচে নামিয়ে রেখে সন্তু বলেছিল, "বিউটিফুল, সত্যি বলো তো, তুমি অবাক হয়েছ কি না ?

—কেন, সন্তুদা।

—এই, রাধিকে বিয়ে করা নিয়ে।

—একেবারেই না। আপনিই এই কাজটা পারেন। আপনাদের মধ্যে আর কেউ সাহসই পেত না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবে না ?

—সন্তুদা, মিনতি করা আপনাকে মানায় না।

—না, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—হোক না, বলুন।

—শুভ্রকে তোমার কেমন লাগে ?

—এত ভাল ছেলে, এখনকার যুগে মানায় না।

—আসলে কী জানো, ও অত্যন্ত ভদ্র। চট করে কারও সঙ্গে সহজ হতে পারে না।

—সন্তুদা, স্বাতীর সঙ্গে কি ওর অ্যাফেয়ার ছিল ?

—না। শুভ্র একবার আমায় সব বলেছিল। ওটা ছিল স্বাতীর দিক থেকে এক তরফা।

—কেন, মেয়েটা কি ওর যোগ্য ছিল না ?

—ঠিক তা নয়। আসলে পিসিমণিই পছন্দ করতেন না। শুভ্র এমন কিছু কাজ করবে না, যা পিসিমণির অপছন্দ।

—তরুমাসিকে ও খুব ভালবাসে, না ?

—ভীষণ।

—সন্তুদা, এত দিন ওদের বাড়িতে গিয়েছি। অথচ একদিনও আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হয়নি।

—বোকা মেয়ে। এই জন্যই তোমার অভিমান ?

—অভিমান না। ও একদিনও আমাদের বাড়িতে আসেনি।

—তুমি একটু এগিয়ে যেতে পারো না ? আমি জানি, পিসিমণির খুব পছন্দ তোমাকে। আমার সামনেও দু'একদিন বলে ফেলেছে সে কথা।

—ও কিছু বলে না ?

—আমি কোনওদিন জিজ্ঞাসা করিনি। ও ভীষণ চাপা ছেলে। এবার জিজ্ঞাসা করবই। বলো তো, এখুনি ফোনে ডেকে নিই।

—সে আপনার ইচ্ছে।

সন্তু ড্রয়িংরুমে উঠে গিয়েছিল। টেলিফোন করবে বলতেই খুকুমণিদা বলেছিলেন, কাকে করবে সন্তু ?

—শুভ্রকে। ওকে ডেকে নিই।

ফোন করতেই শুভ্র বলেছিল, "কোত্থেকে করছিস ? তোকে আমার ভীষণ দরকার।"

সন্তু বলেছিল, কেন রে ? আমি এখন নিরালায়। চলে আয় না ?

—আর কে কে আছে ?

—সবাই। মলি, এমন কী বিউটিফুলও।

—না রে। এখন সময় হবে না। কাল সকালে তোর ওখানে যাচ্ছি।

—কেন রে ?

—ফোনে বলা যাবে না।

—এখন আয় না।

—না রে, তোদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

ফোন ছেড়ে দিয়ে সন্তু একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিল। গেস্টরুমে ঢুকতেই বিউটিফুল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী হল সন্তুদা, ওকে আনতে পারলেন না ?"

—না।

—আমার কথা না বললেই পারতেন।

একটু পরেই ফুল্লরা উঠে গিয়েছিল দোতলায়।

...ঠক করে কী একটা পড়ল পায়ের সামনে। সন্তু বর্তমানে ফিরে এল। দেখল, খবরের কাগজ। হকাররা ওপরে আসতে চায় না। গোল করে পাকিয়ে, নিচ থেকেই ছুঁড়ে বারান্দায় পাঠিয়ে দেয়। কী একটা মনে হওয়াতে সন্তু উঠে গিয়ে কাগজটা তুলে

আনল। খবরটা আজ বেরিয়েছে কি ? কাল সকালে সুমনকে ব্রিফ করে দিয়েছিল। সুমন চক্রবর্তী...কমলের ভাই। ডি গুপ্ত লেনে থাকে। খবরের কাগজের রিপোর্টার। দু'দিন আগে শেঠ লেনের কাছে গোখনার দুই পেন্সিলারের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল ওদের। রাতের দিকে বোমাবাজিও হয়। গোখনার ডান হাত কালিয়া মারাত্মক চোট পেয়ে হাসপাতালে যায়। সুমনকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল সন্তু। নিজের ইচ্ছে মতো ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দেয়।

তাড়াতাড়ি কাগজটা মেলে ধরল সন্তু। প্রথম পাতার নীচের দিকে, এই তো খবরটা। সিঁথি অঞ্চলে দুই সাট্টা ডনের লড়াই, ব্যাপক বোমাবাজি। চার কলম জুড়ে খবর। দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল সন্তু। সুমন বেশ গুছিয়ে লিখেছে। 'দুই সাট্টা ডন—গোখনা ও কেলেপাঁচুর মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই চলছে। কেলেপাঁচু একসময় গোখনার পেন্সিলার ছিলেন। মতান্তর হওয়ায় দল ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই দুই ডনের দৌরাত্মে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। বুধবার রাতে ব্যাপক বোমাবাজিতে মারাত্মক আহত হন গোখনার সহযোগী কালিয়া সিংহ। তাঁকে আর জি করে ভর্তি করা হয়েছে। সিঁথি অঞ্চলে গোখনার প্রতিপত্তি কমেছে। তাঁর আর এক সহযোগী রতন দাস মাস কয়েক আগে এক রিক্সাওয়ালাকে হত্যা করার অভিযোগে ধরা পড়ে এখন জেল হাজতে। স্থানীয় নাগরিক কমিটির লোকেরা দফায় দফায় থানায় অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। কমিটির তরফে যতীন দাস অভিযোগ করেন, পুলিশ একেবারেই সক্রিয় নয়। গোখনার সঙ্গে পুলিশের গোপন আঁতাত রয়েছে। অন্য দিকে, থানার ওসি বিপ্লব ঠাকুর বোমাবাজির ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, তারা যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আশা করছেন, শীঘ্রই সাট্টা বন্ধ করে দিতে পারবেন।

খবরটা পড়ে সন্তু মনে মনে হাসল। যা চেয়েছিল, সুমন তাই লিখেছে। ব্রিফ করার পর, ওর হাতে দামি একটা মিনি টেপ রেকর্ডার তুলে দিয়েছিল সন্তু, "এটা রাখ। তোর কাজে লাগবে।'

সুমন অবাক হয়ে বলেছিল, "কী এটা সন্তুদা।"

—সোনির রেকর্ডার। তোরা তো হরদম ইন্টারভিউ-টিউ নিস।

এটা দরকার হবে।

সুমন ইতস্তত করেছিল, "না...না সন্তুদা।"

ধমক দিয়েছিল সন্তু, "রাখ না। তুই কমলের ভাই। কমল আমার সঙ্গে এক টিমে খেলত। দাদা হিসাবেই তোকে এটা দিচ্ছি। একেবারে নতুন। আমার কোনও কাজে লাগবে না। পড়ে থেকে নষ্ট হবে।"

শেষ পর্যন্ত রেকর্ডারটা সুমন নিয়েছিল। কতই বা বয়েস ওর। লোভ সামলাতে পারে ? খবরের কাগজের লোকজনের সঙ্গে র‍্যাপো রাখা দরকার। সন্তু এটা বুঝে গেছে। সুমন বলেছে, ওদের আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। খবরের কাগজ পিছনে লেগেছিল বলে রশিদের মতো লোক শেষ হয়ে গেল। তবে এটাও ঠিক, খবরের কাগজের এক রিপোর্টার পিছনে মদত না দিলে রশিদ এত উঁচুতেও আবার উঠতে পারত না। পুলিশ, আমলাদের থেকেও মারাত্মক হল রিপোর্টার। একটা লাইনেই বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে গোখনাদের মতো লোকের।

কাগজে আজকাল পড়ার কিছু থাকে না।

খেলার পাতায় চোখ বুলিয়ে সন্তু দেখল, শারজায় ক্রিকেটে ভারত আবার হেরেছে। ফুটবল লিগের শেষ ম্যাচে মোহনবাগান চার গোলে হারিয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফকে। সন্তু বরাবরই ফুটবল ফ্যান। শুভ্রর মতো একেবারে পছন্দ করে না ক্রিকেট।

—দাদাবাবু, জিতেনদা এসেছে। ছোটন এসে খবর দিল।

—বৌদি ঘুম থেকে ওঠেনি ?

—না, এখনও শুয়ে রয়েছে।

—ঠিক আছে, জিতেনকে ডেকে নিয়ে আয়। আর বারান্দায় একটা চেয়ার এনে দে।

জিতেন রোজ সকালবেলায় আসে। তবে ন'টা-সাড়ে ন'টার পর। এসে আগেরদিন কত কালেকশন হয়েছে বলে যায়। আজ তাড়াতাড়ি এল কেন ? ছেলেটা খুব বিশ্বস্ত। সন্তু টাকা দিয়ে ওর বাবাকে একটা মুদির দোকান করে দিয়েছে। ওদের পুরো ফ্যামিলি সন্তুদা বলতে এখন অজ্ঞান।

জিতেন বারান্দায় আসতেই সন্তু জিজ্ঞাসা করল, "কী খবর রে ?'

—সন্তুদা, এখানে লুকিয়ে আছে ? বড়বাজারের বিহারী এখানে।

সন্তু চমকে উঠল, কোথায় ?

—আলমবাজারে। নারায়ণী সিনেমার কাছে একটা বাড়িতে।

—তুই দেখেছিস ?

—না। আমি জানি।

—ওয়াচ রাখ।

বড়বাজারের বড় সাট্টা চালায় বিহারী। মাস কয়েক আগে পুলিশ ওর ডেরায় হানা দিয়ে ওর ভাইপোকে পেয়েছিল। খবর পেয়ে বিহারী আগেই পালিয়ে যায়। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনও ধরতে পারেনি। শালা, এই অঞ্চলে বসলে মুসকিল। সন্তু বলল, "ওকে ধরিয়ে দিলে আমার কোনও লাভ হবে রে ?"

—দরকার কী শত্রুতা বাড়িয়ে ? একদিন না একদিন ছাড়া পাবেই।

—ঠিক বলেছিস।

—বরং ওকে প্রোটেকশন দিলে ভাল হয়।

—মন্দ বলিসনি। পাঁচুদাকে ভিড়িয়ে দে তাহলে।

—ঠিক আছে।

—গোখনা ক্যাম্পের কোনও খবর আছে ?

—কালিয়ার একটা হাত বোধহয় বাদ দিতে হবে।

—সে কী ?

—হ্যাঁ। গোখনা খুব ভেঙে পড়েছে। কালিয়া বহুদিন ধরেই টার্গেট ছিল আমার। সেদিন শেঠ লেনে পেয়ে আর ছাড়িনি।

—বহুত বাড় বেড়েছিল কালিয়াটা।

—সন্তুদা, সাট্টা কয়েকদিন গুটিয়ে ফেললে ভাল হয়।

—আমিও ভাবছি। বরানগরে গ্লাস ফ্যাক্টরিটা কিনতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। কানুনগোদা একটুও কমালেন না। পুজো অবধি চালাই। তারপর আর সাট্টার

সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।

—হ্যাঁ, আপনাদের মানায় না সন্তুদা। সাট্টা আপনার মতো লোকের জন্য নয়।

—ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটা বেশ প্রফিট দিচ্ছে। ভাবছি, গ্লাস ফ্যাক্টরিটাও ঢেলে সাজাব।

—আমার কী হবে, সন্তুদা?

—তুই আমার সঙ্গে থাকবি। শোন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অ্যাকাউনট্যান্ট ছেলেটার দিকে লক্ষ রাখিস তো।

—না সন্তুদা ছেলেটা ভাল।

—তবু লক্ষ রাখিস।

জিতেন ঘাড় নাড়ল, "তা হলে আমি উঠি?"

—যা।

জিতেন উঠে চলে গেল। ব্যালকনিতে এখন বেশ রোদ্দুর। তবে খারাপ লাগছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে সন্তু জিতেনের কথাগুলোই ভাবতে লাগল। "এ সব আপনার মানায় না।" কেন বলল এই কথাটা জিতেন? সাট্টার লাইনে সন্তু ঢুকেছিল একটা জেদের বশবর্তী হয়ে। প্রচুর টাকার দরকার ছিল ওর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, লাইনটা ভাল না। পাঁচুদার গদিতে এই কয়েকদিন আগে ও গিয়েছিল কোনও একটা দরকারে। হঠাৎ ওখানে একটা চেনা মুখ দেখে থমকে যায়। চাঁদুদা! পালেরবাগানে ওদের পাশের বাড়িতে থাকত এই চাঁদুদা। ওর মেয়ে ঝুমঝুমিকে এক সময় সন্তু খুব ভালবাসত। পায়ে পোলিও বলে ঝুমঝুমি হাঁটতে পারে না। বাড়ির রকে ওকে ফেলে রাখত ওর মা। সন্তু ঘরের জানালা দিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে যেত। মাঝে মাঝে সন্তার খেলনাও এনে দিত।

চাঁদুদাকে সাট্টা খেলতে দেখে খুব খারাপ লেগেছিল সন্তুর। কতই বা রোজগার ওই লোকটার? ওদের সংসারে দারিদ্রের চিহ্ন সন্তু নিজেও একসময় দেখত। পয়সার অভাবে মেয়েটার কোনও চিকিৎসাই করতে পারেনি চাঁদুদা। ঝুমঝুমির অসহায় মুখটা মনে পড়লে বুকটা টনটন করে ওঠে সন্তুর। সেদিন মনে হয়েছিল, সাট্টার মতো বিশ্রী নেশার টানে যারা আসে—সংসারের প্রয়োজন, বাচ্চার শুশ্রুষা, মায়ের পথ্য, বউয়ের সামান্য সুখ—এ সব কথা কখনও তারা ভাবে না। ওদের কাছে তিনটি তাস, জীবনের অন্য সব প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি দামি। ওই তিনটি তাস মেলাবার জন্যই সারাদিন ওরা উন্মুখ হয়ে থাকে। ওদের ধারণাও নেই, পাঁচুদের মতো লোকেরা ওই তিন তাসের টোপ ফেলে কীভাবে রোজ রোজ রক্ত চুষে খাচ্ছে।

জমি থেকে ওই চারতলা উঁচুতে বসে থাকতে থাকতে সন্তু যেন জীবনটাকে এখন অন্যভাবে দেখতে পাচ্ছে। জিতেনের সামান্য একটা কথা ওকে খুব ভাবাচ্ছে। গোখনা, কাকার বউ, কাকা, শুভ্র, রানা, দিব্য, শ্যামলী, বিউটিফুল, পিসিমণি, রাধি, খুকুমণিদা, বৌদি...সবাই যেন জীবনের প্যাকেটে মোড়া এক একটা তাস। দূরে, অসীম শূন্যে অলক্ষে বসে কেউ যেন সেই তাস শাফল্ করে যাচ্ছে। তাসের নম্বর মিলল কি না, তা জানার আগ্রহ তার নেই। মিলে গেলেও তার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অদৃশ্য এই জুয়াড়ির কথা ভেবে সন্তু একবার কেঁপে উঠল। একটা দিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন তিনি সব হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে দেবেন। সমান সমান করে

দেবেন পাল্লাটা। আজ জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলছে বটে সন্তু, ভাবছে ও জিতেই যাচ্ছে। কিন্তু যখন হারবে তখন আর পায়ের তলায় মাটি পাবে না। হয়তো ঝুমঝুমির মতোই কেউ বড় হচ্ছে রাধির পেটে। কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল ও।

—দাদাবাবু, বৌদিমণি ডাকছে। ছোটনের গলা শুনে সন্তু আবার বাস্তবে ফিরে এল।

চেয়ার ছেড়ে ও উঠে দাঁড়াল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ও বারান্দায় বসে আছে। অদ্ভুত সব কথা ভাবছে। দ্রুত পায়ে ও বেডরুমে এল। ওকে দেখেই রাধি বলল, "এই শিগ্গির এসো। আমার তল পেটটায় কী রকম করছে যেন।"

ওর মুখে ভয়ের চিহ্ন। সন্তু তাড়াতাড়ি বিছানায় এসে বসল। রাধিকে কাছে টেনে বলল, "কী হয়েছে?"

—পেটের ভেতর লাথি মারছে, দেখো। সন্তুর হাত টেনে নিজের তলপেটে রাখল রাধি, "একটু ধরে থাকো, এই খানে।"

হো হো করে হেসে উঠল সন্তু। তারপর বলল, "নির্ঘাত ছেলে। বেটা জেনেই আসছে, বাবা এক সময় ক্যারাটে শিখত।"

পাত্তি টু পাত্তি

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করাল শুভ্র। রানাকে বলল, "দেখ তো, মিটারে কত হয়েছে?"

রানা হিসাব করে বলল, 'উনপঞ্চাশ টাকা।"

দরজা খুলে নেমে শুভ্র পার্স বের করল। ওর কাঁধে কিটব্যাগ। ক্লাব থেকে সব কিছু ও আজ নিয়ে এসেছে। আর ক্লাবের হয়ে খেলবে না। ফুটবলে এত পলিটিক্স ওর আর ভাল লাগছে না। ইন্ডিয়া টিমের ট্রায়াল ক্যাম্প থেকে ফেরার পর ওর মন খুব ভেঙে গেছে। সামান্য কথাতেই আজকাল মেজাজ গরম করছে।

—আর পাঁচটা টাকা বেশি দিন দাদা।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের দাবি শুনে শুভ্র রেগে বলল, "কেন?"

—বড় রাস্তা থেকে এত ভেতরে নিয়ে এলেন, এতখানি রাস্তা আমাকে খালি যেতে হবে।

—ট্যাক্সি বের করেন কেন আপনারা?

—আপনাকে তোলার আগে আমি কিন্তু বলেছিলাম দাদা। এসপ্লানেড থেকে এত দূর আসতামই না।

—একটা পয়সাও বেশি দেব না।

—মস্তানি করছেন?

—কী বললেন? জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ড্রাইভারের জামার কলার ধরল শুভ্র, "মাস্তানি তো আপনি করছেন।"

রানা খুব অবাক হয়ে গেল শুভ্রকে চটে উঠতে দেখে। ও তাড়াতাড়ি শুভ্রকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমি দিচ্ছি ভাড়া। তুই যা।"

শুভ্র পাঁচটা দশ টাকার নোট সামনের সিটে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এই জন্যই তো ট্যাক্সি ড্রাইভাররা পাবলিকের হাতে মার খায়। রাত্রিবেলা হলেও না হয় কথা ছিল। বেলা এগারোটার সময়ও বেশি টাকা চাইবে ?

রানা হাত ধরে টানল, "ছেড়ে দে। তোর হঠাৎ কী হল শুভ্র ? সামান্য ব্যাপারে মাথা গরম করছিস।"

গেট দিয়ে ওরা দু'জন বাগানে ঢুকল। সকালে প্র্যাকটিসে আজ আর বাইক নিয়ে যায়নি শুভ্র। তেল ভরার কথা ভুলে গেছিল। ফেরার সময় ট্যাক্সি ধরে কার্জন পার্ক থেকে। ড্রাইভারটা তখন অবশ্য বলেছিল, "উত্তরের দিকে যাব না দাদা। বড্ড জ্যাম সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। পাঁচ টাকা যদি বেশি দেন, তা হলে যাব।"

শুভ্র বলেছিল, "আগে চলুন, তারপর দেখা যাবে।" ফেরার সময় জ্যাম দেখে সত্যি মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল ওর। পাতাল রেলের কাজ কবে শেষ হবে কে জানে ? উত্তরের লোকজনদের কি এরা মানুষ বলে মনে করে না ? দক্ষিণে পাতাল রেলের কাজ কবে শেষ হয়ে গেছে। মেট্রো রেল পুরনো হয়ে গেল ওদিকে।

গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে বাসের জন্য রানাকে অপেক্ষা করতে দেখে শুভ্র ট্যাক্সি থামিয়ে ওকে তুলে নিয়েছিল।

—কী ব্যাপার, সাত সকালে তুই এখানে।

—প্রফেসর মল্লিকের কাছে এসেছিলাম। স্যার খুব প্রবলেমে পড়েছেন ?

—কী প্রবলেম ?

—চিড়িয়ামোড়ে স্যারের একটা বাড়ি আছে। তলায় বহুদিন ধরে মদের দোকান। স্যার তোলার চেষ্টা করছেন, মামলাও চলছে। আজ বললেন, গোখনা নামে এক মাস্তান হুমকি দিয়ে গেছে, পুরো বাড়িটাই ওর নামে লিখে না দিলে—বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

—গোখনার সঙ্গে মদের দোকানের সম্পর্কটা কী ?

—হাত বদল হয়ে এখন দোকানটা ও-ই কিনেছে।

—আই সি !

স্যার আমাকে অনেক হেল্প করছেন। আমি বলেছি আজ দুপুরেই আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে সব জানাতে।

—কখন আসবে ?

—এই ধর, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

—তোর বাবাকে দিয়ে হবে-টবে না। অনেক দেরিও হবে। তার চেয়ে সন্তু আর চিতাকে ধর। সহজে হয়ে যাবে।

—মন্দ বলিসনি। সন্তুর কথা আমার মাথায় আসেনি।

সন্তুর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য শুভ্র বাড়িতে টেনে এনেছে রানাকে।

বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রানা বলল, "শুভ্র তোর আজকাল কী হয়েছে রে ? মাঝেমধ্যেই দেখছি ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছিস। আগে তো এমন ছিলি না।

শুভ্র কোনও উত্তর দিল না। বাড়ির ভেতরে ঢুকে কিটব্যাগটা নামিয়ে রাখল বাইরের ঘরে। তারপর বলল, "পিসিমণি ফলতায় গেছে। বাড়িতে কেউ নেই।"

—বাঃ, শ্যামলীকে তা হলে ডেকে নে না। একটু আড্ডা মারি।

—কী করে ডাকবি ? ওদের বাড়িতে তো ফোন নেই।

—ফুল্লরাদের বাড়িতে আছে। নতুন এসেছে। চল, ওপরে গিয়ে ফোন করি।

—উপরে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই শুভ্র সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। পিসিমণি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। শুভ্রর সময় কাটতে চায় না। চোখ বুজে ও একবার ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। ও কলার ধরতেই অসম্ভব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ইস্ এতটা খারাপ ব্যবহার না করলেও পারত। ও একবার এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল। সেদিন খুব বকাবকি করেছিল সন্তু।

রানা কথা বলছে টেলিফোনে। বেশ অপরাধী অপরাধী মুখে। অবলীলায় মিথ্যে বলে যাচ্ছে।

—মলি তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। আমার সেদিন কাজ ছিল। ... হ্যাঁ হ্যাঁ... এখানে এসে দেখি শুভ্রর প্রচণ্ড জ্বর... বাড়িতে পিসিমণি নেই... ফলতায় গেছে। না... বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বুজে। ইস, কী কষ্ট পাচ্ছে বেচারা। ভাবছি মাকে ডেকে আনব। না, না তোমার আসার দরকার নেই। শুধু শুধু ভিড় বাড়ানো... ঠিক আছে এসো তা হলে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে রানা হাসিমুখে সোফায় এসে বসল। সেদিকে তাকিয়ে শুভ্র বলল, "লায়ার।"

—ছাড় তো। প্রেমে আর রণে মিথ্যা বলে কিছু নেই। এমন ওষুধ দিয়েছি, মলির বাবাও ছুটে আসবে।

শুভ্র বলল, "প্রেমে তুই খুব অভিজ্ঞ হয়ে গেছিস, না রে ?"

—বলতে পারিস। আগে সপ্তাহে দু'টো করে মিথ্যে কথা বলতাম। এখন দিনে দু'টো করে বলতে হচ্ছে।

—প্রেম করার মাশুল তো দিতেই হবে।

—আর পারছি না। মেয়েরা খুব ডিমান্ডিং। কলেজের চাকরিটা পেলেই ভাবছি, শালা বিয়ে করে ফেলব সন্তুর মতো।

—আর কত দেরি ?

—বছর দেড়েক। মানে, বছর খানেক এখনও সন্তুর ছেলেকে কোলে করে ঘুরতে হবে।

শুভ্র হেসে ফেলল। সন্তুর নতুন ফ্ল্যাটে এখনও ও যায়নি। শ্যামলীদের মুখে শুনেছে, দারুণ সাজিয়েছে। সন্তুটা খুব সাকসেসফুল। পিছন থেকে সবাইকে মেরে ও বেরিয়ে গেল। রানাকে বলল, "সন্তুকে ফোনে ধর তো। এখন ট্রান্সপোর্টের গদিতে আছে।"

খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। কাল রাতে ইন্টার মিলান আর জুভেন্টাসের ম্যাচ দেখাচ্ছিল প্রাইম স্পোর্টসে। অনেক রাত্তিরে শুয়েছে। সোফায় শুয়ে ও দু'একবার হাই তুলল। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, "সন্তুকে পেলে স্যারের প্রবলেমটা সব গুছিয়ে বল। আমি একটু গড়িয়ে নিই। দুপুরে খেয়ে যাবি কিন্তু। আর হ্যাঁ, শ্যামলী এলে শুধুই গল্প করিস। এমন কিছু করিস না, যাতে তোদের ছেলে নিয়ে আমাকে আবার কোলে করে ঘুরতে হয়।"

রানা লাইন পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "বেশি কথা বলিস না। তোর

গায়ে এখন ধুম জ্বর।"

শুভ্র পাশ ফিরে চোখ বুজল। রোজ রাতে শোয়ার সময় ফুল্লরার মুখটা একবার মনে পড়ে যায় ওর। বিড় বিড় করে প্রচণ্ড ভালবাসা দিয়ে ও দু' তিনবার উচ্চারণও করে... "ফুল, আমার ফুল। তোমাকে আমার খুব দরকার ফুল। অনেক অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। ফলতায় আমাদের বাড়িটার গায়েই গঙ্গা। সেখানে ডুবন্ত সূর্যের সামনে তুমি আর আমি বসে শুধু কথা বলে যাব। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?"

ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যেতে যেতে শুভ্র একটা দৃশ্য দেখে রোজ। একটা টিলার ঠিক ওপরে সাদা জামদানি পরে ফুল দু' হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথায় ফুলের মুকুট, হাতে ফুলের গয়না। দিন কি রাত বোঝা যায় না। হালকা মোলায়েম একটা আলো এসে পড়ে ওর মুখে। খুব মায়াবি মনে হয়। শুভ্র খুব কষ্ট করে রোজ টিলার ওপরে ওঠে। কিন্তু উঠলেই তখন আর ফুলকে দেখতে পায় না। শুভ্রর খুব ভাল লাগে এই স্বপ্নটা দেখতে। বাঙ্গালোরে ট্রায়ালক্যাম্পে ও ছটফট করেছে স্বপ্নটা দেখার-জন্য। দেখতে পায়নি। এন আই এস হোস্টেলে শুভ্রর রুমমেট ছিল হায়দরাদের সাব্বির পাশা। ও একদিন সকালে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হোয়াট ইজ ফুল, চ্যাটার্জি?"

—হোয়াই?

—লাস্ট নাইট ইউ ওয়ার শাউটিং ফুল ফুল। হোয়াট ইজ দ্যাট ম্যান।

—দ্যাট ইজ ফ্লাওয়ার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড।

—আই সি।

... কতক্ষণ ঘুমিয়েছে শুভ্র জানে না। মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল ও। শ্যামলীর গলা, "শুভ্রদা খুব রোগা হয়ে গেছে গো।"

রানা বলল, "আমি না এলে কী যে হত, কে জানে! একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।"

—ডাক্তার দেখানো দরকার। না হলে পিসিমণি আমাদের বকবে।

—না, এখন ডাকার দরকার নেই। বিকেল অবধি দেখি।

—এখন খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে।

—ম্যালেরিয়া মনে হয় না।

—তুমি কি ডাক্তার?

—আমার দাদু ছিল।

—আগে কখনও বলোনি তো?

—দরকার হয়নি। দাদুর সঙ্গে বিধান রায়ের ঝগড়া হয়েছিল। তারপরই দাদু দেশের বাড়িতে চলে যান। আর ডাক্তারি করেননি।

শুভ্রর খুব হাসি পাচ্ছিল ওদের কথাবার্তা শুনে। রানা দিনের দ্বিতীয় মিথ্যে কথাটাও বলে ফেলল। হাসি চাপার জন্যই ও একটু উঃ আঃ করতে লাগল। জীবনে কখনও অভিনয় করেনি। নবজাতকের ফাংশানে রানারা অনেকবার চেষ্টা করেছে, তা সত্ত্বেও ও যায়নি। জীবনে প্রথম আজ জ্বরের রোগীর অভিনয় করছে। মনে মনে একবার ভাবল, পাশ ফিরে ওদের দিকে মুখ করে শোবে কি না। শুলে আরও ভাল করে মজা পেত।

রানা বলল, "মলি, ওকে ডিসটার্ব করে লাভ নেই। চলো শুভ্রর ঘরে গিয়ে বসি। তুমি যা হিড়িম্বামার্কা গলায় কথা বলছ, শুভ্র জেগে যেতে পারে।"

শ্যামলী বলল, "ফুল, তুই তাহলে এখানে বোস। শুভ্রদা উঠলেই আমাকে ডাকবি।"

ফুল! শুভ্র প্রায় উঠে বসতে যাচ্ছিল নামটা শুনে। ফুলও তাহলে এসেছে! ওর হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল। একটু পর, অভিনয়টা আরও নিখুঁত করার জন্য ও হঠাৎ বলল, "পিসিমণি, পিসিমণি... আমায় একটু জল দাও।" কথাটা একটু টেনে টেনে বলল।

আরও দু'একবার ডায়লগটা বলার পরই শুভ্র নাকে একটা মিষ্টি গন্ধ পেল। বোধহয় ল্যাভেন্ডার ডিউ। টের পেল ঠিক পিঠের কাছে ফুল এখন দাঁড়িয়ে। এত কাছে? শুভ্রর সারা শরীরের স্নায়ুতে যেন ঝড় উঠল। অদ্ভুত এক ধরনের সুখানুভূতিতে ও ডুবে যাচ্ছে। ও উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ফুল কী করে, তা দেখার জন্য।

—এই যে, জল।

ভয়ার্ত কাঁপা গলা শুনে শুভ্র চিত হয়ে শুলো। ওর ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। জিভও আড়ষ্ট। ঘোলাটে চোখে একবার তাকাবার ভঙ্গি করে ও হাত তুলে গ্লাস নেওয়ার চেষ্টা করল। অভিনয়টা আরও নিখুঁত করার জন্যই গ্লাসটা না নিয়ে, হাত কপালের ওপর ফেলে দিল। সত্যি সত্যিই ওর গা এখন খুব গরম। কপালের উত্তাপ বেশ টের পাচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বোঝাতে ও দু'-একবার চুল ধরে টানলও। শুভ্র এখন স্বপ্ন দেখছে যেন। ফুল সোফার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। শুভ্রর ঘাড়ের পিছনে বাঁ হাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে আনল নিজের বুকের কাছে। দ্বিধা না করেই বলল, "মুখটা হাঁ করলে ভাল হয়।"

শুভ্র মনে মনে বলল, "ফুল, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলেই অপলক তাকিয়ে রইল ফুলের দিকে।

—কী হয়েছে রে ফুল? শ্যামলী আর রানা এখন ও ঘরে। ফুল তাড়াতাড়ি শুভ্রকে শুইয়ে দিয়ে বলল, দেখো না মলিদি, জল খেতে চাইছিল। জ্বরের ঘোরে পিসিমণিকে খুঁজছে।

শ্যামলী একটু রেগেই রানাকে বলল, তখন তোমাকে বললাম, ভরত ডাক্তারকে একটু খবর দিতে।

রানার গলায় বিস্ময়, ধ্যাত, জ্বর না হাতি। ও অ্যাকটিং করছে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি এসে হাত দিল শুভ্রর কপালে। তারপর বলল, অ্যাকটিং করছে মানে? গায়ে হাত দিয়ে দেখো। অন্তত দুই জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।

রানা বলল, তোমরা আসার আগে তো ভালই ছিল। এই সময় শুভ্র কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার জন্য তোরা ব্যস্ত হোস না মলি। বলেই ও উঃ আঃ শুরু করল।

ফুল বলল, মাকে আসতে বলি মলিদি? আমার ভীষণ ভয় করছে। মা আমাকে খুব বকবে।

শুভ্র টেনে টেনে বলল, না, না কাউকে ডাকতে হবে না। আমি ঠিক আছি।

শ্যামলী বলল, শুভ্রদাকে কোনওদিন অসুখে শুয়ে থাকতে দেখিনি রে, ফুল। কী

হবে এখন ?

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানা পা চালিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, এটা শুভ্রনীল চ্যাটার্জির বাড়ি... বাসা নয়। কোত্থেকে বলছেন... কী... বাংলাদেশ ? ঢাকা থেকে... ? বলুন, না, আমি ওর বন্ধু বলছি... আবাহনী ক্লাব থেকে ? ... কী ব্যাপার বলুন তো... ধরুন... ।"

রিসিভারটা টেবলের ওপর রেখে রানা সোফার সামনে এসে বলল, "এই শুভ্র ওঠ। অনেক অ্যাকটিং করেছিস। ঢাকার আবাহনী ক্লাবের এক কর্তা তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ?"

শ্যামলী আর ফুলের বিস্ফারিত চোখের সামনেই শুভ্র উঠে দাঁড়াল। তারপর হেঁটে গিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে লাগল, "হ্যাঁ শুভ্রনীল বলছি।"

—দাদা, আপনার নাম আমাগো দিসে সুভাষ ভৌমিক। আমাগো এখানে পরপর দুইটা টুর্নামেন্ট আছে। মা ও মণি ফুটবল আর ফেড কাপ। গোটা দশেক ম্যাচ খেলতে হইব। পার ম্যাচ ফাইভ হান্ড্রেড ডলার। আপনে আইসবেন ? আমাগো ডিরেক্টররা আপনারে চায়।

শুভ্র খুব অবাক হচ্ছিল প্রস্তাবটা শুনে। ও জিজ্ঞাসা করল, "কতদিনের জন্য ?"

—মাস দেড়েক। ক্লিয়ারেন্সের জন্য ভাবতে হইব না। আমরা ব্যবস্থা করুম।

—কবে যেতে হবে ?

—আপনাগো পুজোর পরই।

—ঠিক আছে আমি রাজি। আপনারা কেউ কলকাতায় এসে কথা বলবেন ?

—হ। আমাগো ভাইস চেয়ারম্যান এই সপ্তাহে গিয়া সব ফাইনালাইজ কইরা আসব।

ফোনটা ছেড়ে দিয়েই শুভ্র 'ইয়াহু' বলে শূন্যে হাত ছুঁড়ল।

—রানা, দেড় মাসে পাঁচ হাজার ডলার ! মানে দেড় লাখ টাকা। আই অ্যাম গোয়িং টু প্লে ইন ঢাকা।

অপ্রত্যাশিত একটা অফার পেয়ে শুভ্র ভুলেই গিয়েছিল, একটু আগে ও জ্বরো রোগীর অভিনয় করছিল। রানাকে বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখ, আজ সকালেই ঠিক করেছিলাম ফুটবল আর খেলব না।"

কোমরে দু'হাত দিয়ে শ্যামলী ওকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এবার সামনে এসে বলল, "ফুটবল আর খেলো না। বরং অ্যাকটিং শুরু করো। নাম করতে পারবে। চেহারাটা আছে, অনেক বেশি কামাতে পারবে।"

ফুল জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখটা দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল শুভ্রর। শ্যামলীকে ও বলল, "সিনেমায় নামতে পারতাম রে। নামব না দুটো কারণে। প্রসেনজিৎ আর তাপস পালের ভাত মারার ইচ্ছে নেই। দুই, সুচিত্রা সেনের মতো সে রকম নায়িকাই নেই।"

শ্যামলী বলল, "তুমি এত মিথ্যুক হয়ে গেছ, জানতাম না।

—আমি আবার কোন মিথ্যা কথাটা তোকে বললাম।

—এই যে, পিসিমণি জল দাও, বলছিলে।

—আমার জল তেষ্টা পেতে পারে না ?

—তাই বলে জ্বরের অ্যাকটিং করে ? ফুল কী রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল, দেখোনি।

ফুল এই সময় বলল, "মলিদি, আমি যাই।"

শ্যামলী বলল, "চল, আমিও যাই। মিথ্যুকদের মাঝে আমার এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

শুভ্র বলল, "যাচ্ছিস যা। কিন্তু মিথ্যেকথাটা কে প্রথমে বলেছে সেটা শুনে যা।"

—কোনও দরকার নেই। বুঝতেই পারছি, রানা।

—কী ডায়লগ দিয়েছে, সেটাও শুনে যা। প্রেমে ও রণে মিথ্যে বলে কিচ্ছু নেই।

—ওর ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম। তুমি কার সঙ্গে প্রেম করছ ?

—তোর খুব সাহস বেড়ে গেছে, না রে ?

—প্রেম করলে সাহস বাড়ে।

রানা বলল, "ব্রেভো, ব্রেভো। এই তো প্রেমিকার মতো কথাবার্তা। যা বুঝছি শুভ্র, বরদাবাবু আমার কোনও প্রবলেম হবে না।"

শুভ্র বলল, "পিসিমণি নেই বলে যা ইচ্ছে আলোচনা করছিস না রে ?"

ফুল তাড়া দিল, "মলিদি, চলো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ধমক লাগাল শ্যামলী, "এই বোস তো। বেশি পাকামি করিস না। এই দুটোকে শায়েস্তা না করে আমি যাচ্ছি না।"

রানা বলল, "দুটোকে একসঙ্গে সামলাতে পারবে ?"

—পারব না মানে ? তোমরা কি সন্তুদা নাকি ?

রানা বলল, "শালা, সন্তু আমাদের বন্ধু, না শত্রু রে শুভ্র ?"

সন্তুর কথা উঠতেই শুভ্র বলল, "প্রফেসর মল্লিকের ব্যাপারটা সন্তুকে বলেছিস ? স্যার তোর বাড়িতে এসে বসে আছে বোধহয় ?"

—অ্যাই রে। চল, আমার তো মনেই ছিল না।

একটু পরে ওরা চারজন এক সঙ্গেই বেরিয়ে এল রাস্তায়। শুভ্রর খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল ফুল্লরার সঙ্গে। লুকোচুরির আর কোনও মানেই হয় না। একটু আগে ও যখন সোফায় শুয়ে ফুলের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল, ওর চোখের ভাষা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই সময় মনের গভীরে কে যেন বলে উঠেছিল, এই মেয়েটা তোমাকে কখনই ফিরিয়ে দেবে না। ওর মুখে আপনজনের উদ্বেগ দেখতে পেয়েছিল শুভ্র। শ্যামলী আর রানা বকর বকর করতে করতে হাঁটছে। একটু তফাতে ফুল্লরা। শুভ্র একটু পা চালিয়ে ওর কাছে এল।

—ফুল।

—বলো।

—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

—কী কথা।

—এই রাস্তায় বলা সম্ভব নয়।

—তবে কোথায় ?

—চলো, আবার বাড়িতেই ফিরে যাই।

—না। মলিদিরা কী ভাববে ?

—ভাবুক গে।

boiRboi.net

—আমি জানি তুমি কী বলবে।

—জানো! তুমি কী সব বুঝতে পারো ফুল?

—পারি।

—তা হলে এতদিন আমাকে কষ্ট দিলে কেন? জানো ফুল, ইণ্ডিয়া ক্যাম্প থেকে হয়তো আমি বাদ পড়ে যাব। তোমার কথা ভেবে আমি ভাল খেলতেই পারিনি।

—কেন শুধু শুধু কষ্ট পেতে গেলে? আমাকে দেখে কি তুমি কিছুই বুঝতে পারো না?

—পারি। কিন্তু আমি কেন তোমাকে সব কিছু বলতে পারি না, নিজেও জানি না।

—সবাই কি সব পারে?

ফুলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে শুভ্র নিজেই এই সব সংলাপ মনে মনে বলে যাচ্ছিল। ও ঠিক করে ফেলল, এইবার ফুলকে ও ডাকবেই। ফুল নামটা মুখ থেকে বেরোবার আগেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

—রানা?

ডাক শুনে ওরা চারজনই একসঙ্গে ফিরে তাকাল ট্যাক্সির দিকে। রানা বলল, "স্যার, আপনি এসে গেছেন?"

পিছনের সিটে বসে থাকা প্রফেসর মল্লিক বললেন, "তোমার বাবা আছেন, না বেরিয়ে গেছেন?"

রানা বলল, "স্যার, সব থেকে ভাল হয় আমাদের এক বন্ধুর কাছে গেলে। আপনার প্রব্লেমটা ও তাড়াতাড়ি সল্‌ভ করে দিতে পারবে।"

—কোথায় থাকে সে?

—সিঁথির মোড়ে।

—তা হলে সেখানেই চলো। ট্যাক্সিটা আর ছাড়ছি না।

—তাই চলুন। স্যার, এ আমার আর এক বন্ধু শুভ্রনীল। নামী ফুটবলার। এরা আমাদের বান্ধবী।

প্রফেসর মল্লিক মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সরি, ইয়াং লেডিস, তোমাদের দুই বন্ধুকে একটা কাজে নিয়ে যাচ্ছি। পরে একদিন ভাল করে আলাপ হবে।"

শুভ্র আর রানা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। সিঁথির মোড় মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, "যার কাছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, সেই ছেলেটা কে?"

—সন্তু স্যার। এ অঞ্চলে গোখনা একমাত্র যাকে ভয় পায়।

—আই সি।

স্যার আর কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। শুভ্রর খুব খারাপ লাগছিল প্রফেসর মল্লিককে দেখে। গোখনার ওপর একটু রাগও হচ্ছিল। এখন যদি ও হাতের কাছে গোখনাকে পেত ঘুসি মেরে ওর চোয়াল ফাটিয়ে দিত।

... সন্তুর অফিসে আরও একবার গিয়েছিল শুভ্র। পুরোটাই এয়ারকণ্ডিশন্ড। দরজার বাইরে ও জিতেনকে দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল, "সন্তু আছে?"

—হ্যাঁ, শুভ্রদা।

—বলো, আমার সঙ্গে আরও দু'জন আছে।

প্রথম যেদিন এই অফিসে শুভ্র আসে, জিতেন খুব রাফ্ ব্যবহার করেছিল। হয়তো ওর ওপর এই নির্দেশই আছে। অপরিচিত কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার। পরে অবশ্য মাফ চেয়ে নেয়। জিতেন হাসিমুখে বলল, "ভেতরে চলে যান শুভ্রদা। জিজ্ঞেস করার কোনও দরকার নেই।"

প্রফেসর মল্লিককে নিয়ে ওরা দু'জন সন্তুর ঘরে ঢুকতেই ও বলল, "আরে, কী ব্যাপার, আয়। হঠাৎ?"

শুভ্র বলল, "একটা জরুরি কাজে তোর কাছে এসেছি। ইনি প্রফেসর মল্লিক। এঁরই ব্যাপার।

রানা খুব অল্প কথায় গোখনার কথা বলল। সন্তু টেবলের ওপর পেপার ওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে এবার প্রফেসর মল্লিককে জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন আগে গোখনা আপনাকে হুমকি দিয়েছে?"

—দিন দুই আগে।

—কোথায় হুমকিটা দিয়েছে?

—চিড়িয়ামোড়ের বাড়িতেই। গ্রে স্ট্রিটে আমি থাকি। কিন্তু আমার লাইব্রেরি আর স্টাডিরুম ওই চিড়িয়ামোড়ের বাড়িতে। ওখানে ডিস্টার্বেন্স নেই বলে রোজই এসে থিসিস পেপার-টেপার দেখি।

সন্তু বলল, "এই দু'দিন আপনি কী করছিলেন?"

—আসলে এখানে আমি কাউকেই চিনি না। খুব পাজলড হয়ে গেছিলাম। রানা আজ আসতেই, ওকে বললাম। ও আমার কাছে থিসিস করছে।

—চিড়িয়ামোড়ে ঠিক কোন জায়গাটায় আপনার বাড়ি?

—থানার খুব কাছেই। যে বাড়ির তলায় মদের দোকান রয়েছে।

—পুলিশের কাছে যাননি?

—গিয়েছিলাম। ও সি বললেন, গোখনার সঙ্গে লেগে কি আপনি পারবেন? ওর বিরাট কানেকশন। তার চেয়ে অল্প টাকা নিয়ে বাড়িটা ওকে ছেড়ে দিন। আমি সেটল করে দিচ্ছি।

—আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন?

প্রফেসর মল্লিক অসহায় চোখে রানার দিকে তাকালেন। পাওয়ারের চশমাটা খুলে অস্থির হাতে একবার রুমাল দিয়ে মুছে বললেন, "সন্তুবাবু বাড়িটা আমার কাছে বড় ফ্যাক্টর নয়। আমার কাছে অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল রিসার্চ পেপারগুলো। ছেলেরা আমাকে ওগুলো দেয় অ্যাপ্রুভালের জন্য। ওই লোকটা আমার স্টাডি রুমে রাখা কয়েকটা পেপার আজ সকালে তুলে নিয়ে গেছে। কেয়ারটেকারকে মারধোর করেছে। কলকাতায় আমার আরও পাঁচ সাতটা বাড়ি আছে। একটা বাড়ি গেলে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। রিসার্চ পেপারগুলো আমার চাই।"

সন্তুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল ভদ্রলোকের কথা শুনে। দেখেই বোঝা যায়, পড়াশুনো জগতের লোক। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, গায়ে ময়লা একটা পাঞ্জাবি, কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া। ও জিজ্ঞাসা করল, "কী কী পেপার গেছে আপনার মনে আছে?"

—হ্যাঁ, লিটারেচারের ওপর। মিডাইভাল পিরিয়ড।

—প্রফেসর দাশগুপ্তর একটা পেপার আছে না ওই সাবজেক্টের ওপর ?

প্রফেসর মল্লিক একটু অবাক হয়েই তাকালেন সন্তুর দিকে। বললেন, "আপনি এ সব খবর রাখেন ?"

রানা বলল, "স্যার, সন্তু অনার্সে ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলে।"

প্রফেসর মল্লিক বিব্রত মুখে বললেন, "আই অ্যাম সরি।"

"আপনাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। সন্তুবাবু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রিসার্চ পেপারগুলো কতখানি দামি আমার কাছে ?"

সন্তু বলল, "আপনি একটু বসুন। আমি দেখছি ওগুলো উদ্ধার করা যায় কি না।"

ইন্টারকমের সুইচ টিপে সন্তু বলল, "রমা... একটা লাইন দাও তো... গোখনার।"

একটু পরেই লাইন পেয়ে সন্তু বলল, "গোখনা আছে ? বলুন থানা থেকে বলছি... হ্যাঁ, সন্তু বলছি... বাস্টার্ড তুই ভেবেছিসটা কী ? যা ইচ্ছে তাই করবি ? ... প্রফেসর মল্লিকের রিসার্চ পেপার নিয়ে গেছিস কেন ? ... ওগুলোর মর্ম তুই বুঝিস ? পেটে বোমা মারলেও তো তোর হাত দিয়ে একটা লাইন বেরোবে না। ... চুপ শালা... বিপ্লবের ভয় আমি পাই না... ওসব ভয় দেখাস না। সাহস থাকে তো আধ ঘণ্টার মধ্যে দলবল নিয়ে চিড়িয়ামোড়ে আয়... পুতুলের কোলে মাথা দিয়ে বসে থাক শালা... আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি... না হলে তোর গদিতে আগুন দিয়ে আসব। আমি তোর মদের দোকান ভাঙতে যাচ্ছি। ভাল চাস তো পেপারগুলো নিয়ে আয়...।"

ইচ্ছা করেই লাইনটা কেটে দিল সন্তু। প্রফেসর মল্লিক ফ্যাকাশে মুখে সব শুনছিলেন। কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন, "গোখনাবাবু কী বললেন ?"

সন্তু বলল, "ঘাবড়াবেন না। ওর মদের দোকানটা আমি গুঁড়িয়ে দিয়ে আসব। মনে হচ্ছে, পেপারগুলো আর ফেরত পাবেন না। এখন আপনি বাড়ি চলে যান। আজ হয় ও থাকবে, না হয় আমি।"

জিতেনকে ডাকল সন্তু, "চিতাকে খবর দে। যেখানেই থাক যেন চিড়িয়ামোড়ে চলে আসে। তুই চেম্বারটা আমাকে দে। হেভি মাল নিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে চল। চিতার জিপটা বাইরে আছে ?"

—হ্যাঁ, সন্তুদা।

—তাতে ওঠ। আমি আসছি। সন্তু এবার ফিরল শুভ্রদের দিকে, "তোরা বাড়ি চলে যা। গোখনাটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না।"

শুভ্র বলল, "তোর সঙ্গে আমিও যাব সন্তু।"

—দরকার নেই।

—না, তা হয় না। গোয়ার্তুমি করিস না।

—তাহলে চল।

অফিস থেকে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। শুভ্র দেখল দশ-বারোজন ছেলে তৈরি হয়ে আছে। ওরা মিনিবাস ধরে চলে গেল চিড়িয়ামোড়ের দিকে। বাইরে আজ গরম কম। মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হতে পারে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুভ্র দেখল, প্রায় একটা বাজে। সন্তুর সঙ্গে ও জিপে উঠে বসল। রানা একটা ট্যাক্সিতে উঠল প্রফেসর মল্লিককে নিয়ে।

চিড়িয়ামোড়ে মদের দোকানের সামনে সন্তু জিপ দাঁড় করাতেই শুভ্র দেখল, শাটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সন্তুর ছেলেরা চার মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এক চড় মেরে ট্রাফিক কনস্টেবলকে ওরা সরিয়ে দিল। সন্তু তখনও জিপে বসে, চিৎকার করে বলল, "শাটারটা ভেঙে ফেল জিতেন।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে বোমার আওয়াজ। একটা অ্যাম্বাসাডার এসে থামল। সাত-আটটা ছেলে নামল গাড়িটা থেকে। শুভ্র এবার দেখতে পেল চিতাকে। সন্তুর সামনে এসে চিতা বলল, "শুয়োরের বাচ্চাটা এসেছে?"

সন্তু বলল, "না আসেনি। শালাকে রেডিও গলির মুখে ধরতে হবে। ওকে মেরে সাউথ সিঁথি রোড দিয়ে বেরিয়ে যাব।"

—ঠিক আছে, তুই যা। আমি এদিক সামলাচ্ছি।

মোড়ের মাথাটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। চিতার ছেলেরা বোমাবাজি শুরু করে দিয়েছে। দু'পাশের রাস্তার ধারে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে দৌড়তে থাকা ভয়ার্ত মুখ শুভ্র দেখতে পেল ধোঁয়ার মাঝে। পায়ের সামনে রাখা একটা লোহার রড ও তুলে নিল সন্তুর অজান্তেই। থার্টি বি রুটের একটা বাস মোড় ঘোরাচ্ছিল ছেলেদের কথা না শুনে। চিতার ছেলেরা ড্রাইভারকে টেনে হিঁচড়ে নামাল। তারপর লাথি মারতে মারতে ফেলে দিল নর্দমার পাঁকে।

কয়েক মিনিট, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিড়িয়ামোড় চিতার ছেলেদের কব্জায়। শুভ্র অবাক হয়ে গেল, কয়েক গজ দূরেই থানা। অথচ পুলিশ আসছে না দেখে। সন্তু জিপ ঘোরাল দমদম রোডের দিকে। সামনের সিটে ওর পাশেই বসে জিতেন। পিছনে শুভ্র। সন্তু হঠাৎ বলল, "শুভ্র শক্ত করে রড ধরে থাক। গোখনা শালা মারুতিতে আসছে। ওর গাড়িটা আজ তুবড়ে দেব।"

সন্তুর কাঁধের ফাঁক দিয়ে ও এবার একটা সাদা মারুতি দেখতে পেল। উল্টো দিক থেকে আসছে। সন্তু জিপ চালিয়ে দিল সোজা মারুতির দিকে। রেডিও গলির মুখটায় বেশ ভিড়। চিড়িয়ামোড়ের দিক থেকে অনবরত বোমার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ প্রবল একটা ধাক্কা অনুভব করল শুভ্র। দুটি ধাতব পদার্থের ঠোকাঠুকি। বিরাট শব্দ। তারই মাঝে কাঁচ ভাঙার ঝনঝনানি। তারপরই চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার। সেই অন্ধকারটা কেটে যেতেই শুভ্র বুঝতে পারল, জিপটা উল্টে গেছে। কোনও রকমে ড্রাইভারের সিটটা ও আবিষ্কার করল। দেখল সন্তু সিটে নেই। একটা ঠাণ্ডা স্রোত হঠাৎ ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে শুরু করল। সন্তুর কি তাহলে খারাপ কিছু হল? জিপের বাইরে রাস্তায় কী হচ্ছে শুভ্র দেখতে পাচ্ছিল না। হুডে ঢাকা পড়ে গেছে। শরীরটা কাত করেই ও পিছন দিকে এগোবার চেষ্টা করল। কপালের একটা দিকে দপদপ করছে। বাঁ হাত দিয়ে ও বুঝল রক্ত পড়ছে। ডান হাতে জিপের একটা রড ও ধরে রেখেছে। বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ও রক্ত মোছার কথা ভাবতেই ঠিক করে নিল, আগে জিপ থেকে বেরোনো দরকার। শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে বার করছে শুভ্র। উরুর কাছে খোঁচা লেগে প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল। কোনও রকমে জিপের বাইরে বেরিয়ে এসে ও দেখল, মারুতির সামনের দিকটা ভেতরে ঢুকে গেছে। পিছন দিকটা একটা স্টেশনারি দোকানের ভিতরে।

জিপের ভেতর মাথা গলিয়ে লোহার রডটা হাতে তুলে নিল শুভ্র। হঠাৎ ওর

চোখে পড়ল, রাস্তার ঠিক মাঝখানে পিচের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে সন্তু। ওর একটা হাত ছড়ানো। পেটের কাছটায় চাপ চাপ রক্ত। দৃশ্যটা দেখেই ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। হাতের রডটা শক্ত করে চেপে শুভ্র এবার আশপাশে তাকাল। মারুতির পিছনের গেটটা খুলে দু'টো ছেলে কাকে যেন বের করার চেষ্টা করছে। একজনকে ও চিনতে পারল— জিতেন। ওর গায়ে জামা নেই। কাঁধের কাছ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সেদিকে এক পা এগোতেই রেডিও গলির দিক থেকে একটা বোমা এসে পড়ল। শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে জিপের আড়ালে চলে গেল। পর মুহূর্তেই এক লাফে ও পৌঁছে গেল মারুতির সামনে। জিতেন মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে। ভিতরের লোকটাকে চুলের মুঠি ধরে ও একবার বাইরে আনতেই শুভ্র গোখনাকে দেখতে পেল। এক ধাক্কায় ও সরিয়ে দিল জিতেনকে। চাপা গলায় বলল, "তুই রেডিও গলিটার দিকে দেখ। একে আমার হাতে ছেড়ে দে।"

জিতেন প্রচণ্ড অবাক হয়ে তাকাল শুভ্রর দিকে। তারপর দৌড়ে গেল রেডিও গলির দিকে। লোহার রডটা দিয়ে প্রথমে জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলল শুভ্র। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দরজার লক খুলে দিল তারপর। এক লাথি মারতে দরজাটাই ভেঙে পড়ল। গোখনা অন্য দিকে দরজা খুলে বেরোবার চেষ্টা করছে। শুভ্র ওকে একটু সময় দিল। নিজে গা থেকে জামাটা খুলে রাস্তায় ফেলল। গোখনার চোখ-মুখে ও প্রচণ্ড ভয় দেখতে পেয়েছে। ও আজ পালাবে কোথায়? শুভ্র ড্রাইভ মেরে মারুতির ভিতরে ঢুকে গেল। পুরো শরীরটা ঢোকাতে পারল না। ওর এক হাতে এখন গোখনার জামার কলার। এক হ্যাঁচকায় ও গোখনাকে বের করে আনল।

বছর পাঁচেক আগেও শুভ্র মাঝেমধ্যে ক্যারাটে প্রাকটিস করেছে। এক পায়ে ভর দিয়ে শরীরটা এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে ও লাথি চালাল গোখনার মুখ লক্ষ্য করে। রাস্তায় ছিটকে পড়েছে এখন শয়তানটা। হারানদার কথা মনে হচ্ছে শুভ্রর। এই লোকটার লোকজনই হারানদাকে মেরেছিল। এই কথা মনে হতেই ওর গায়ে অসুরের শক্তি জড়ো হল। গোখনার সঙ্গে ওর ব্যবধান এখন পাঁচ-ছ' গজের। ও টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওর সাদা জামা প্যান্ট রক্তে মাখামাখি। কোমরে হাত দিয়ে কী যেন বের করে আনছে গোখনা। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রকে যেন কে বলল, "মারো, মারো, ওকে সময় দিও না।" লাফ দিয়ে দু' পা শূন্যে তুলে শুভ্র উড়ে গেল গোখনার দিকে। পা দু'টো দিয়ে কোমরে ও তলপেটে আঘাত করতেই গোখনা মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে ফের ছিটকে পড়ল রাস্তায়। শরীরটাকে এক পাক ঘুরিয়ে এবার শুভ্র উঠে দাঁড়াল। ওর শরীরটা এখন স্প্রিংয়ের মতো কাজ করছে। মারুতির কাছেই পড়ে থাকা লোহার রডটা শুভ্র দ্রুত কুড়িয়ে নিল। ওর পায়ের তলায় গোখনা শুয়ে আছে। চোখ মুখ কুঁচকে ও এখন বড় বড় শ্বাস টানছে। ওর হাত দুটো লক্ষ্য করে লোহার রড চালাল কয়েকবার শুভ্র। মট করে একবার আওয়াজ হল।

একটু দূরেই সন্তু পড়ে আছে। শুভ্র এবার একবার চিড়িয়ামোড়ের দিকে তাকাল। একটা অ্যাম্বাসাডার ছুটে আসছে। দমদম রোড দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে জিতেন এবং আরও দুটো ছেলে। ওদের দেখে শুভ্র লোহার রডটা ছুঁড়ে ফেলল নর্দমায়। সন্তুর দেহটা ঘিরে এখন ছয়-সাতজনের ভিড়। অ্যাম্বাসাডারটা এসে থামল ভিড়ের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে এসে চিতা চিৎকার করে বলল, "বডিটা তাড়াতাড়ি

অ্যাম্বাসাডারে তোল। নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে।"

শুভ্রর দিকে চোখ পড়ল চিতার, "শুভ্রদা আপনিও চলুন।"

ভিড়ের মাঝে হঠাৎ, হঠাৎই শুভ্রর চোখে পড়ল অতুল স্যারকে। কাছেই কোথাও থাকেন বোধহয়। স্যার অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্তুর দেহটা তুলে দিচ্ছেন অ্যাম্বাসাডারে। আশপাশে ভিড় বাড়ছে।

অ্যাম্বাসাডারটা পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পিছনের সিটে সন্তুর নিথর দেহটা শুভ্র একবার দেখতে পেল। সন্তু কি বেঁচে আছে? একথা ভাবতেই ও একবার শিউরে উঠল। ওর যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে রাধির কী হবে? কথাটা মনে হতেই ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। গোখনার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ও বলল, "বাস্টার্ড... তোকে আমি ছাড়ব না।"

শুভ্রর মনে পড়ল, হারানদা মার্ডার হওয়ার পর ও মাঝেমধ্যেই থানায় যেত, কেসের কী হল, তা জানতে। পুলিশ তখন বলত, গোখনাকে ধরা মুশকিল। ও কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। কথাটা মনে হতেই শুভ্র ঠিক করল, গোখনাকে ও নিয়ে যাবে থানায়। দেখিয়ে দেবে, ওকে ধরা যায় কি না। গোখনার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি দেহটা রাস্তা থেকে তুলে নিল শুভ্র। তারপর ওকে ডান কাঁধে ফেলে রওনা দিল থানার দিকে।

পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, শুভ্রর ঊর্ধ্বাঙ্গ এখন অনাবৃত। দমদম রোড দিয়ে এখন ও হেঁটে যাচ্ছে। কত দূরে থানা? তিরিশ-পঁয়ত্রিশ গজ? এই রাস্তাটুকু ওকে পৌঁছতেই হবে। বাঁ চোখের পাশটায় কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে। শুভ্র পরোয়াই করছে না। কাঁধে একটা অচেতন দেহ। এই অঞ্চলের সব থেকে কুখ্যাত লোক। অসহায় হয়ে ঝুলছে। হাঁটতে হাঁটতেই শুভ্র ভাবল, গোখনারা আসলে ভীরু। কেউ প্রতিবাদ করে না বলে এরা যা ইচ্ছে তাই করে যায়। আজ সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফেরার সময়ও ও ভাবতে পারেনি, গোখনাকে ধরে পেটাবে। রাস্তার দু'ধারে বেরিয়ে আসা বা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া মুখগুলোর প্রতিক্রিয়া ও দেখতে পাচ্ছে। গোখনাকে এই অঞ্চলে সবাই জানে। নকশাল আমল থেকেই, ওর দৌরাত্ম্যে সবাই অতিষ্ঠ। আশপাশের বাড়ির বারান্দা, দরজায়, অর্ধেক বন্ধ করা দোকানের পাশে— কৌতূহলী মুখগুলোতে বিস্ময়, উদ্বেগ, আশঙ্কা মিশে গেছে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হিন্দিতে কী বলছে, শুভ্রর কানে তা যাচ্ছে না। রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিল বাচ্চাটা, তারপর ছুঁড়ে মারল গোখনার ঝুলন্ত দেহে। ওই ছোট্ট মুখটাতে অসীম ঘৃণা দেখতে পেল শুভ্র। "ইয়ে আদমি মেরা বাবুজি কো মার ডালা, ইনহে নেহি ছোড়ুঙ্গা"— বাচ্চাটার গলা কান্নাভেজা। হাঁটতে হাঁটতে শুভ্র টের পেল, পিছনে সারা রাস্তা জুড়ে মানুষ ওকে অনুসরণ করছে। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনে। ট্যাক্সির জানলায় কয়েকটা মেয়ের মুখ। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একটা মেয়ে। যেন এই ভয়ানক দৃশ্য আর কখনও দেখেনি।

পিছনে মানুষের ভিড়ে হঠাৎ আওয়াজ, "গোখনা নিপাত যাক", "গোখনার কালো হাত গুড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।" ক্রমশই আওয়াজটা বাড়ছে। পার্টি অফিস থেকে কয়েকটা ছেলে বেরিয়ে এল, হাতে তাদের ঝাণ্ডা। একটা পুলিশ ভ্যান চিড়িয়ামোড়

থেকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়াল। কয়েকগজ দূর থেকেই শুভ্র দেখল, এস আই বিমল কী যেন বলছে ওয়াকি টকিতে। ঠিক এই সময় ক্লান্তি অনুভব করল শুভ্র। ডান কাঁধটায় গোখনার শরীর ভারী হয়ে উঠছে। দরদর করে ও ঘামতে শুরু করল। নিশ্বাস নিতে ও কষ্ট বোধ করছে। আর কতদূর থানা ? শুভ্র এখন দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে। ধীরে ধীরে ও পা ফেলছে। কোমরে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যন্ত্রণাটা ভুলবার জন্যই ও হঠাৎ ফুল্লরার মুখটা মনে করল। বিড়বিড় করে বলল, "ফুল, ফুল। খুব ইচ্ছে হচ্ছে নিরালা বাড়ির সামনে দিয়ে একবার ঠিক এই অবস্থায় হেঁটে আসি। কিন্তু দেখো, আমি আর পারছি না। আমার শরীরে আর শক্তি অবশিষ্ট নেই।"

থানার গেটে ঢুকেই শুভ্র বসে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই ও খুব পরিচিত একটা রিক্সা দেখতে পেল। দুমড়ে যাওয়া একটা রিক্সার বডি থানার গেটের সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পাশেই জং ধরা একটা মোটরগাড়ি। গোখনার দেহটা গেটের সামনে লুটিয়ে রয়েছে। বাঁ চোখটা মুছে শুভ্র ভাল করে তাকাল এবার রিক্সাটার দিকে। হারানদার সেই রিক্সাটা না ! চেতনা হারিয়ে ফেলার ঠিক আগের মুহূর্তে শুভ্র তেল রঙে আঁকা গান্ধীজির ছবিটাকে দেখতে পেল। তলায় লেখা, তোমারে প্রণাম।

জুড়ি

—কেমন আছেন শুভ্রদা ?

কানের পাশে ঝিঁ ঝিঁ একটা আওয়াজ হচ্ছে। শুভ্র ভাল করে শুনতে পারছিল না। চোখ মেলে ও দেখল বাগানের শুঁড়িপথ ধরে রাধি আসছে। খুব ধীরে ধীরে ও হাঁটছে। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর হাঁটতে। তলপেটটা অসম্ভব ভারী। মনে হচ্ছে, এখুনি বসে পড়বে।

শুঁড়িপথের পাশেই এক সারি সুপারি গাছ। একটা গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাধি ফের একই প্রশ্ন করল দূর থেকে, "কেমন আছেন শুভ্রদা ?" ও হাঁফাচ্ছে।

কী উত্তর দেবে শুভ্র ভেবে পেল না। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "রাধি...তুমি এই অবস্থায়...কেন এলে ? তোমার কষ্ট হচ্ছে...চলো, ভেতরে চলো।"

—না শুভ্রদা। শুধু একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে এসেছি... কেন সেদিন ওকে বাধা দিলেন না ? আপনি বাধা দিলে তো আজ আমার এই সর্বনাশটা হত না।

রাধি টেনে টেনে এই কথাগুলো বলল। ওর মুখে অসহায় আর্তি। বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। একটা সস্তা হালকা রঙের ছাপা শাড়ি ওর গায়ে। মাস কয়েক আগে ও যখন প্রথমবার বাড়িতে এসেছিল, তখন ওর মুখটা ছিল মায়া মাখানো। আজকের সঙ্গে সেই দিনটার কত তফাত।

শুভ্র বলল, "আমি জানি না রাধি। এই প্রশ্নটা তুমি আমায় কোরো না।"

—কার কাছে করব শুভ্রদা ?

...কানের কাছে ঝিঁ ঝিঁ শব্দটা আরও বাড়ছে। রাধির প্রশ্নটা আর শুভ্র শুনতেই

পাচ্ছে না। ওর শরীরে অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে। ঘাড়ের পিছনে, কাঁধের কাছটায় কুলকুল করে ঘাম বেরোচ্ছে। বালিশটা বোধহয় ভিজে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ শব্দটাকে বন্ধ করার জন্য ও দু' কান হাত দিয়ে চেপে ধরল। রাধিকে এখন আর ও দেখতে পাচ্ছে না। তবে অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। দু' কানে হাত, তা সত্ত্বেও ওর মনে হল ফোঁপাতে ফোঁপাতে রাধি জিজ্ঞাসা করছে, "শুভ্রদা, কেন সেদিন ওকে বাধা দিলেন না ?" জবাবদিহি করার ভয়ে শুভ্র চোখ খুলতে চাইল না।

—কেমন আছিস রে শুভু ? বেডের খুব কাছেই পিসিমণির গলা। শুভ্র চোখ খুলল। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল পিসিমণির দিকে। গলার কাছে এক দলা বাষ্প আটকে আছে। ওর প্রাণপণ একটা উত্তর খুঁজতে চাইছে। পারছে না। পিসিমণির পাশেই লাবুপিসি। তার পাশে শ্যামলী আর রানা। উদ্বিগ্ন চার-পাঁচটা মুখ।

—শুভু, বাবা, শরীর খারাপ লাগছে ?

পিসিমণি চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চোখ বুজে সেই স্নেহস্পর্শটুকু নিতে নিতে শুভ্র গলার কাছে আটকে থাকা বাষ্পটা নীচের দিকে ঠেলতে থাকল। ও চায় না, ওর জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠুক। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে করতে ও বলল, "এখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না পিসিমণি। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করো না, কবে ছাড়বে।"

—ছেলেমানুষি করিস না বাবা। স্টিচ কাটলেই তোকে ছেড়ে দেবে।"

—কবে স্টিচ কাটবে ?

—এই দু'-একদিনের মধ্যে। একটু উঠে বোস বাবা। তুই আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিস...উফ্।

রানা এগিয়ে এসে বলল, "তোর জন্য বাইরে একজন রিপোর্টার বসে আছে। সেই যে রে...বাংলারবাণী কাগজের। যা ইচ্ছে রোজ লিখে যাচ্ছে।

শুভ্র ম্লান হাসল। দুর্বল গলায় বলল, "ওঃ, অসীম ভটচার্য। কী জানতে চায় ?"

—ঢাকা থেকে আবাহনী ক্রীড়াচক্রের লোকেরা কলকাতায় এসে বসে আছে। আর কিছু দিন পর ওদের মা ও মণি কাপ শুরু হচ্ছে। তোকে ওদের ক্লাবে সই করাতে চায়। তুই করবি কি না, অসীম ভটচার্য জানতে এসেছে।

পিসিমণি অবাক হয়ে তাকিয়ে শুভ্রর দিকে। বললেন, "সত্যিই তুই ঢাকায় যাবি না কি ?"

রানা বলল, "দশটা ম্যাচের জন্য আবাহনী ওকে দেড় লাখ টাকা দেবে। কেন যাবে না ?"

পিসিমণি বললেন, "বাব্বাঃ এত সব কাণ্ড হয়ে গেছে, আমি কিছুই জানি না !"

লাবুপিসি বললেন, "ভালই তো। ফুলি একদিন ওর বাপীকে বলছিল, শুভ্রকে বাংলাদেশ থেকে খেলতে ডাকছে। ওর বাপী বলল, শুভ্রর উচিত ওখানে গিয়ে খেলা। বাঙালি ছেলেরা তো দেশ থেকে বেরোতেই চায় না।"

পিসিমণি হাত বোলাচ্ছেন শুভ্রর মাথায়। বললেন, "সীতাংশুদার মাথা খারাপ হয়েছে। যে ছেলে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পারে না, সে যাবে বিদেশে খেলতে। যাক তো, আমার পার্মিশান ছাড়া।"

শ্যামলী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "তার চেয়ে এক কাজ করো না

শুভ্রদা। তোমার সঙ্গে ঢাকার লোকেরা যখন কন্ট্রাক্ট করতে আসবে, তখন বোলো—পিসিমণিকে ম্যানেজার করে নিয়ে যেতে হবে।"

—রক্ষে করো। পিসিমণি বললেন, "শুভুকে আমি যেতেই দেব না।"

ঘরের ভেতর গুমোট হাওয়াটা এতক্ষণে কেটে গেছে। সবার মুখে হাসি। শুভ্র এখন স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। মাঝের কয়েকটা দিনে যেন কিছুই হয়নি। সব কিছু আগের মতো। শুভ্র পিসিমণির হাতটা ধরে মনে বল পেল।

শ্যামলী বলল, "পিসিমণি, প্লিজ তুমি শুভ্রদাকে আটকে রেখো না। ঢাকায় জামদানি শাড়ি পাওয়া যায়। আমার খুব লোভ।"

শুভ্র বলল, "চাটি খাওয়ার শখ হয়েছে, না রে?" লাবুপিসি টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে একটা প্লেটে পায়েস তুলছেন। ছোটবেলায় শুভ্র পায়েস খুব ভালবাসত। মাঝে মাঝেই বিরক্ত করত পিসিমণিকে। নার্সিংহোমে রোজ কেউ না কেউ খাবার আনছেন। এ ক'দিন খাওয়ার রুচি ছিল না শুভ্রর। আজ পায়েস দেখে খুব লোভ হল। লাবু পিসি প্লেটটা হাতে দিতেই ও জিজ্ঞাসা করল, "পায়েস কেন লাবু পিসি?"

—ফুলির আজ আঠারো বছর পূর্ণ হল। এখন অ্যাডাল্ট। ওর বাপী বলল, "কেক টেক নয়, পায়েস দিয়ে সেলিব্রেট করো।"

পিসিমণি বললেন, "বাব্বাঃ, এই তো সেদিন জন্মাল রে। এর মধ্যেই এত বড় হয়ে গেল! তা, সে এখন কোথায়?"

—বাপীর সঙ্গে নিউমার্কেটে গেছে। জন্মদিনে প্রতি বছর যায়। শুধু ওরা দু'জন, আমাকে সঙ্গে নেয় না। বাপী ওকে কী প্রেজেন্ট করে, আমাকে জানতেও দেয় না।

—সীতাংশুদাকে ও খুব ভালবাসে, না?

—খুউব। আমি তো কেউ না। ফুলি বাবা-অন্ত-প্রাণ। তাই তো আমি বলি, আমেরিকায় পড়াশুনা করতে যাবি, তুই থাকবি কী করে?

—ফুলি আমেরিকায় যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ, ওর বাপীর খুব ইচ্ছে। কাগজপত্র সব এসে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাইও করেছে।

মুখে চামচটা প্রায় তুলে ফেলেছিল শুভ্র। হঠাৎ নামিয়ে রাখল। এখন আর ওর পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে না। প্লেটটাও ও সরিয়ে রাখল। হঠাৎই মনটা ওর বিষণ্ণ হয়ে গেল। পিসিমণিকে ও বলল, "আমাকে একটু আবার শুইয়ে দাও পিসিমণি। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।"

বেডে টান হয়ে শুয়ে শুভ্র চোখ বুজল। কতদিন নার্সিংহোমে শুয়ে আছে, ও জানে না। চার না পাঁচ দিন—মনে করতে পারে না। তবে ওর একদম ভাল লাগছে না। এই ঘরটা থেকে ও বেরিয়ে যেতে চায়। প্রথম যেদিন এখানে নিজেকে আবিষ্কার করে, তখন বুঝতেই পারেনি—কেন এসেছে। পরে সব ঘটনা ওর মনে পড়ে যায়। দমদম রোডে পড়ে থাকা সন্তুর নিশ্চল দেহটা ও চোখ বুজলেই দেখতে পায়। সেই দৃশ্যটাও, চিতা অ্যাম্বাসাডরে তুলছে সন্তুর দেহটা। ভিড়ের মাঝে অতুল স্যারও আছেন। ...বিকালে সবাই যখন দেখতে আসে, শুভ্রর তখন খারাপ লাগে না। খুব তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায়। কিন্তু সবাই চলে গেলেই ভীষণ ভয় ভয় করে। সেদিন

জিপটা উল্টে যাওয়ার পর শুভ্রর মাথায় চোট লেগেছিল। উত্তেজনায় তখন কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু থানার গেটে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর থেকে আট-দশ ঘণ্টা ও অচৈতন্য ছিল। নার্সিংহোমে অনেক রাতে ওর জ্ঞান ফেরে। মাথায় দু'বার স্ক্যান করা হয়েছে। খারাপ কিছু পাওয়া যায়নি। ডাক্তারবাবু তবুও অবজার্ভেশনে রেখেছেন। বাঁ চোখে নাকি পরে সমস্যা হতে পারে।

কাগজে ফলাও করে খবরটা বেরিয়েছে তার পরের তিন-চার দিন। পুলিশ কমিশনার নিজে কেসটা শুনে দায়িত্ব দিয়েছেন নর্থের ডি সি-কে। স্পোর্টস মিনিস্টার পরদিন নার্সিংহোমে দেখতেও এসেছিলেন শুভ্রকে। কাগজে বেরিয়েছে, বন্ধুর সঙ্গে জিপে করে বাড়ি ফিরছিল শুভ্রনীল। সাট্টা ডন গোখনার মারুতির সঙ্গে জিপের ধাক্কা লাগে। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে মারপিট। শেষে প্রচণ্ড মার মেরে শুভ্রনীল সাট্টা ডনকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। কাগজের হেডলাইন ছিল—'ফুটবলারের সাহসিকতায় সাট্টা ডন ধৃত।' গোখনা এখন মার্ডার চার্জে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে। রাজাবাগানে ওর গদি ভাঙচুর করেছে চিতার ছেলেরা। নিমাইকেও ছাড়েনি। পুলিশকে আর কিছু করতে হয়নি। নার্সিংহোমে এই ক'দিন আধা ঘুমে, আধা জাগরণে শুভ্র অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। একবার...বোধহয় মাঝ রাত্তিরে...পলকের জন্য সন্তুর মুখটা দেখতে পেয়েছিল। খুব স্বাভাবিক সেই মুখ। হাসতে হাসতে ও শুধু বলল, "এই শুভ্র, রাধিকে তুই দেখিস।" পলকের মধ্যেই ওর মুখটা মিলিয়ে গেল। শুভ্রর সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কোনও রকমে বেল টিপে ও সিস্টারকে ডেকেছিল। সেই দিন...সেই দিন বিকালে থানার এস আই বিমলের মুখে ও দুঃসংবাদটা শোনে। বিমল নার্সিংহোমে এসেছিল এজাহার নিতে।

একেক সময় বুকের ভিতরে তীব্র যন্ত্রণা টের পায় শুভ্র। রাধির প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে আসে। সন্তুকে সেদিন কেন অ্যাকশনে যেতে বারণ করেনি? বারণ করলেও কি সন্তু শুনত? বিমল বলেছিল, বোমার স্প্লিন্টারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল সন্তুর দেহটা। এই নার্সিংহোমেই চিতারা ওকে নিয়ে এসেছিল। লাভ হয়নি। পরদিন বরানগর আর সিঁথি অঞ্চলে হরতাল হয় গোখনার শাস্তির দাবিতে। শুভ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, "সন্তুর স্ত্রী কোথায় আছে জানেন?

বিমল বলেছিল, "ওঁর এক আত্মীয় থাকেন বিশ্বনাথপার্কে। খুকুমণিবাবু। তাঁর কাছেই।" শুভ্রর চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখে বিমল ফের বলেছিল, "আই অ্যাম সরি শুভ্রবাবু। আপনার বন্ধু সাট্টা ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, একদিন না একদিন গ্যাংওয়ার হতই।"

—কিন্তু ও যে আমাকে বলত, ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করছে। একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিও কিনেছে?

—ওগুলো সব কেমোফ্লাজ। এক ধরনের কভার আপ। আমরা সব রেকর্ড রাখছিলাম। ওর সাট্টা অবশ্য চালাত কেলে পাঁচু বলে একজন মেট।

শুভ্র মাথা নিচু করে বসেছিল এ সব তথ্য শুনে। বিমল উঠে যাওয়ার আগে বলেছিল, "পরে আসব, আপনি একটু সুস্থ হয়ে নিন।"

এ ক'দিন শুভ্র অনেক ভেবেছে সন্তুকে নিয়ে। সেই স্কুলজীবনে ওর সঙ্গে পরিচয়

হওয়ার পর থেকে, রাধিকে যেদিন ও খুকুমণিদার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকতে এল—সেই দিনটা পর্যন্ত। সন্তু হঠাৎই যেন জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলতে শুরু করল। নিজেকে দাঁড় করাবার জন্য হঠাৎ ও এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন, শুভ্র তা বুঝে উঠতে পারে না। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল সন্তু। তবু পড়াশুনাটা আর করল না। দারুণ খেলত ফুটবলটা। হঠাৎ সেটাও ছেড়ে দিল। ওর কি ধারণা হয়েছিল, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ওর সহ্য হবে না? ও আর রানা ওকে একদিন বোঝাবে ভেবেছিল, সেই সুযোগটাই সন্তু দিল না। দুম করে ছিটকে গেল ওদের আড্ডা থেকে। প্রফেসর মল্লিকের ব্যাপারটা নিয়ে যেদিন ও আর রানা সিঁথির মোড়ে সন্তুর কাছে যায়, সেদিন জানত না, গোখনার সঙ্গে ওর সাট্টা নিয়ে হিসাব চুকানো বাকি আছে। জানলে কখনই ওরা যেত না।

ওইদিন, পরে পিসিমণিরা যখন এসেছিলেন, শুভ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, "সন্তু কি আমার বারণ শুনত পিসিমণি?"

—এখন ও সব ভাবিস না বাবা।

—ওই কথাটা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে পিসিমণি।

—সন্তুর জন্য আমারও কী কম কষ্ট হচ্ছে শুভু। রাধির কথা ভাব তো। মেয়েটাকে সামলানো যাচ্ছে না।

—আমি কোন মুখ নিয়ে রাধির সামনে দাঁড়াব পিসিমণি।

—তুই কিছু ভাবিস না। ওর দায়িত্ব এখন আমাদের সবার। ওর পেটে যে ছোট্ট সন্তুটা বড় হচ্ছে, তুই আমি, খুকুমণি, লালি—আমরা সবাই মিলেই ওকে বড় করব।

পিসিমণির এই সব কথা শুনে শুভ্রর বুক হালকা হয়ে যায়। কোনওরকমে ও বলে, "খুকুমণিদাকে একবার আসতে বলবে পিসিমণি?"

—বলব। রাধিকে নিয়ে ও এমন ব্যস্ত, সময়ই পাচ্ছে না। ...মাঝে একদিন খুকুমণিদা এসেছিলেন। শুভ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, "রাধি কি আমার উপর অভিমান করে আছে খুকুমণিদা?"

—না রে শুভ্র। ও খুব দুঃখী মেয়ে। কারও ওপর অভিমান করার কথা ভাবতেও পারে না।

—ও কি খুব কান্নাকাটি করছে?

—করছিল। এখন সামলে নিয়েছে। ওর কথা ভেবে তুই মন খারাপ করিস না। ওকে আমি মেয়ের মতো মানুষ করেছি। তুই জানিস শুভ্র, ও আমার বাড়িতে আসার পর থেকেই আমার ব্যবসার যত উন্নতি। ও আমার লক্ষ্মী রে। আমার তো কোনও সন্তান নেই। ও-ই আমার মেয়ে।

শুভ্র নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছে এই কথাগুলো শুনে।

...নার্সিংহোমে এই ঘরটায় শুয়ে এতদিন একজনের কথা ভাবতে খুব ভাল লাগত শুভ্রর। রোজই তার প্রতীক্ষায় থাকত। অথচ একদিনও সে আসেনি। লাবুপিসি অবশ্য রোজই আসেন। উনি পাশে না দাঁড়ালে হয়তো পিসিমণি ফের অসুস্থ হয়ে পড়তেন। লাবু পিসির কাছে খুব কৃতজ্ঞ শুভ্র। ও ঠিক করছে, কেউ দেখতে আসুক বা না আসুক—বাড়ি ফিরেই ও পিসিমণিকে নিয়ে নিরালায় যাবে। আর কেউ কথা বলুক বা না বলুক—লাবুপিসির সঙ্গেই চুটিয়ে গল্প করবে। শুভ্র সব ঠিক করে

ফেলেছে। দু'-একদিনের মধ্যেই আবাহনীর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নেবে। ঢাকায় খেলতে চলে যাবে। একজন ফুটবলারের জীবনে রোমান্সের কোনও জায়গা নেই। এসব ফালতু আবেগ তার ক্ষতি করে। এত বড় একটা দুর্ঘটনার মাঝেও যার কথা ও ভাবছে, সে এখন আমেরিকায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে!

ঘর এখন ফাঁকা। পিসিমণিরা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন। রাতের শিফটের সিস্টার একটু আগে এসে গল্প করছিল শুভ্রর সঙ্গে। আর্যদের পাড়ায় থাকে। কথা বলতে বলতে গা স্পঞ্জ করিয়ে দিয়ে গেছে। শরীরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। এই সন্ধ্যায় এত তাড়াতাড়ি ঘুমনোর অভ্যাস নেই শুভ্রর। তবু আজ ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। এই সময়টায় সিলিং ফ্যানের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। পুরো নার্সিংহোমটা যেন ঝিমিয়ে থাকে। অন্যদিন হলে, মনে মনে ফুল-এর সঙ্গে কথা চালিয়ে যেত শুভ্র। ওর আজ জন্মদিন...একাই সেলিব্রেট করত। এখন আর ইচ্ছে করছে না। চোখ বুজে ও ঢাকা শহরের কথা ভাবতে লাগল। ওখানকার একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার। মুন্না। বেশ ভাল খেলে। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলে খেলে গেছে। মনে মনে, আবাহনীর প্র্যাকটিসে মুন্নার সঙ্গে ওয়ান-টু খেলতে লাগল শুভ্র।

আধা নিদ্রা, আধা জাগরণের মাঝে হঠাৎ দরজার বাইরে মিষ্টি রিনরিনে একটা গলা শুনতে পেল শুভ্র। কে যেন সিস্টারকে অনুরোধ করছে, "প্লিজ এক মিনিটের জন্য আমাকে একটু যেতে দিন।"

—দেখুন ভাই, অড আওয়ার্সে ভিজিটর অ্যালাউ করার নিয়ম নেই।

—প্লিজ সিস্টার, একটা মিনিট।

সিস্টারের গলায় কৌতুক, "শুভ্রনীলবাবু আপনার কে হন? বয়ফ্রেন্ড বুঝি?"

—প্লিজ, আমাকে একটু দেখে আসতে দিন।

—ঠিক আছে যান। উনি কিন্তু রেস্ট নিচ্ছেন।

গলাটা শুভ্র চেনে। ও অবাক হয়ে দরজার দিকে এখন তাকিয়ে! চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। দরজার পর্দাটা সরে যাচ্ছে। ওপাশে যেন বিরাট একটা গোল পোস্ট। মুন্না একটা স্কোয়ার পাস বাড়িয়েছে। শুভ্র সিক্স ইয়ার্ড বক্সের মধ্যে। শরীরের এক ঝটকায় স্টপারকে কাটিয়ে নিয়েছে। গোলকিপারটাকে ও দু' হাতের মধ্যে পেয়ে গিয়েছে। ওর চোখে আতঙ্ক। ছোট্ট একটা পুশ করল শুভ্র। তারপর কান ফাটানো একটা আওয়াজ শুনতে পেল। গ্যালারি থেকে প্রচুর লোক নেমে আসছে মাঠের মধ্যে। ওদের একজনের হাতে ফুলের তোড়া। দু' হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে শুভ্র, ঢাকায় ওর প্রথম গোলটা সেলিব্রেট করল।

আওয়াজটা এখন থেমে গেছে। বেডের খুব কাছে, ওর নাগালেই একটা ফুলের তোড়া। অনুচ্চ গলায় শুভ্র বলল, "ফুল নেওয়াটা কি উচিত হবে?"

ভীরু কাঁপা গলায় প্রশ্ন, "কেন?"

—এতদিন পর?

—আমার খুব ভয় করছিল।

—কেন?

—বাপী বলেছিল, মাথায় চোট থেকে অনেক কিছু হতে পারে।

—আমার জন্য এত ভয়?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফুল্লরা। হালকা নীল জামদানি শাড়িতে ওকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। যেন হঠাৎই, এ ক'দিনে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। ওর নাকের ওপর ঘাম চিকচিক করছে। ফুল বলল, "এত সাহস দেখাতে যাওয়ার কোনও দরকার ছিল ? যদি কিছু হয়ে যেত ?"

বিছানায় উঠে বসল শুভ্র। ওর মনে আর কোনও দ্বিধা নেই। খুব মোলায়েম স্বরে ও বলল, "ফুল তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"